মীরা ও মল্লার

বারীন্দ্রনাথ দাশ

প্রাইমা পাবলিকেশনস
৮৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭

প্রথম প্রকাশ
১লা বৈশাখ, ১৩৭২

প্রকাশক
নারায়ণ সেনগুপ্ত
৮৯, হ্যারিসন রোড,
কলকাতা-৭

মুদ্রণ
শ্রীনিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌
২৬, বিধান সরণী
কলিকাতা-৬

মীরা ও মল্লার : বারীন্দ্রনাথ দাশ

পুণ্যব্রত দাশগুপ্ত
লীলাপ্রতিমা দাশগুপ্ত
করকমলেষু—

॥ এক ॥

বরসই বাদরিয়া সাওয়ন কী···। বৃষ্টি, শ্রাবণের বৃষ্টি···।

গান শুনছিলাম। মীরার গান। সুরেলা গলার গান শুনছিলাম লং প্লেয়িং রেকর্ডে।

কে এই মীরা?

বরসই বাদরিয়া সাওয়ন কী,—বৃষ্টি, শ্রাবণের বৃষ্টি··।

সাওয়ন কী মন ভাবন কী,—শ্রাবণের বৃষ্টি, মনে ভালো লাগা বৃষ্টি···।

শুনছিলাম। শুনতে শুনতে ভাবছিলাম। ওই প্রশ্ন। কে এই মীরা? কি তার পরিচয়?

নহ্নীঁ নহ্নীঁ বুঁদন মেহা বরসই,—বিন্দু বিন্দু ধারায় মেঘের বর্ষণ···, সীতল পওয়ন সোহাওয়ন কী—শীতল পবনে স্নিগ্ধ আদরের বৃষ্টি··।

মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, আনন্দ মঙ্গল সাওয়ন কী··।

রেকর্ডের সুন্দর মোড়কখানি তুলে নিলাম। তার উপর ছাপানো আছে সংক্ষিপ্ত বিবরণ। মীরা,—কুইন অফ চিতোর, মীরা চিতোরের মহারানী। দি গ্রেট সেণ্ট পোয়েটস,—মধ্যযুগের মহিমাময়ী সাধিকা কবি। কিন্তু এটুকুই কি মীরার পরিচয়? তার সত্যি সত্যি পরিচয়?

এই শোনো, কে এই মীরাবাঈ? আমায় কিছু বলতে পারো তার সম্বন্ধে?

বাঃ এ কি প্রশ্ন তোমার? কে না জানে? চিতোরের রাণা কুম্ভের বৌ। কতো নাটক, কতো যাত্রা, কতো নৃত্যনাট্য হয়ে গেছে তার সম্বন্ধে, গ্রামোফোন রেকর্ডের পালা হয়ে গেছে, সিনেমা হয়ে গেছে।

না, না, না। সে তো কিংবদন্তীর মীরা, জীবননিস্পৃহ ভক্ত রসিকের মনগড়া মীরা, কৈবল্যবিলাসীর ইচ্ছাপূরণের এক রূপকথার মীরা। তার কথা আমি জানতে চাইনি।

আমি শুনতে চাই ইতিহাসের মীরার কাহিনী যে রচনা করেছিলো অসংখ্য অনবদ্য গান, অসংখ্য কালজয়ী রসোত্তীর্ণ কবিতা। এক মহান কবি মীরাবাঈ, —কিন্তু যে রাজরানী ছিলো না কোনো কালে, অথচ এক বিরাট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলো চিতোরের রাজনীতিতে, এবং যার জন্ম হয়েছিলো রাণা কুম্ভ মারা যাওয়ার প্রায় তিরিশ বছর পরে।

সেই মীরাকে আর কেন? কিংবদন্তীর ঘন কুয়াশার আড়ালে সে একেবারে আবছা অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ইতিহাসের মীরাকে ইতিহাসই ভুলে গেছে। ধর্মপ্রাণ সরল সাধারণ মানুষের জন্যে, গানের স্কুলের নৃত্যনাট্যের জন্যে এই মনগড়া মীরাই তো বেশ,—গান গায়, নাচে, গিরিধারী গিরিধারী বলে চোখের জল ফেলে। তাকে রাজরানী ভাবতে ভালো লাগে। রূপকথার নায়িকা রাজরানী হলে শুনতেও ভালো লাগে। আমাদের কিংবদন্তীতে নাটকে সিনেমায় যাত্রায় সে চিতোরের মহারানী হয়েই থাকুক। সে প্রত্যাখ্যান করুক পরাক্রান্ত রাণার স্বামিত্বের হৃদয়হীন দাবিকে। রাণা তাকে নির্যাতন করুক। তখন আবহসঙ্গীতের সঙ্গে তার গান শুনে আমরা মুগ্ধ হবো। সে একতারা নিয়ে গৈরিক বসন পরে পথে বেরিয়ে পড়ুক। আবহসঙ্গীতের সঙ্গে তার পায়ের ঘুঙুর শুনে আমাদের বুকের ভিতর মোচড় দিয়ে উঠবে। শেষ পর্যন্ত সে বিলীন হয়ে যাক এক পাষাণ দেবমূর্তির মধ্যে। তারপর যবনিকা, এবং দর্শক দর্শিকার চোখে জল। সত্যি সত্যি এরকম ম্যাজিক জীবনে সম্ভব যদি নাও বা হয়, এর সঙ্গে যদি মিল নাও বা থাকে ইতিহাসের সঙ্গে, তাতে কী আসে যায়। ইতিহাসের সত্যকে অতিক্রম করে একে আরো অনেক বড়ো সত্য বলে কল্পনা করে আমরা একটা অপার্থিব তৃপ্তি পেতে চাই, কারণ এই মীরা আমাদের এক চেনা বেদনার ভাবপ্রতিমা, তাই তার এই স্নিগ্ধ মধুর গৃহস্থকন্যার চেহারাই আমাদের ভালো লাগে, যার কাছে রাজমহলের ঐশ্বর্য বৈভব সব কিছু তুচ্ছ হয়ে গেছে। এই বৈরাগ্যের সুর আমাদের নিভৃত মনে বেজে আসছে বহু প্রজন্ম ধরে। সেই অনুভূতি দিয়েই আমরা মীরাকে চিনি, ইতিহাস দিয়ে নয়।

কিন্তু, না—।

কিন্তু না, একবার ইতিহাস দিয়েই তাকে অনুভব করতে চাই। ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আজ আমার কাছে ইতিহাসের গুরুত্ব অনেক বেশী। আজ কিংবদন্তীর কুয়াশা সরিয়ে মীরাবাঈকে দেখতে ইচ্ছে করছে আরো কাছে এসে দাঁড়িয়ে। পারছি না। বার বার সে কুয়াশা ফিরে এসে ঘিরে ফেলছে মীরাবাঈকে। তবু যখন দু এক পলকের জন্যে দু এক নজর দেখে নিচ্ছি, মনে হচ্ছে যেন ইতিহাসের মীরা আরো আরো বড়ো, আরো মহান। প্রচলিত অলৌকিক কাহিনীগুলোর চাইতে যেন আরো অনেক বৈচিত্র্যময় তার জীবন। তাই জিজ্ঞেস করছি বার বার, জানতে চাইছি কে এই মীরাবাঈ, কি তার পরিচয়?

তাই আমি স্তব্ধ হয়ে দেখছি, ইতিহাসের এক মহান সন্ধিক্ষণে তার আবির্ভাব। দিল্লীর লোদী সুলতানদের সূর্য তখন ঢলে পড়েছে। ভারতবর্ষ তখন অনেকগুলো রুটির টুকরো। বাংলায় সুলতান হোসেন শাহ। তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না দিল্লীর সিকন্দর লোদী। জৌনপুর কিছুকাল আগে স্বাধীনতা হারিয়েছে। উড়িষ্যার গজপতি রাজা প্রতাপরুদ্র দক্ষিণে রাজ্য বিস্তার করার জন্যে তৈরী হচ্ছে। মালবের সুলতান গিয়াসুদ্দীন তার দুই ছেলের সিংহাসনের জন্যে দ্বন্দ্বের ঝঞ্ঝাটে বিব্রত। গুজরাটের সুলতান মাহমুদও যুদ্ধবিগ্রহে জড়িয়ে আছে। দক্ষিণে বাহমনী রাজ্য ও বিজয়নগর রাজ্য তখন দুটি সামনা সামনি পিঠ বাঁকানো বেড়াল। সিন্ধু ও মুলতানের রাজনীতি তখন ঝড় ও ভূমিকম্প। কান্দাহার থেকে বাবরের অনুগ্রহভাজন শাহ বেগ অরঘন এসে কড়া নাড়ছে সিন্ধুর পশ্চিমে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না সিন্ধুর সুলতান নন্দা। মুলতান রাজ্যের উজীর বিষ খাইয়ে পরলোকে রওনা করিয়ে দিয়েছে সুলতান হোসেনের উত্তরাধিকারী ফিরোজকে। প্রথম সমুদ্র পেরিয়ে ভারতের পশ্চিম উপকূলের দিকে এগিয়ে আসছে ইউরোপীয় নাবিক। বাবর হাত মুড়ে বাহুর পেশী অনুভব করছে কান্দাহারে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই হিন্দুকুশ পেরিয়ে নেমে পড়বে হিন্দুস্তানের খোলা মাঠে। রাণা কুম্ভের নাতি এবং রাণা রায়মল্লের ছেলে সংগ্রাম সিংহ যাকে সবাই উল্লেখ করে সাঙ্গা বলে, তখন তরুণ কনিষ্ঠ রাজকুমার। বড়ো ভায়েদের শত্রুতা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে মেবারের সিংহাসন পাওয়ার সম্ভাবনা তার কাছে সন্ধ্যার রাঙা মেঘ, দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে হিন্দুস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি হবার জন্যে চেষ্টা করার কথা তখনও মনে দানা বাঁধেনি।

এই তখনকার ভারতবর্ষের ছবি। অসংখ্য ছোটো বড়ো রাজ্য, যুদ্ধ বিগ্রহ, অভ্যন্তরীণ কলহ বিবাদ। ইতিহাসের একটা বিরাট পরিবর্তনের মুখে, কিন্তু সেই বোধ কারো মধ্যে নেই। সারা দেশ জুড়ে একটা অনিশ্চয়তা। শিথিল হয়ে গেছে নৈতিক চরিত্র। হারিয়ে গেছে জীবনের মূল্যবোধ। যার সম্পদ আছে, শক্তি আছে, সে চাইছে আরো সম্পদ আরো শক্তি। যার কিছু নেই সে নির্বাক অসহায় প্রেতাত্মা।

একদিকে এই ভাঙন। কিন্তু অন্যদিকে একটা নতুন বলিষ্ঠ জীবনবোধের পরিবেশ তৈরী হচ্ছে। এরই মধ্যে কবীর রচনা করেছে তার গান। আরো কয়েক বছরের মধ্যেই শোনা যাবে তুলসীদাসের নামও। গুরু নানক সবে প্রচার করতে শুরু করেছে তার নতুন ধর্ম। চৈতন্য তখনও অপরিণত কিশোর।

একশো বছর আগে ঘটে গিয়েছে তৈমুরলঙের নৃশংস অভিযান। সেই ভয়াবহ দিনগুলোর কথা লোকের আর মনে নেই। প্রায় একশো বছর হতে চললো বিদ্যাপতি লিখেছে তার গানগুলো। সে সব এখন ছড়িয়ে গেছে লোকের মুখে মুখে। বাংলায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে বড়ু চণ্ডীদাসের সম্প্রতি লেখা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের গানগুলো।

চোদ্দো শ' আটানব্বই খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের এক নিদাঘ দিনে কালিকটের কাছে ভারতের মাটিতে প্রথম নামলো ভাস্কো-দা-গামা। এবং প্রায় একই সময় বৈশাখের শুক্লা তৃতীয়ায় মারওয়াড়ের মেড়তার কাছে কুড়কী গ্রামে জন্ম হোলো একটি ফুটফুটে মেয়ের। মুখে তার সূর্যের মতো দীপ্তি। বৈশাখে সূর্য মেষরাশিতে তুঙ্গী। তাই সূর্যের নামে নাম রাখা হোলো মিহিরা। সেই মিহিরা নামটি সংক্ষিপ্ত হয়ে হোলো মীরা।

পরের কয়েক দশকের মধ্যে একটা বিরাট ওলটপালট হয়ে গেল সারা দেশে। লোদী খানদান বিদায় নিলো ইতিহাসের পাতা থেকে। রাণা সাঙ্গা উত্তরাপথের সম্রাট হবার স্বপ্ন দেখেছিলো। সে স্বপ্ন শেষ রাতের অন্ধকারে মিশে গেল। বাবরের তলোয়ার দিল্লীর আকাশে বিদ্যুৎ হয়ে উঠলো। ইতিহাসের রঙ্গভূমিতে শোনা গেল মোগলের পদধ্বনি। চৈতন্যের পৌরুষদৃপ্ত নৈতিক প্রতিরোধের ভাববিদ্রোহ তরলিত ভক্তিধর্মে রূপান্তরিত হয়ে পূর্ব ভারতে বন্যা হয়ে উঠলো। বিজাপুরের সুলতানের কাছ থেকে গোয়া কেড়ে নিলো পর্তুগালের রাজপ্রতিনিধি আলবুকার্ক। পশ্চিম ভারতে শোনা গেল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের প্রথম পদসঞ্চার।

ইতিহাসের এই বিরাট ভাঙাগড়ার মধ্যে মীরাবাঈ তোমার শুকতারা ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল বিকাশ। তোমার চোখের সামনে ঘটে গেল পানিপথের যুদ্ধ। তোমার চারপাশে চিতোরের নানা জটিল অভ্যন্তরীণ চক্রান্ত। তুমি দেখতে পেলে শের শাহর উত্থান ও পতন। তুমি দেখতে পেলে তরুণ আকবরের একজাতি গড়ে তোলার প্রথম সবুজ উৎসাহ। তোমারই চোখের সামনে ধাত্রী পান্না বাঁচালো তোমার দেবর শিশু রাজকুমার উদয়কে। মনে পড়ে সেই দিনগুলো? চিতোরগড়ের ভিতর বীরবলের সেই বিভীষিকার রাজত্ব? দমবন্ধ হয়ে আসা গুমোট ষড়যন্ত্রের পরিবেশ?

তোমার শেষজীবন কলকাতার গোধূলি। চারদিকের ধূসরিমায় শুধু উদ্দাম গতি আর ধাবমান অগুনতি মুখোস। কলকাতার কবির মতো তোমার শুধু নিঃসঙ্গ নেপথ্য। তখন কেউ জানে না তুমি কোথায়, কারো মনে করার সময়

নেই। তোমার ছিলো একটা আদর্শ, সারা দেশকে একটা দেশ করতে হলে শুধু তলোয়ার দিয়ে হয় না। তুমি আকাশ-দৃষ্টিতে দেখলে যারা দেশকে এক করতে চাইলো, তলোয়ার দিয়েই করতে চাইলো, আদর্শ তাদের কাছে শুধু শিখণ্ডী। তুমি দেখলে মহাজীবন একটা অনন্ত বিরহের সুর, শুধু চাওয়া এবং না পাওয়ার ধ্রুপদী মল্লার।

হয়তো ইতিহাস অন্যরকম হতে পারতো। বাবর হেরে যেতে পারতো দাবাখেলায়। রাণা সাঙ্গা হোতো নতুন চন্দ্রগুপ্ত। পরে দিল্লীর সিংহাসনে বসতো রাণা সাঙ্গার জ্যেষ্ঠ সন্তান তোমার স্বামী কুমার ভোজরাজ। তুমি হতে ভারতসম্রাজ্ঞী। কিন্তু সে তো হোলো না। রাণা সাঙ্গা, কুমার ভোজরাজ ইতিহাসের দমকা হাওয়ায় ঝরে গেল, তুমি রয়ে গেল আরো মহান ভূমিকার জন্যে।

কিন্তু সেই স্মৃতি আজ হারিয়ে গেছে, আজ কারো মনে নেই তোমার প্রভাব কতোখানি পড়েছিলো তখনকার রাজনীতির আদর্শসংঘাতের মধ্যে— রাণা সাঙ্গা থেকে বাদশাহ আকবর পর্যন্ত। ভাবীকালের আটপৌরে জীবনে শুধু থেকে গেছে কয়েকটি মধুর ভজন,—আর এক সাধিকা মীরাবাঈয়ের অলৌকিক কিংবদন্তী।

তুমি সাধিকা, তুমি কবি এবং তারপরেও তুমি আরো কিছু। তুমি ইতিহাসের নেপথ্যনায়িকা। তবু এতকাল নিজেকে রেখেছো ঐতিহাসিকের নাগালের বাইরে।

ওদের অক্লান্ত গবেষণায় কিছু ছোটো ছোটো জানলা দেখা দিয়েছে বিস্মৃতির দেওয়ালে। সেখানে চোখ রেখে আভাস পাওয়া যায় তোমার ঝাপসা ব্যক্তিত্বের।

সেই ব্যক্তিত্ব আরো বিরাট, আরো বিচিত্র। তাহলে আবার নতুন করে বলতে হয় তোমার কাহিনী, আবার নতুন করে দিতে হয় তোমার পরিচয়। একবার ফিরে যেতে হয় পটভূমিকায়।

* * *

পঞ্চদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম দিকের কথা। তখন মেবারের অধিপতি ছিলেন হাম্বীরের নাতি রাণা লাখা। সে সময় মারওয়াড়ের অধিপতি রাওয়ল চুণ্ডা। সে তার মেয়ে হংসাবাঈকে দিতে চাইলো রাণার বড়ো ছেলের হাতে। তারও নাম চুণ্ডা,—বাংলা কাহিনীতে যে নাম হয়ে গেছে চণ্ড।

কিন্তু রাণা লাখা নিজেই বিয়ে করতে চাইলো হংসাবাঈকে। মারওয়াড়ের

রাওয়ল বললো, তাহলে তো আমার মেয়ে সিংহাসন পাবেনা। রাজকুমার চুণ্ডা তখন বললো, আমি ভীষ্ম হবো।

যথাসময়ে সিংহাসন পেলো রানী হংসাবাঈ আর রাণা লাখার ছেলে মোকল। সেই রাণা মোকলের ছেলে রাণা কুম্ভ। রাণা কুম্ভের নাতি রাণা সাঙ্গা বা সংগ্রাম সিংহ। রাণা সাঙ্গার বড়ো ছেলে কুমার ভোজরাজ, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী।

ওই যে মেবারের রানী রাঠোরকন্যা হংসাবাঈয়ের কথা বললাম, তার এক ভাই ছিলো রণমল্ল। রাজপুত ইতিহাসের বিখ্যাত চরিত্র। পরে সেই হোলো মারওয়াড়ের রাজা। পরবর্তী রাজা তার ছেলে রাও জোধা তৈরী করলেন রাজধানী জোধপুর, যিনি কোনোদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না তাঁর নামের রেশ নিয়ে কলকাতার এক অভিজাত অঞ্চল জোধপুর পার্ক হবে,—আমাদের বাঙালী বানানে যোধপুর পার্ক।

সেই রাও জোধার কনিষ্ঠ সন্তানদের মধ্যে ছিলো রাও দুদাজী। তাকে দেওয়া হয়েছিলো একটা ছোটো রাজ্য, নাম মেড়তা,—রাজ্য আর রাজধানীর একই নাম এবং রাজ্যের সীমান্তও রাজধানী থেকে বেশী দূরে নয়। দুদাজীর চার ছেলে। সবার বড়ো বিক্রমদেব, যে নাম সংক্ষিপ্ত হয়ে বীরমদেব। আর সবার ছোটো রতন সিংজী। মেড়তা শহরের কাছে কুড়কী গ্রাম ছিলো রতন সিংজীর জায়গীর। সেই রতন সিংজীর মেয়ে আমাদের মীরাবাঈ।

আমাদের কাহিনী আরম্ভ হচ্ছে ১৫১৬ খ্রীষ্টাব্দে। মেবার রাজ্য এ সময় একটা নতুন শক্তি। জোহর অঞ্চলে রুপো ও সীসের খনি আবিষ্কারের ফলে খুব দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে তার সমৃদ্ধি। দক্ষিণে মালব দুর্বল হয়ে গেছে সুলতান নাসিরুদ্দীনের মৃত্যুর পর। দিল্লীতে সুলতান সিকান্দার লোদীর রাজত্ব প্রায় শেষ হয়ে এলো। বাবর এখনও শুধু কাবুলেরই রাজা। চৈতন্যদেব দক্ষিণ পশ্চিম ও উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করে পুরীতে ফিরে এসেছেন। মারওয়াড়ের সিংহাসনে বসেছে মীরার পিতামহ রাও দুদাজীর ভাই রাও সুজার নাতি রাও গাঙ্গা। মেবারের সিংহাসনে রাণা সাঙ্গা।—এখন দিল্লীকেও নিজের দখলে আনার কথা ভাবতে শুরু করেছে।

সে সময় একটা পরাক্রান্ত আর্যাবর্ত গড়ে তোলার কথা রাণা সাঙ্গার কাছে অসম্ভব মনে হয়নি। তাই যদি হয় তাহলে সেরাজ্যের ভাবী সম্রাট হবে কুমার ভোজরাজ। তাকে সেভাবেই তৈরী করেছিলো রাণা সাঙ্গা। উপযুক্ত এবং আরো কিছু।

সেই পনেরো শ' ষোলো খ্রীষ্টাব্দে রাণা সাঙ্গার মনে হোলো এবার ভোজ-রাজের বিয়ে দিতে হবে। কোনো রাজবংশ থেকে এমন একটি মেয়ে খুঁজে আনতে হবে যে দিল্লীর ভাবী সাম্রাজ্ঞী হবার উপযুক্ত। শুধু যুবরাজের জন্ম দিতে পারে এমন রাজকন্যা রাজপুতানায় অনেক আছে, কিন্তু রাজসভায় সম্রাটের পাশে বসে সম্রাজ্ঞী হয়ে রাজ্যশাসনের অংশীদার হতে পারে এমন রাজকন্যা কোথায়। রাণা সাঙ্গা চারদিকে তাকিয়ে দেখলো।

॥ দুই ॥

ছোটো ছোটো টিলা। বড়ো বড়ো লাল পাথরের চাঁই। কোথাও বা মাটি ক্ষয়ে গিয়ে ধূসর পাষাণ। সাঙ্গরের বন, কাচরীর ঝোপ-জঙ্গল, ছোটো বড়ো কাঁটা গাছ। মাঝে মাঝে দু-একটা বট বা অশথ। সরু পথ, হলদে ধুলো, অনেক দূরে বালির ঢেউ আর গাঢ় নীল আকাশ। মারওয়াড়ের রুক্ষ সৌন্দর্য। যেখানেই এক টুকরো সবুজ, সেখানেই কয়েকটি ছাগল, দু-একজন গ্রামবাসী, মাথায় গাঢ় লাল কি গাঢ় নীল সাফা। তারপর নির্জন এবং নিস্তব্ধ।

সূর্য পশ্চিমে। রোদ্দুর সরিয়ে ভেসে এলো ঘোড়ার খুর। কখনও মন্থর চড়াই, কখনও দুরন্ত সমতল। কখনও বা নিচু ঝোপের বাধা পেরিয়ে লাফিয়ে চলে যাচ্ছে ঘোড়া দুটো। মাঝে মাঝে দুটি হাসির ঝরনা।

মিষ্টি গলা। অল্প বয়েস। একটি হাসি মেয়েলী গলায়।

ছেলেটির মাথায় জরির কাজ করা রঙীন পাগ। কোমরে তলোয়ার, হাতে ধনুক। বলিষ্ঠ রুক্ষ সুন্দর তরুণ চেহারায় এখনও কৈশোরের গন্ধ।

মেয়েটির রংদার বিস্তৃত ঘাগরা ঘোড়ার দুপাশে ঝালর হয়ে আছে। হাওয়ায় ডানা হয়ে ছড়িয়ে গেছে হাল্কা ওড়নী।

একটি টিলার উপর উঠে ছেলেটি রাশ টেনে থমকে দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিও।

কিছু দূরে খোলা জায়গার মাঝখানে একটি উঁচু অশথ গাছ। তারই ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে সাত আটজন অশ্বারোহী।

তাদেরই একজন আঙুল তুলে ধরেছে আকাশের দিকে। মুখ উঁচু করে দেখছে অন্য সবাই। আকাশে বেশ নিচু দিয়ে উড়ে যাচ্ছে কয়েকটি তিতির পাখি।

একজন ধনুক তুলে তীর বসিয়ে নিশানা করলো।

মেয়েটি হাত বাড়ালো ছেলেটির দিকে। ছেলেটি নিজের তীরধনুক এগিয়ে দিলো তার দিকে।

গাছতলার সেই ঘোড়সওয়ার তীর ছুঁড়তে যাচ্ছিলো। হঠাৎ একটা শব্দ ভেসে এলো হাওয়ার শিসের মতো। যোদ্ধার খুব চেনা শব্দ। চকিতে মুখ ফিরিয়ে ওরা দেখলো গাছের গুঁড়িতে একটা তীর এসে বিঁধেছে। সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা। তারপর আরো একটা। তারপরেই ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। তক্ষুনি ঘুরে দাঁড়িয়ে দেখতে পেলো টিলার উপর থেকে নেমে আসছে দুজন সওয়ার। একজনের হাতে খোলা তলোয়ার।

এদেরও সাত আটটি তলোয়ার খাপ থেকে বেরিয়ে এলো।

আরে, একটি মেয়ে.—বলে উঠলো একজন।

কাছে এসে দুজন থামলো। ছেলেটির হাতে তলোয়ার। মেয়েটির হাতে ধনুকবাণ।

দুপক্ষ তাকিয়ে দেখলো দুপক্ষকে। অন্যপক্ষ সবারই বলিষ্ঠ যোদ্ধার চেহারা, শুধু একজন বেশ কমবয়েসী, এদেরই দুজনের মতো।

তলোয়ার ধরেছেন ?—মেয়েটি শিউলি হাসি হেসে বললো ওপক্ষের অল্পবয়েসীকে,—একটি মেয়েকে দেখে ? আপনি রাজপুত ?

আমি সিসোদিয়া,—সে উত্তর দিলো আহত আভিজাত্যের করমচা অভিব্যক্তিত্বে।

মেয়েটি বললো,—আমরা রাঠোর।

তরুণের পাশের সওয়ার আরেকটু প্রবীণ। জিজ্ঞেস করলো,—তীর ছোঁড়া হয়েছিলো আমাদের লক্ষ্য করে ? কেন ?

—ইনি নিশানা করেছিলেন একটি নিরীহ পাখির দিকে। খুবই অন্যায়।

—ইনি জখম হতে পারতেন।

—না। তা হোতো না। আমি তীর ছুঁড়েছি গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করে।

—যদি গায়ে লাগতো ?

মেয়েটি হাসলো। বললো,—ওই দেখুন।

একটু দূরে একটি কেড় গাছ। একটি বেগুনী রঙের কমেড়ী পাখি বসেছে শুকনো ডালের উপর।

সাঁ করে একটি তীর চলে গেল সেদিকে। মাটিতে পড়ে গেল সরু ডাল। পাখি উড়ে গেল।

ডাল দেখেই তাক করেছিলাম,—হেসে বললো মেয়েটি,—পাখির দিকে নয়। পাখির গায়ে লাগেনি।

তুমি কে?—জিজ্ঞেস করলো বয়স্ক সওয়ার।

—আমায় আপনি করে বলবেন।

বয়স্ক সওয়ার হেসে উঠলো।

দরকার হলে আমিও তলোয়ার ধরতে জানি,—বললো মেয়েটি।

লোকটার হাসি থেমে গেল। মেয়েটির গলা এখন ইস্পাত।

মেয়েটির সঙ্গী ছেলেটি ওপক্ষের তরুণ সওয়ারের দিকে তাকিয়ে বললো,—তলোয়ার খাপে ঢুকিয়ে রাখুন।

—কেন?

—রাঠোরকন্যার সঙ্গে তলোয়ার হাতে কথা বলা বেয়াদবি।

—আমার সঙ্গে কেউ ওভাবে কথা বলে না। তুমি জানো না আমি কে।

—আপনি যেই হোন, মেবারের রাণা হলেও আমি পরোয়া করি না। আমি রাঠোর।

বটে?—ঠোট বেঁকিয়ে একটু হাসলো তরুণ সিসোদিয়া।

এমনি কথায় হবে না,—বললো তরুণ রাঠোর।

হঠাৎ শোনা গেল ইস্পাতে ইস্পাত ঠোকার ক্ষণিক ঝনঝনা। সিসোদিয়ার হাত থেকে তলোয়ার খসে গিয়ে চড়কি পাক খেয়ে উপর দিকে উঠে গেল। তারপর নেমে এলো নিচের দিকে। কিন্তু মাটিতে পড়ার আগেই এদিক থেকে হাত বাড়িয়ে খপ করে তার হাতল ধরে ফেললো রাঠোর মেয়েটি।

পেছন থেকে আরেকজন সিসোদিয়া তলোয়ার হাতে ঘোড়ার রাশ ঝাঁকিয়ে দু-তিন কদম এগিয়ে এলো। হাতের ইশারায় তাকে থামালো তরুণ সিসোদিয়া।

রাঠোর ছেলেটি বললো,—ওকে থামালেন কেন? আমার তলোয়ারের খেলা দেখলেন, এবার আমার বোনের তলোয়ার দেখতেন।

না জয়মল, ঝগড়া কোরোনা,—বললো মেয়েটি,—রাজপুতের সঙ্গে রাজপুতের কোনো ঝগড়া নেই। না মানুষের সঙ্গে মানুষের। এই নিন আপনার তলোয়ার। চলো জয়মল।

নিমেষে উধাও। ঘোড়ার খুর অনেক দূরে ক্ষীণ, তারপর আরো ক্ষীণ। তারপর নিস্তব্ধ।

কিছুক্ষণ পরে এরাও রওনা হোলো। একটু পরে দেখতে পেলো এক গ্রামবাসীকে।

সূর্য এখন একটি ছোটো টিলার পেছনে। ঝলসে উঠছে অনেক দূরে বালির ঢেউ। পশ্চিম আকাশে আগুনের রং।

—এই শোনো। মেড়তা এখান থেকে কতো দূর?

—ওই যে টিলা দেখছেন, তার পেছন দিকে যে রাস্তা, সেটি ধরে এগোলেই মেড়তা। সন্ধ্যের আগে পৌঁছে যাবেন।

—আচ্ছা, একটু আগে ঘোড়ায় চেপে একটি ছেলে ও মেয়ে চলে গেল, ওদের চেনো?

—ওদের সবাই জানে।

—ওরা কে?

—একজন আমাদের রাওয়ল বীরমজীর ছেলে জয়মলজী। আর অন্যজন বীরমজীর ছোটো ভাই রতনসিংজীর মেয়ে, নাম মীরাবাঈ।

॥ তিন ॥

সিসোদিয়া ঘোড়সওয়ার আটজন যখন মেড়তা শহরে এসে পৌঁছালো তখন প্রায় সন্ধ্যা। পথের ধারে হাট বসেছে। লোকজন পথে বেরিয়ে পড়েছে।

বয়স্ক ঘোড়সওয়ার বললো,—বীরমদেবজীকে আগে খবর দিয়ে রাখলে ভালো হোতো। উনি আপনার যথাযোগ্য অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে রাখতেন।

তরুণ সিসোদিয়া উত্তর দিলো,—না সুরজমলজী, এই বেশ। আমরা যে এখানে এসেছি একথা বেশী জানাজানি না হওয়াই ভালো।

রাজমহল তো নয়, একটা ছোটো দুর্গ। পাথরের তৈরী। চারদিকে উঁচু প্রাচীর। সিসোদিয়ারা কাছে আসতেই ফটক খুলে গেল। ভেতরে দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে মহলের প্রহরীরা।

ভেতর থেকে এগিয়ে এলো একজন। তার দীর্ঘ চেহারায় একটা সংযত আভিজাত্য ও সহজ কর্তৃত্ব। অভিজ্ঞ যোদ্ধার মতো বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। সুরজমল ঘোড়া থেকে নেমে তাকে অভিবাদন করলো। সেও অভিবাদন করলো তরুণ সিসোদিয়াকে। বললো,—কুঁয়র-সা', আপনি নিজে এসেছেন মেড়তার রাজ-মহলে, আমরা তাতে কৃতার্থ। আসুন।

কুমার,—সুরজমল তরুণ সিসোদিয়ার দিকে ফিরে বললো,—রাও বীরমদেবজী।

তরুণ চট করে ঘোড়া থেকে নেমে অভিবাদন করলো বীরমদেবকে। জিজ্ঞেস করলো,—কি করে জানলেন আমরা এসেছি?

বীরমদেব হাসলো। বললো,—জয়মল আর মারার সঙ্গে আপনাদের দেখা হয়েছে। যেই বললো সাত আটজন সিসোদিয়া ঘোড়সওয়ার আসছে, আমি বুঝে নিলাম। আমার ভাই রতন সিংজী কয়েকদিন আগে চিতোরগড় থেকে আমায় খবর পাঠিয়েছিলো যে আপনারা কয়েকদিনের মধ্যেই রওনা হচ্ছেন। আমি অনুমান করেছিলাম যে আপনারা খবর না দিয়েই আসবেন।

সন্ধ্যার কিছুক্ষণ পরে মহলের দোতলায় একটি ছোটো ঘরে বসে সুরজমল একাই কথা বলছিলো বীরমদেবের সঙ্গে।

অনুমান করেছিলেন?—জিজ্ঞেস করলো সুরজমল।

—তাই তো স্বাভাবিক। জোধপুরের সঙ্গে চিতোরের এখন যা সম্পর্ক তাতে কথাটা আগেই জানাজানি হয়ে যায় এটা রাণা সাঙ্গাজী চাইবেন না।

সুরজমল হাসলো।—রাণাজী চারদিক আঁটঘাট বেঁধে কাজ করেন। এমন ব্যবস্থা করেছেন যাতে জোধপুরের মহারাজ গাঙ্গাজী কিছু মনে না করেন।

বীরমদেব শুনলো, চিতোরগড়ে রাণাজীর দ্বিতীয় মহিষী ধনবাঈয়ের ইজ্জত আরো বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, কয়েকটি নতুন জায়গীর দেওয়া হয়েছে ধনবাঈকে। ধনবাঈ জোধপুরের মহারাজ রাও গাঙ্গার আপন বোন,—বীরমদেবজীর জ্যাঠতুতো ভায়ের মেয়ে।

সুরজমল বলে গেল,—রাও গাঙ্গার ছেলে মালদেবকেও রাণাজী নিয়ে রেখেছেন নিজের কাছে।

বীরমদেব বললো, আমার মনে হয়, রাণাজীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হলে রাও গাঙ্গাজী খুশিই হবেন। রাঠোরদের সঙ্গে সিসোদিয়াদের আত্মীয়তা অনেক দিনের। রাণা লাখার পত্নী হংসাবাঈ ছিলেন আমাদের পূর্বপুরুষ মারওয়াড়ের মহারাজ চুণ্ডাজীর মেয়ে, আমার ঠাকুর্দা রাও জোধার পিসী। আমার পিসী শৃঙ্গারবাঈয়ের বিয়ে হয়েছিলো রাণা সাঙ্গার বাবা রাণা রায়মলজীর সঙ্গে, এবং আপনি তো জানেন আমার পত্নী হলেন রাণা রায়মলজীর আরেক রানীর কন্যা, অর্থাৎ রাণা সাঙ্গার বৈমাত্রেয় বোন।

তবু রাঠোরদের সঙ্গে সিসোদিয়াদের এত শত্রুতা,—সুরজমল হেসে বললো,—আপনার ছেলে যেই শুনলো কুঁয়র-সা' এবং তাঁর অন্য সঙ্গীরা সিসোদিয়া, অমনি বাঘের বাচ্চার মতো ফুলে উঠলো। মনে একটু ভয় নেই, আমরা সাত আট জন, ও একা, তবু চোখের পলকে কুঁয়র-সা'র হাত থেকে তলোয়ার কেড়ে নিলো।

বীরমদেব একটু যেন অপ্রস্তুত হোলো।—ওর অল্প বয়েস। আপনারা ওকে মার্জনা করবেন। আপনাদের পরিচয় না জেনে ওরকম অশোভন ব্যবহার করেছে। আমি ওকে ডেকে বলবো কুঁয়র-সা'র কাছে মাপ চাইতে।

—না, না, কিছু বলবেন না। আমরা মনে মনে ওর সাহসের তারিফ করছিলাম। ওকে চমৎকার অস্ত্রবিদ্যা শিখিয়েছেন। এবং মীরাবাঈকেও।

—আমি নয়, আমার বাবা রাও দুদাজী। আপনি তো জানেন মীরার মা কুসুমকুঁয়র যখন মারা যান তখন ওর বয়েস পাঁচ বছর। আমি আর রতন সিংজীও তখন এখানে নেই, দুজনেই সাঙ্গাজীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছি তাঁর ভায়েদের সঙ্গে সিংহাসনের লড়াইয়ে। জয়মল আর মীরা দুজনেই মানুষ হয়েছে দুদাজীর কাছে। দুজনে এক বয়েসী। দুদাজী দুজনকেই খুব ভালোবাসতেন। জয়মলের সঙ্গে মীরাকেও একই রকমভাবে শিক্ষা দীক্ষা দিয়েছেন। রাজবংশের মেয়েদের যে রকমভাবে তৈরী করা হয় অন্য রাজবংশের আদর্শ বধূ ও ঘরনী হবার জন্যে, তা তো করেছেনই। সেই সঙ্গে একদিকে যেরকম সঙ্গীত শাস্ত্র, ধর্মশাস্ত্র এসব ভালোভাবে শিখিয়েছেন, অন্যদিকে ঠিক ছেলেদেরই মতো ঘোড়ায় চড়া, অসিচালনা, ধনুর্বিদ্যা, এসবও শিখিয়েছেন।

সুরজমল তেমন অবাক হোলো না একথা শুনে, কারণ সে সময় রাজপুত রাজবংশের মেয়েদের যুদ্ধবিদ্যাও শেখানোর রেওয়াজ ছিলো। চিতোরের রানীদেরও সময় সময় তলোয়ার ধরতে হয়েছে।

জয়মল ও মীরাকে দরবারে সব সময় নিজের পাশেই রাখতেন রাও দুদাজী, —বীরমদেব বলে গেল,—এখনকার রাজনীতিতে নিজে শিখিয়ে পড়িয়ে ওয়াকিবহাল করেছেন ওদের দুজনকে। যদি মীরার সঙ্গে কথা বলেন, দেখবেন হিন্দুস্তানের রাজনীতি সে আমাদের চাইতে কম বোঝে না।

—হ্যাঁ, এসব খবর আমাদের রাণাজীও জানেন, সে জন্যেই আপনার সঙ্গে কথা বলার জন্যে আমায় পাঠিয়েছেন। তবে শুনেছি মীরাজী নাকি আজকাল বেশির ভাগ সময় মন্দিরে ভজন পূজন নিয়েই পড়ে থাকেন।

মুখে স্নেহের হাসি ছড়িয়ে বীরমদেব বললো,—বেশির ভাগ সময় নয়, তবে হ্যাঁ, ওর মধ্যে ধর্মের ভাবটা একটু বেশী। ব্যাপারটা শুনুন তাহলে। ও যখন একেবারে ছোটো, সন্ত রইদাসজী তীর্থ পর্যটন করতে করতে এখানেও এসেছিলেন। ওঁর কাছে ছোটো একটি কৃষ্ণের মূর্তি ছিলো।

—রইদাসজীর কাছে কৃষ্ণের মূর্তি? উনি তো রামভক্ত।

বীরমদেব বলে গেল,—শুনেছি, কাশীতে যখন রইদাসজীর দেখা হয়

রাণা সাঙ্গাজীর মা রানী রতনকুমারী ঝালীর সঙ্গে, তখন উনি রইদাসজীকে দিয়েছিলেন এই গিরধরজীর মূর্তি। যাই হোক, ভক্ত সাধকের কাছে কৃষ্ণ আর রামে কোনো তফাত নেই। রইদাসজী যখন মেড়তায় এলেন তখন উনি খুব বুড়ো হয়ে গেছেন। আমরা কানাঘুসোয় শুনেছিলাম উনি কাউকে না জানিয়ে চুপচাপ ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন কাকে দিয়ে যাবেন গিরধরজীর মূর্তি তাই খুঁজবার জন্যে। উনি এসময় নিজের পরিচয় দিতেন না কাউকে। কিন্তু আমরা জানতে পেরেছিলাম। কয়েকদিন তিনি আমাদের এখানে এসে থাকলেন। আমরা আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থে যতোটুকু হয় তাঁর সেবাযত্ন করলাম। উনি চলে যাওয়ার সময় তিন বছরের মীরা হঠাৎ কান্না জুড়ে দিলো,—ওই গিরধরজীর মূর্তি ওর চাই।

আমরা ওকে বোঝালাম,—বলছিলো বীরমদেব,—ওটা পুতুল নয়, ওটা খেলনা নয়। ওকে কোলে তুলে ভেতরে নিয়ে গেলাম। রইদাসজী চলে গেলেন। কিন্তু আবার ফিরে এলেন পরদিন। উনি নাকি ঘুমের মধ্যেও শুনেছেন মীরার কান্না। তাঁর মনও বলছিলো মূর্তিটি মীরাকে দেওয়ার জন্যে। মীরার মাথায় হাত রেখে বললেন,—তোমাকে দীক্ষা দিতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু তুমি বড্ডো ছোটো। কবে তুমি বড়ো হবে তদ্দিন তো আমি বাঁচবো না। তোমার কানে গিরধরজীর নাম বলে দিচ্ছি। এই আমার দীক্ষা। সংসারের সব মানুষ সমান। এই তোমার মন্ত্র।

ওইটুকু মেয়ে এই কথাটা কি করে মনে রাখলো জানি না—বীরমদেব হেসে বললো,—ওর কাছে সংসারের সব মানুষ সমান।

সত্যি,—বললো সুরজমল,—এত তেজ অথচ কী নম্র। আমরা অবাক হয়ে দেখছিলাম।

—ওর মন খুব নরম। এত ভালো তীরন্দাজ, কিন্তু আজ পযন্ত কোনোদিন একটি পাখিও মারতে দেখিনি। গাছের ডাল ফল পাতা ওসবের উপরেই লক্ষ্যভেদ।

ওদের কথার মাঝখানে এসে উপস্থিত হোলো বীরমদেবের ছেলে জয়মল। খুব সংযত কিন্তু চোখে মুখে একটা উত্তাপ।

কিছু বলবে?—জিজ্ঞেস করলো রাও বীরমদেব।

জয়মল সুরজমলের দিকে একবার তাকালো, তারপর বীরমদেবের দিকে ফিরে বললো,—অতিথিদের একজনের ব্যবহার আমার ভালো লাগেনি। আমি নিজে কিছু বলার আগে আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম।

—কেন ? কি হয়েছে ?

—মহলের তেতলায় যাঁকে থাকতে দেওয়া হয়েছে, তিনি নিচে নেমে অন্দরমহলের সামনে গিরধরজীর মন্দিরে ঢুকেছেন। ওঁকে কি গিয়ে বলবো, এই মন্দির বাইরের লোকের জন্যে নয়, শুধু মহলের লোকদের জন্যে ?

বীরমদেব একটু হাসলো। জিজ্ঞেস করলো,—মীরা এখন কি করছে, জয়মল ?

—মন্দিরেই আছে। ভজন গাইছে।

—এঁকে চেনো ? ইনি সুরজমল হাডা, বুঁদীর রাজা রাও নর্বদ সিং হাডার ছেলে। এখন চিতোর দরবারে রাণা সাঙ্গাজীর কাছেই আছেন।

জয়মল একটা শুকনো ভদ্রতার অভিবাদন জানালো, তারপর বললো,— আমাদের সেই অতিথিকে কি পাঠিয়ে দেব বাইরে চতুর্ভুজজীর মন্দিরে ?

—না জয়মল। অন্দরমহলে যাওয়ার অধিকার তার আছে। তোমার মা ওর পিসী।

জয়মলের ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক হোলো।

বীরমদেব বললো,—উনি মেবারের টিকায়েত কুমার ভোজরাজ। মহারাণা সাঙ্গাজীর বড়ো ছেলে।

॥ চার ॥

অঙ্গন পেরিয়ে রুক্ষ পাথরের উঁচু ধাপ দুটো পেরিয়ে ভোজরাজ উঠে এলো পুজোর ঘরের সামনে।

সেখানে কৃষ্ণের একটি ছোটো মূর্তি, পিলসুজ, আর মীরার সুরেলা তৈরী গলা।

—মায়ী রী, ময় তো গোবিন্দো লীনো মোল,····· ওগো মা, আমি তো গোবিন্দকে কিনে নিয়েছি···।

দরজার সামনে ভোজরাজ তখন পাথরের ভাস্কর্য।

গানের এই আঙ্গিক তার কাছে একেবারে নতুন। কিছুদিন আগে চিতোরগড়ে কুম্ভশ্যামের মন্দিরে একজন এসে কবীরের ভজন শুনিয়েছিলো। ভালো লেগেছিলো সেই গানের ভাবমাধুর্য। কাশীর সাধককবি কবীরের নাম তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তার নিন্দে শোনা যায় মেবারের ব্রাহ্মণদের মুখে। কিন্তু মহারাণা সাঙ্গা হঠাৎ কবীরের অনুরাগী হয়ে উঠেছে। দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী ছিলো রাণাজীর শত্রু। সিকন্দর লোদী নানারকম

অত্যাচার করেছিলো কবীরের উপর, তাকে প্রাণে মারবার চেষ্টাও করেছিলো কিন্তু পেরে ওঠেনি। পরাক্রান্ত লোদীকে যারা অবহেলা করতে পারে তাদের জন্যে রাণাজীর প্রচণ্ড অনুরাগ ও শ্রদ্ধা। ব্রাহ্মণেরা আপত্তি করেছিলো। কবীর মুসলমানের ছেলে, জোলার ছেলে, তার গান কেন হবে কৃষ্ণশ্যামের মন্দিরে?

দরবারে রাণা সাঙ্গা যুবরাজ ভোজরাজের দিকে তাকিয়েছিলো। একটু হেসে জিজ্ঞেস করেছিলো,—তুমি কি বলো?

ভোজরাজ উত্তর দিয়েছিলো,—সুলতান সিকন্দর লোদীকে যিনি পরোয়া করতেন না তিনি আমাদের নমস্য। তাঁর গান নিশ্চয়ই হবে কৃষ্ণশ্যামজীর মন্দিরে।

রাণা সাঙ্গা হাসতে হাসতে বললো—তুমি হিন্দুস্তানের ভাবী সম্রাট, তোমার কথার উপর আর কারো কথা চলতে পারে না।

রাণাজীর সঙ্গে ভোজরাজও গিয়েছিলো কৃষ্ণশ্যামের মন্দিরে। আর গিয়েছিলো রাণাজীর মা সন্ত রইদাসের মন্ত্রশিষ্যা রানী রতনকুঁয়র ঝালী এবং ভোজরাজের মা মহারানী কঁওয়রবাঈ সোলাঙ্কি।

কী যেন সেই কবীরপন্থী গায়কের নাম?—ভোজরাজ ভাবলো,—হ্যাঁ, সুরতগোপাল। সবাই বলছিলো সে নাকি কবীরের মন্ত্রশিষ্য।

সেদিন ছিলো হোলী।

প্যারে হাম ঘর কান্ত সুজন,—গাইছিলো সুরতগোপাল,—ম্যয় খেলুঁ রঙ্গ হোরী, ··আমার ঘরে সুকান্ত পরমপ্রিয়, তার সঙ্গে আমার রঙের খেলা। জনম জনম কী মিটী হ্যায় কল্পনা, পায়ো জীবন প্রাণ রী···।

সে এক অপরূপ আত্মনিবেদনের ভঙ্গী। ভোজরাজ শুনে মুগ্ধ হয়েছিলো। কিন্তু এখানে মীরার গানে রসের আবেদন একেবারে অন্যরকম।—মায়ী রী, ম্যয় তো গোবিন্দো লীনো মোল। ওগো মা, আমি তো তাকে একেবারে কিনে নিয়েছি।—আত্মনিবেদন নয়, আত্মসমর্পণ নয়, তাকে একেবারে কিনে নেওয়া, তাকে একেবারে মনের বাঁধনে বেঁধে ফেলা।

ওখানে পিলসুজের পাশে কৃষ্ণের বিগ্রহ। একটি পুতুলের মতো। একটি খেলনার মতো। পিলসুজের সলতেগুলোর আলোয় কেঁপে কেঁপে উঠছে তার নীলার মতো চোখ দুটো। আর সামনে একটি গানের ফোয়ারা সুরের অজস্র ধারায় ফুরফুরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে।

—মায়ী রী, ম্যয় তো গোবিন্দো লীনো মোল···।

চৌকাঠের সামনে স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো ভোজরাজ, মেবারের যুবরাজ।

খেয়াল নেই যে পূজোর ঘরে আরো কয়েকজন মহিলা। সবাই মুখের উপর পাতলা ঘুংঘট টেনে দিয়েছে তাকে দেখে।

শুধু একজন বাদে। বয়েস হয়েছে সেই মহিলার, কিন্তু এখনও অপরাহ্ণের দীপ্তি। চোখে হাসি ভরে সে তাকিয়ে দেখলো ভোজরাজের দিকে, তারপর মীরার দিকে।

এক সময় গান শেষ হোলো। প্রণাম করে উঠে পড়লো অন্য মেয়েরা।

সবার সামনে সেই মহিলা।

পিসী?—সামনে ঝুঁকে প্রণাম করলো কুমার ভোজরাজ।

একটি মেয়ে এনে দিলো একটা বড়ো সোনার থালা। তাতে নারকোল দই সিঁদুর সোনার মোহর এসব সাজানো। মাঝখানে কর্পূরের প্রদীপশিখা।

সেটি হাতে তুলে নিলো ভোজরাজের পিসী, মহারাণা সাঙ্গার ছোটো বোন এবং মেড়তার রাওয়ল অর্থাৎ রাজা বীরমদেবজীর পত্নী কুঁয়রবাঈ। ভোজরাজের সামনে থালা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকে বরণ করলো। মেবারের যুবরাজের অভ্যর্থনার এই রীতি।

বললো,—ভেতরে গিয়ে গিরধরজীকে প্রণাম করে তারপর মহলের ভিতর এসো।

মীরা তখনও উঠে দাঁড়ায়নি। প্রশান্ত দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে দেখলো ভোজ-রাজকে। কৃষ্ণের বিগ্রহকে প্রণাম করে ভোজরাজ উঠে দাঁড়ালো। তখনও বসে আছে মীরা।

মীরা,—ডেকে বললো কুঁয়রবাঈ,—রাণাজীর বড়োছেলে, কুমার ভোজরাজ।

মীরা আসনে বসেই দুহাত তুলে নমস্কার করলো।

অন্য মহিলারা নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে।

মীরা আর ভোজরাজ একা। চারদিক একেবারে স্তব্ধ। এতবড়ো মহলে কোথাও কোনো লোক আছে বলে মনে হয়না। অনেক দূরে একটি ঘোড়ার ডাক শোনা গেল।

কিছু বলবেন?—মীরা জিজ্ঞেস করলো খুব শান্ত চোখে।

ভোজরাজ বললো,—মেবারের যুবরাজের সঙ্গে কেউ মাটিতে বসে কথা বলে না।

মন্দিরের বাইরে হলে নিশ্চয়ই উঠে দাঁড়াতাম,—মীরা উত্তর দিলো,—কিন্তু আমার গিরধরজীর সামনে যখন বসে থাকি, তখন স্বয়ং মহারাণা এলেও উঠে দাঁড়াবো না।

—আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলবো ?

—আপনিও বসুন।

ভোজরাজ পা মুড়ে মেঝের উপর বসে পড়লো। তারপর বললো,—এটা রেওয়াজ নয়।

—কি রেওয়াজ নয় ?

—তোমার জ্যাঠাইমা আমার পিসী। কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। তাই বলছিলাম, আমি এখানে এলাম, আর সবাই আমাকে এখানে একলা রেখে চলে গেল, এটা রেওয়াজ নয়।

মীরার প্রথম উত্তর গম্ভীর।—আমি তো এখানে একলা নই।—এই বলে তাকালো বিগ্রহের দিকে। তারপর একটু হেসে বললো,—মেবারের যুবরাজ কাউকে কোনো খবর না দিয়ে মেড়তা চলে আসবেন, এটাও রেওয়াজ নয়।

—কেন এসেছি জানো ?

—হ্যাঁ, মায়ের কাছে শুনেছি।

—মা ?

—কুঁয়রবাঈকে আমি মা বলে ডাকি। আমার মা মারা গেছেন খুব ছেলেবেলায়।

—হ্যাঁ, আমি জানি।

দুজনেই চুপচাপ কিছুক্ষণ। ভোজরাজ একটু ইতস্তত করলো। তারপর বললো,—রাণাজী আমায় বললেন, আমার পর তুমিই হবে মহারাণা, হয়তো হবে হিন্দুস্তানের সম্রাট। আমার কোনো মতামত তোমার উপর চাপিয়ে দিতে চাই না। আমি চাই তুমি নিজেই একবার দেখে এসো। যিনি হবেন মেবারের মহারানী, হয়তো বা হিন্দুস্তানের মহারানী, তাঁর যোগ্যতা সম্বন্ধে তোমার মনে যেন কোনো দ্বিধা না থাকে।

আমাদের পরিবার থেকে মেয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন মহারাণাজী, তার এটাই কি একমাত্র কারণ ?—মীরা জিজ্ঞেস করলো।

ভোজরাজ অবাক হয়ে তাকালো।

মীরা হাসলো। বললো,—মারওয়াড়ের রাঠোরদের সঙ্গে মেবারের সিসোদিয়াদের চিরকালের বিরোধ। হিন্দুস্তানের সম্রাট হতে হলে রাণাজীকে আগে সব রাজপুত রাজাদের প্রধান বলে স্বীকৃতি পেতে হবে। রাঠোরেরা তো সেটা মানবে না। জোধপুরে নতুন রাজা হয়েছেন রাও গাঙ্গা। তিনি তো রাণাজীর প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং রাণাজী সিরোহীর রাজার সঙ্গে একটা

বোঝাপড়া করে মারওয়াড়ের দক্ষিণদিকে রাও গাঙ্গার একজন প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি করেছেন। বিকানীরের সঙ্গে মারওয়াড়ের ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। পূব সীমান্তে বন্ধু পাওয়ার জন্যে সম্প্রতি বিয়ে করেছেন বুঁদীর রাওয়ল নর্বদ সিং হাডার বোন কারমেতন বাঈকে। আর মেড়তিয়া রাঠোরদের দলে পাওয়ার জন্যে পুত্রবধ্ করতে চাইছেন আমাকে। অথচ রাও গাঙ্গাজীকে শান্ত করে রাখার জন্যে নিজে বিয়ে করেছেন তাঁর বোন ধনবাঈকে। আসলে সবটা রাজনীতি, এই তো কথা ?

ভোজরাজ অবাক হয়ে শুনছিলো। তারপর বললো,—না, সবটা রাজনীতি নয়। তোমার কথা তিনি শুনেছেন। রাও দুদাজী তোমায় কি ভাবে তৈরী করেছেন, তাও তিনি জানেন। আর আমিও আজ দেখলাম,—বিকেলে একবার, এখন একবার। তুমি আমার যোগ্য কিনা আমি যাচাই করে নিয়েছি, এখন তুমি যাচাই করে নাও, আমি তোমার যোগ্য কিনা।

—আমাকে এসব কথা কেন বলছেন ?

—আমি রাণা সাঙ্গার ছেলে। ওঁর মতো আমিও শ্রদ্ধা করি অন্যের মতামতকে। যিনি একদিন হবেন হিন্দুস্তানের মহারানী, তাঁর উপর অভিভাবকেরা নিজেদের মতামত চাপিয়ে দেবেন, এটা আমি চাই না।

মীরা নিজের মনে ভাবছিলো। বললো,—যদি আমি রাজী না হই ?

—আমি তক্ষুনি চলে যাবো। রাণাজীকে গিয়ে বলবো আমি মীরার যোগ্য নই।

—একথা কি সিসোদিয়ার মুখে মানায় ?

—অন্য কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে মানায় না। কিন্তু তোমার কথা আলাদা।

—আপনার মনে কোনো আক্ষেপ থাকবে না ?

—একটুও না। তবে,—তবে হ্যাঁ, যদি ওভাবে চলে যেতে হয় তাহলে মনে একটু কষ্ট পাবো।

হ্যাঁ, আমি জানি।—মীরার গলা ঝাউবনের মতো শোনালো।

—কি জানো ?

—আপনি আমায় ভালোবেসে ফেলেছেন। যেই প্রথম দেখেছেন ঘোড়ার পিঠে, অমনি ভালোবেসেছেন।

ভোজরাজ অবাক হোলো। এত অসঙ্কোচে, এত সহজভাবে আর দশটা সাধারণ কথার মতো একথা বলে ফেললো এই আঠারো বছরের অসাধারণ মেয়েটি,—ভোজরাজের অভিজ্ঞতায় এ একেবারে নতুন। এত গভীর, এত সরল।

এই সহজের ছোঁয়ায় ভোজরাজের মনও তেমনি সহজ হয়ে গেল। হেসে বললো,—কি করে জানলে ?

মীরার মুখ আকাশের চাঁদ। বললো,—আমিও যে একজনকে ভালো-বাসি।

ভোজরাজের মুখখানি কৃষ্ণপক্ষ হোলো।

মীরা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো গিরধরের বিগ্রহকে। ভোজরাজ স্তব্ধ হয়ে শুনলো একটি গানের কলি,—

মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ।
জাকে সির মোর মুকুট, মেরে পতি সোঈ॥

মীরা তাকালো ভোজরাজের দিকে। জিজ্ঞেস করলো,—কি রকম লাগলো ?

—কি ?

—আমার গান ?

ভোজরাজ হঠাৎ হেসে উঠলো। বললো,—মেবারের ভাবী মহারাণা নিজের জন্যে কনে দেখতে এসে শুনছে সে আরেকজনকে ভালোবাসে, আরেক-জন তার পতি, এবং তারপর তাকে অভিমত দিতে হচ্ছে তার গান সম্বন্ধে, এরকম তো কখনও শুনিনি।

—একথাই গিয়ে বলবেন রাণাজীকে।

ভোজরাজ উঠে দাঁড়ালো। বললো,—রাণাজীকে গিয়ে বলবো আপনি ঠিকই খুঁজে বার করেছেন একজনকে, কিন্তু আমি তার যোগ্য নই।

এবার মীরাও উঠে দাঁড়ালো। বললো,—কুঁয়র-সা, সেকথা কেন বলবেন ?

—সত্যি কথাই তো বলছি।

—কুঁয়র-সা, যোগ্য হবার না হবার আপনি কে ? আমার গিরধরজী যিনি আমার মধ্যে আছেন, তিনি তো আপনার মধ্যেও আছেন। আপনার মধ্যে দিয়ে তিনি যদি আমায় ভালো না বাসেন, তাহলে কোত্থেকে আপনার মধ্যে আসবে এই ভালোবাসা, এই শ্রদ্ধা ? আপনার মধ্যে দিয়ে তিনি আমার ভালোবাসা নেবেন এবং আমার জীবনকে ভরিয়ে দেবেন, তা নইলে তিনি আপনাকে এখানে নিয়ে আসবেন কেন ?

ভোজরাজের মুখ আবার শুক্লপক্ষ হোলো। চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো,—আরেকটা কথা। বিয়ের পরও কি গিরধরজীকে নিয়ে পড়ে থাকবে সব সময় ? আমার অবশ্যি তাতে কোনো আপত্তি নেই।

মীরা বললো,—আমার গিরধরজী কি শুধু মন্দিরে? উনি আমার মনের মধ্যে। আমার মন বলছে, মীরা, দেশের সাধারণ মানুষের খুব কষ্ট চারদিকে এত যুদ্ধ, এত দুর্ভিক্ষ, এত অন্যায়, এত অবিচার। রাজাদের শুধু ঐশ্বর্য আর ক্ষমতার লোভ, রানীদের শুধু শৃঙ্গার। আমি চাই আপনি হবেন এমন রাজা যার রাজ্যে কোনো যুদ্ধ বিগ্রহ থাকবে না, কোনো অন্যায় থাকবে না। সেই রাজার রানী হয়ে আমি যদি সাধারণ মানুষের জন্যে কিছু করতে পারি, তাদের সুখী করতে পারি, তাহলেই বুঝবো আমার পূজো গ্রহণ করলেন গিরধরজী।

ভোজরাজ আস্তে আস্তে তার হাত দুটো বাড়িয়ে দিলো মীরার দিকে। মীরা অসঙ্কোচে হাত দুটো নিয়ে নিলো নিজের দুহাতের মধ্যে।

তোমার আর আমার একই স্বপ্ন,—বললো ভোজরাজ।

শুধু স্বপ্ন নয়,—মীরা বললো,—একই পূজো, একই সাধনা।

* * *

আজ তোমার কাহিনী লিখতে বসে সেদিনের সন্ধ্যার সেই ছবি আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি আমার মনের মধ্যে। কিংবদন্তী যাই বলুক, ইতিহাস হয়তো জানে ভারী মধুর, ভারী সুন্দর ছিলো তোমাদের প্রণয় ও ভালোবাসা, তোমাদের দাম্পত্যজীবন। আমি জানি না সংসারনিস্পৃহ ভক্ত কাহিনী-কারেরা কেন চেপে গিয়েছিলো তোমার জীবনের এই পরিচ্ছেদ, কেন ওরা রটিয়েছিলো যে স্বামীর সঙ্গে তোমার কোনো বনিবনাও ছিলো না, তুমি অস্বীকার করেছিলে সংসারধর্ম পালন করতে, তুমি পূজোআর্চা সাধনভজন নিয়েই পড়ে থাকতে এই বাস্তব পৃথিবীর দিকে পেছন ফিরে।

হয়তো ইতিহাসের এক অন্ধকার যুগে সমাজনেতাদের কঠোর নির্মম মন ঠাণ্ডা মার্বেলের তৈরী এক জীবনবিমুখ আদর্শের প্রতিমূর্তি গড়ে তুলতে চেয়েছিলো, এবং তার জন্যে ব্যবহার করেছিলো তোমার নাম।

আমি শুধু জানি, মনের চোখ দিয়ে আমি শুধু দেখতে পাচ্ছি পনেরো শ' ষোলো খ্রীষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায় মেড়তা শহরের ছোটো মহলের পূজোর ঘরে তোমার সামনে দাঁড়িয়ে আছে এক দীর্ঘ সুঠাম তরুণ, যার নাম ভোজরাজ, যার চোখে একটা স্বপ্ন, যার হাত দুটো তুমি তুলে নিয়েছো নিজের হাতের মধ্যে, তুমি এক অষ্টাদশী।

আর ঠিক সেই সময় বৃন্দাবন আর উত্তরভারত পরিভ্রমণ শেষ করে পুরীতে ফিরে এসেছেন শ্রীচৈতন্য।

মীরার বিয়ে হয়ে গেল ভোজরাজের সঙ্গে। কেটে গেল আরো কয়েক মাস। এলো পনেরো শ' সতেরো খ্রীষ্টাব্দ। দিল্লীর সুলতান সিকন্দর লোদী মারা গেছে। নতুন সুলতান হয়েছে ইব্রাহিম লোদী। কাবুলে বাবরের সঙ্গে দেখা করেছে আজমীরের এক অভিজাত মুসলমান সওদাগর।

—রাণা সাঙ্গাজী বলছেন আপনি যদি হিন্দুকুশ পেরিয়ে গিয়ে সিন্ধু পর্যন্ত এলাকা নিজের দখলে আনেন, তিনি আপনাকে সাহায্য করতে রাজী আছেন।

—কি ভাবে?

—সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে ওঁর ভাই জৌনপুরের সুলতান জালাল খানের যুদ্ধ বেধে গেছে। রাণা সাঙ্গা পেছন থেকে আক্রমণ করে দখল করবেন দিল্লী থেকে সিন্ধু পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল।

বাবর কিছুক্ষণ পায়চারি করলো।

তারপর বললো,—না, এখন নয়। এখনও সময় হয়নি।

—তাহলে কখন?

—আরো সাত আট বছর পরে।

॥ পাঁচ ॥

রাণা সাঙ্গার মা রতনকুঁয়র ঝালী সৌরাষ্ট্রদেশের এক ছোটো রাজ্যের অধিপতি রাও রাজধন ঝালার মেয়ে। রাঠোরদের সঙ্গে রাজধন ঝালার সদ্ভাব ছিলো না। এজন্যে রাঠোরদের সম্বন্ধে ভালো ধারণা ছিলো না রানী ঝালীরও। পুত্রবধূদের মধ্যে রানী ধনবাঈ রাঠোর রাজকন্যা, তাই তাকেও পছন্দ করতো না। ভালোবাসতো বড়োরানী কুঁয়রবাঈকে। দরবারের কয়েকজন সর্দার যাদের খুব প্রতিপত্তি, ওরা রাঠোরদের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক রাখতে চায় যাতে রাণার ক্ষমতা নিরঙ্কুশ না হয় এবং তাদের উপর রাণাকে নির্ভর করতে হয়। মেবারের রাজনীতির এই জটিলতা রানী ঝালীর অজানা ছিলো না। রাণা সাঙ্গা তৈরী হচ্ছে দিল্লীর সঙ্গে একটা চূড়ান্ত সংঘর্ষের জন্যে, তাই রাণা রাঠোরদের সঙ্গেও একটা মিটমাট করে নিতে চায়, এবং এজন্যেই নিজে বিয়ে করেছে মারওয়াড়ের রাঠোর রাজকন্যা ধনবাঈকে, তারপর যুবরাজ ভোজরাজেরও বিয়ে দিয়েছে মেড়তিয়া রাঠোর মীরাবাঈয়ের সঙ্গে। এই নীতিও খুব পছন্দ করেনি রাজমাতা রতনকুঁয়র ঝালী।

কিন্তু ছেলেকে মানা করেনি। ছেলের উপর খুব বিশ্বাস।

বড়োরানী কুঁয়রবাঈয়ের পুরো নাম কুঁয়রণবাঈ। রাওলা অর্থাৎ রাজমহলে কুঁয়রবাঈ নামটিই চলতো। সেকালে সেটা খুব সাধারণ নাম। অনেকেরই সে নাম থাকতো, যেমন মীরার জ্যাঠাইমার নামও কুঁয়রবাঈ। কুমার শব্দ থেকে অপভ্রংশে মাঝখানের "ম" লোপ পেয়ে কুঁয়ার, লোপ পেলো আকারটিও, হোলো কুঁয়র। কুমারী থেকে কুঁয়ারী, তার থেকেও আকার এবং দীর্ঘ-ঈকার দুটোই লোপ পেয়ে কুঁয়র। কুমার সাহেব থেকে কুঁয়র-সা' এবং বাঈ সাহেবা থেকে বাঈ-সা'। ফারসী ভাষার সাহেব কথাটা তখন এভাবে সংক্ষিপ্ত হয়ে চালু হয়ে গেছে।

বড়োরানী কুঁয়রবাঈ এসে বোঝাতো রাজমাতা রতনকুঁয়র ঝালীকে। ঝালী তার কথায় সায় দিতো। সান্ত্বনা দিতো। কিন্তু তার হয়ে কিছু বলতে যেতো না সাঙ্গাকে।

কুঁয়রবাঈয়ের প্রথম থেকেই আপত্তি ছিলো যুবরাজ ভোজরাজের সঙ্গে মীরার বিয়েতে। হতে পারে মীরা রাজবংশের মেয়ে, তার ঠাকুর্দা রাও দুদা মারওয়াড়েরই কনিষ্ঠ রাজপুত্র এবং মেড়তা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মীরার জ্যাঠা বীরমদেবজী নিজেও মেড়তার রাজা। কিন্তু তাহলেও মেড়তা রাজ্য খুবই ছোটো। রাও জোধা নিজের ছেলেদের মধ্যে গণ্ডগোল না বাধানোর জন্যে দুদাকে এক টুকরো পরগণা দিয়ে বলেছিলো, এই মেড়তা তোমার রাজ্য, তুমি এখানকার রাজা। আরেক ছেলে বিকাকে দিয়েছিলো অন্য একটি এলাকা। সে চালাক লোক, নিজের রাজ্য আরো বড়ো করে তার নাম দিয়েছে বিকানীর, এখন সে রাজ্যের কিছু ইজ্জত আছে। কিন্তু মেড়তা? ওটা একটা রাজ্য? এবং সেখানকারই এক কনিষ্ঠ রাজপুত্র রতন সিংজী, তারই মেয়ে মীরা, যেই রতন সিংজী এখন চিতোর দরবারের একজন সর্দার। এমন মেয়েকে করতে হোলো যুবরাজের বৌ? যে পরে হবে মেবারের মহারানী? কেন, রাজপুতানায় মেবারের সিসোদিয়াদের পালটি ঘর নেই?

একথা কুঁয়রবাঈ বোঝাবার চেষ্টা করেছিলো রাণাজীকে। রাণা সাঙ্গা উত্তর দিয়েছিলো গরীব আহীরের মেয়েও মেবারের রাজরানী হয়েছে, এবং তারই ছেলের মতো রাণা মেবারে এ পর্যন্ত হয়নি।

কুঁয়রবাঈ রানী ঝালীকে বোঝালো, আসল ব্যাপারটা হচ্ছে মেড়তার রাও বীরমদেবজী অনেক লড়াইতে রাণাজীর পাশে পাশে ছিলো, রতন সিংজী এখনও রাণাজীর সঙ্গে ছায়ার মতো ঘোরে, তাই ওদের সম্বন্ধে রাণাজীর একটা দুর্বলতা আছে।

রানী ঝালী কোনো উত্তর দিলো না। ঝালী জানতো কুঁয়রবাঈয়ের আসল দুঃখটা কোথায়। কুঁয়রবাঈয়ের বাপের বাড়ির লোকেরা গোদওয়াড়ার সোলাঙ্কি। কুঁয়রবাঈয়ের বাবা রায়মল সোলাঙ্কির ইচ্ছে ছিলো সোলাঙ্কি-পরিবারের একটি মেয়ে দেয় ভোজরাজের হাতে। সোলাঙ্কিরা রাঠোরদের পছন্দ করে না। ওরা কুঁয়রবাঈয়ের মারফতে মেবার দরবারের উপর প্রভাব খাটাতে পারেনি। ওদের আশা ছিলো ভোজরাজের হাতে একটি সোলাঙ্কি-কন্যা গছিয়ে দিয়ে যদি সেটা পারে।

কুঁয়রবাঈ ঝালীকে বলেছিলো,—কেমন তরো এক বৌ এলো যুবরাজ-বধূ হয়ে। সে নাকি বাপের বাড়িতে মন্দিরে বসে ভজন গাইতো। মেবারের যুবরাজবধূ এখন বুঝি কুম্ভশ্যামের মন্দিরে বসে গান গাইবে। এটাই বাকী আছে। রাণাজী বললো, মেয়েটি শুধু ভজন গায় না, সে ঘোড়ায় চড়তে পাবে, তলোয়ার ধরতে জানে, খুব ভালো তীরন্দাজ। রাজনীতি বোঝে।

কুঁয়রবাঈ বললো, —আমি মেবারের মহারানী, আমি ভজনও গাই না, তীরও ছুঁড়ি না, ঘোড়ায়ও চড়ি না, আমায় তলোয়ারও ধরতে হয় না। আমি রাজনীতিও বুঝিনা। এবং বুঝতে চাইনা। তাতে কি আমার বা মেবারের কোনো ক্ষতি হয়েছে ? আমি জানি মেবারের ভাবী মহারাণার মাতৃকুলও হবে মেবার রাজবংশের পালটি ঘর। রাজত্ব করে রাজা,—রানী নয়। আপনার ছেলে কি বললো জানেন ? যে রাজ্যের উপর রাজত্ব করবে ভোজরাজ, তার তার সীমানা হিন্দুকুশ থেকে ব্রহ্মপুত্র পর্যন্ত, নর্মদা থেকে হিমালয় পর্যন্ত, সুতরাং তার জন্যে নতুন ধরনের রানী চাই।

কুঁয়রবাঈ বলে গেল,—আপনার ছেলে স্বপ্ন দেখতে চায় দেখুক, ভোজরাজের জন্যে এ কেমনতরো একটি বৌ আনলো ?

এ প্রশ্ন রানী ঝালীর মনেও ছিলো। ছেলের যা স্বপ্ন, তাতে আপত্তি নেই। রানী ঝালীও জানতো, সারা উত্তরাপথের যা পরিস্থিতি, সাঙ্গার আর না এগিয়ে উপায় নেই। কিন্তু মীরা ? হ্যাঁ, ওর সম্বন্ধে প্রশ্ন ঝালীর মনেও ছিলো।

কুঁয়রবাঈ বলেছিলো,—রাণাজীর ভালোবাসা এখন ধনবাঈয়ের জন্যে অনেক বেশী। ওর ছেলে রতনকে আজকাল চোখের আড়াল করতে চায় না। যে সব সর্দার রাঠোরদের পক্ষে ওরা এখন থেকেই রাণাজীর মন ভোজরাজের উপর বিরূপ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

প্রথমে একথা বিশ্বাস করতে চায়নি রতনকুঁয়র ঝালী। রাণাজী

ভোজরাজকে খুব ভালবাসে। তাকে নিজের হাতে তৈরী করেছে। সেই তো মেবারের টিকায়েত,—ভাবী মহারাণা।

কিন্তু বার বার বলে বলে কুঁয়রবাঈ রতনকুঁয়র ঝালীর মনে কথাটা ঢুকিয়ে দিলো। ভোজরাজের বৌ মীরাবাঈ রাঠোরকন্যা হলেও জোধপুরের রাঠোরদের সঙ্গে তার সম্পর্ক একটু দূর। মেড়তার রাঠোরদের তেমন বনিবনাও নেই জোধপুরের রাঠোরদের সঙ্গে। কিন্তু মেজো রানী ধনবাঈ জোধপুরের রাজকন্যা।

সুতরাং ?—জিজ্ঞেস করেছিলো রতনকুঁয়র ঝালী।

কুঁয়রবাঈ সতর্কভাবে এদিক-ওদিক তাকিয়েছিলো। তারপর উত্তর দিয়েছিলো—খুব গোপনে একটা দল তৈরী হচ্ছে দরবারে। ওদের টাকাকড়ি দিয়ে সাহায্য করছে জোধপুর। কয়েক বছরের মধ্যেই চিতোরগড়ের রাঠোর-পক্ষ খুব শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

—উদ্দেশ্য ?

—এখন মনে হচ্ছে অসম্ভব। কিন্তু কয়েক বছর পরে তেমন অসম্ভব মনে নাও হতে পারে। ওরা ভোজরাজকে ঠেকিয়ে কিংবা একবারে সরিয়ে দিয়ে রতনকে গদীতে বসাবার চেষ্টা করতে পারে।

—রাজার বড়ো ছেলেকে সরিয়ে মেজো ছেলেকে রাজা করবে ? সেও কি সম্ভব ?

কুঁয়রবাঈ বললো,—রাণা সাঙ্গা কি রাণা রায়মলজীর বড়ো ছেলে ছিলেন ?

একথার কোনো উত্তর নেই। কথাটা সত্যি। গদির জন্যে রাণা রায়মল্লের ছেলেদের মধ্যে বেশ ঝগড়া হয়েছিলো। তবু ভোজরাজের ব্যাপারে রাজমাতা ঝালী মহারানী কুঁয়রবাঈয়ের কথা প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারেনি। কিন্তু পরে অনেক কিছু লক্ষ করে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করলো।

কুঁয়রবাঈয়ের কাছে বেশী আসে না রাণা সাঙ্গা। কোন রাজা তার তরুণী স্ত্রীদের ছেড়ে বয়েস হয়ে যাওয়া বড়ো রানীর কাছে বেশী যায় ? কিন্তু রাণা ছোটো রানীর কাছেও তো বেশী যায় না। নতুন বিয়ে করেছে বুঁদীর রাজকন্যা কারমেতনবাঈকে। অথচ তার জন্যেও তো তেমন ভালোবাসা নেই। রাণাজীর বেশী যাওয়া আসা মেজোরানী ধনবাঈ রাঠোরের মহলে।

কারমেতন বাঈয়ের একটি ছেলে হয়েছে,—নাম বিক্রমজিত। কিন্তু তার জন্যেও রাণাজীর তেমন স্নেহ দেখা যায় না। বরং আজকাল সঙ্গে সঙ্গে রাখে ধনবাঈয়ের ছেলে শিশু রাজকুমার রতন সিংহকে।

মহারানী কুঁয়রবাঈয়ের সবচেয়ে বেশী অপছন্দ যুবরাজবধূ মীরাবাঈকে।

ওর সঙ্গে বিয়ে হওয়ার পর ভোজরাজও কিরকম যেন বদলে গেছে,—কুঁয়রবাঈ বলছিলো রাজমাতা ঝালীকে।

ভোজরাজ আজকাল আর শিকার করতে যায় না। এবার আহেরিয়া উপলক্ষে রাণার সঙ্গে যায় নি। আগে মহলের ভিতর তাকে দেখা যেতো না। আজকাল সন্ধ্যে হতে না হতেই চলে আসে মীরার কাছে।

একটু হেসেছিলো মহারানী রতনকুঁয়র ঝালী। নতুন বিয়ে করেছে। ভালোবাসে নিজের বৌকে।

শুধু ভালোবাসা নয়,—উত্তর দিলো মহারানী কুঁয়রবাঈ। মীরা ওকে জাদু করেছে।

এককালে তুমিও তো জাদু করেছিলে সাঙ্গাকে এবং সেদিন আমিও সেটা পছন্দ করিনি,—হেসে শাশুড়ি রতনকুঁয়র ঝালী বললো পুত্রবধূ মহারানী কুঁয়রবাঈকে।

মীরা তো তার ভজনপূজন নিয়েই আছে,—বললো কুঁয়রবাঈ,—গান গাইছে সব সময়। আর ভোজরাজও সেই গান শুনে পাগল।

ঝালী তো কুঁয়রবাঈকে তেমন আমল দিলো না। তখন রাণা সাঙ্গাকেও বোঝাবার চেষ্টা করলো কুঁয়রবাঈ।

—শুনেছেন একটা কথা?

—কি?

—বিয়ের অনুষ্ঠানের সময় মীরা ভোজরাজকে প্রদক্ষিণ করতে চায় নি। বলেছিলো, গিরধরজীই আমার স্বামী। আমার বিয়ে হবে তার সঙ্গেই।

বিয়ের অনুষ্ঠান ভেতরের মহলে,—পর্দার মধ্যে। সেখানে বর নিজে ছাড়া অন্য কোনো পুরুষ মানুষ যেতে পারে না, থাকতে পারে শুধু রাজপুরোহিত। অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে রাণা সাঙ্গাও বসেছিলো বাইরের মহলে। একান ওকান ঘুরে কথাটা উঠেছিলো রাণার কানেও।

ব্যাপারটা আসলে কি হয়েছিলো আমি জানি,—বললো রাণা সাঙ্গা,—মীরা প্রথমে গিরধরজীকে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করে, তারপর ভোজরাজকে প্রদক্ষিণ করেছিলো।

তখন মহলের মেয়েরা নানারকম কথা বলেছিলো। কেউ বললো,—মীরাকে যখন বলা হোলো মালাবদলের আগে প্রদক্ষিণ করতে হবে, সে ভুল করে ভেবেছিলো প্রদক্ষিণ করতে হবে গিরধরজীর মূর্তিকে। তারপরে ভুল

শুধরে নিলো। একথা নিয়ে খুব রসালো আলোচনা হোলো চিতোরগড়ের রাওলার মেয়েদের মধ্যেও। এবং মেয়েদের মুখে মুখে কথাটা অন্যরকম অর্থ নিলো।

এমন কথা তো কোনোদিন শুনিনি,—কুঁয়রবাঈ বলেছিলো গালে হাত দিয়ে।

আমি বিশ্বাস করিনি এসব কথা,—বললো রাণা সাঙ্গা।

—কেন?

—রাওলার মেয়েদের তো আমি চিনি।

—মানে?

—ওদের কথার মধ্যে কতোটা সত্যি কতোটা মিথ্যে বলা মুশকিল। রাজমহলের মেয়েদের তো পরনিন্দা আর পরচর্চা করা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই।

—সবাই যখন বলছে, কথাটা নিশ্চয়ই সত্যি। গিরধরজীর বিগ্রহ থাকবে মন্দিরে, বিয়ের সময় কেন ভিতরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিলো?

রাণা বারুদ হয়ে উঠলো। বললো—দেখ বাঈ-সা', এসব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মাথা, ঘামানোর সময় আমার নেই। ওদের বিয়ে হয়ে গেছে, ওরা সুখে ঘর করছে, আমার কাছে তাই যথেষ্ট।

—কিন্তু মেবারের টিকায়েতের পত্নীকে নিয়ে রাওলার অন্যান্য মেয়েরা যে এসব আলোচনা করবে, সেটা ঠিক নয়।

—সত্যি সত্যি কি হয়েছিলো আমরা কেউ জানিনা। আমার ধারণা মেড়তার মহলে বিয়েতে এসেছিলো যে সব রাঠোর মেয়েরা, তারাই এসব রটিয়েছে।

—কেন?

—হিংসে।

—মীরা নাকি বলেছিলো, আমার স্বামী গিরধরজী, অন্য কেউ নয়, প্রদক্ষিণ করবো শুধু তাকে।

রাণা সাঙ্গা হাসলো। বললো,—তোমার স্বামীও গিরধরজী, আমি তার প্রতিনিধি।

—ঠাট্টা নয়।

ঠাট্টা?—আবার চটে গেল রাণা সাঙ্গা,—সামান্য তুচ্ছ ব্যাপারকে তোমরা এত বড়ো করে তোলো কেন? মীরা যখন খুব ছোটো ওর মাকে জিজ্ঞেস

করেছিলো, আমার বর কোথায়? বাচ্চা মেয়ে, এরকম প্রশ্ন খুব স্বাভাবিক। মীরার মা কুসুমকুঁয়র বলেছিলো,—ওই গিরধরজীই তোমার স্বামী। উত্তরটাও খুব স্বাভাবিক। হয়তো এখন বিয়ের সময় একথা নিয়ে কেউ ঠাট্টাতামাশা করে থাকবে। তারপর এসব কথা ফেনিয়ে ফুলিয়ে তোমাদের মুখে সাপের বিষ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মহারানী কুঁয়রবাঈ ছোবল মারবার জন্যে ফণা তুলেছিলো কিন্তু রাণা সাঙ্গা সরে গেল সময় মতো।

কুঁয়রবাঈ রাণা সাঙ্গার নামে নালিশ করেছিলো রাজমাতা রতনকুঁয়র ঝালীর কাছেও।—মীরার ঢলঢলে মুখ। এই দেখে মোম হয়ে গেছে রাণাজীর মন। বড় বেশী স্নেহ পুত্রবধূর জন্যে। সব সময় তার জন্যে গয়না আসছে, ঘাগরা চুনরী আসছে, ফল আসছে, মিষ্টি আসছে। কী চালাক মেয়েটি। বলছে সব সোনাদানা আমার গিরধরজীর। সব ফল মিষ্টিও আমার গিরধরজীর পূজোর জন্যে। আমরা শ্বশুরের সামনে পর্দা করতাম। সামনে বেরোতাম না। পূজো পার্বণ তেঁওহার উৎসবের সময় প্রণাম করতে যেতে হলে সারা মুখের উপর জরির ঘুংঘট টেনে তারপর যেতাম। মীরা পর্দা করে না। ঘুংঘট টেনে মুখ ঢাকে না। সে বলে, বাবার সামনে মেয়ের মুখের উপর ঘুংঘট থাকবে কেন? মীরা ভজন গেয়ে শোনায় রাণাজীকে। বৌ শ্বশুরকে গান গেয়ে শোনাচ্ছে, এমন কথা কি কেউ কোনোদিন ভাবতে পেরেছে চিতোরগড়ের মহলে?

রানী ঝালী মাথা নাড়লো। সত্যি, যুবরাজবধূর নামে কোনো নালিশ করা যায় না রাণাজীর কাছে। রাণাজী রাগ করে।

বিয়ের পর যখন নতুন বৌ চিতোরগড়ে এলো তখন চিরকালের প্রথামতো তাকে মহলের বাইরে কালীজীর মন্দিরে ঢুকে দেবীকে প্রণাম করে আসতে বলা হোলো।

মীরা বললো,—না।

রাজমাতা বললো, মহারানী বললো, সবাই বললো।

মীরা বললো,—না।

কী উদ্ধত যুবরাজবধূ,—বললো রাওলার মেয়েরা,—কী উদ্ধত আমাদের টিকায়েতের বৌ মেড়তার এই মেয়েটি।

রানী ঝালী নিজে গিয়ে নালিশ করেছিলো রাণাজীকে। রাণাও রাগ করেছিলো। বললো, বেশ, তাহলে মহলে ঢুকতে পাবে না। বাইরেই থাকবে। মহাভূতালয়ে একটা কুঁড়ে ঘর করে দাও ওর জন্যে।

সমিধেশ্বর মন্দিরের পাশে রাজবংশের শ্মশান। ওই দিকটাকে বলা হোতো মহাভূতালয়। মীরা বললো,—বেশ, সেখানেই থাকবো।

ভোজরাজ এসে বললো,—রাণাজী, মীরা বলেছে আপনি যদি জানতে চান মীরা নিজের মুখেই আপনাকে বলবে কেন মীরা কালীজীর মন্দিরে ঢুকবে না।

—তোমাকে বলেছে?

—হ্যাঁ।

—তুমি মেনে নিয়েছো?

—হ্যাঁ।

রাণা সাঙ্গা বললো,—তাহলে আমি জেনে আর কি করবো। মহারানীকে জানিয়ে দাও, আমার হুকুম হয়েছে, মীরাবাঈ মহলের ভিতরে যেতে পারবে, কোনো বাধা নেই।

মীরা যখন প্রণাম করতে এলো শ্বশুরকে, শ্বশুর দু-ছড়া মুক্তোর মালা দিলো। বললো, একটি তোমার, একটি গিরধরজীর। আমি কিছু জানতে চাই না। কিছু শুনতে চাই না। শুধু মনে রেখো, আমি তোমায় বিশ্বাস করি। ভোজরাজ তোমায় ভালোবাসে। সেটাই সব কথার শেষ কথা।

মহলের মেয়েরা থ' হয়ে গেল, চুপ মেরে গেল। তারপর আবার গুঞ্জন শুরু হোলো। নিশ্চয়ই জাদু জানে। মেড়তার মহলে অনেক সাধু সন্ন্যাসী আসতো। মীরা তাদের দেখাশোনা করতো। নিশ্চয়ই কিছু তুকতাক শিখেছে তাদের কাছে।

কিছুদিন সবাই চুপ করে রইলো। মাসের পর মাস কেটে গেল, বছর ঘুরে গেল। মীরা ওর নিজের মতন একলা থাকে। কারো সঙ্গে বেশী মেলামেশা করে না, মহলের অন্যান্য রাজপুতানীদের উৎসব তেওহারে যোগ দেয় না বড়ো একটা। নিজের মহলে আলাদা করে পুজোর জায়গা করে নিয়েছে তার গিরধরজীর বিগ্রহের জন্যে। সেখানেই পড়ে থাকে সব সময়। শুধু সন্ধ্যের পর যখন যুবরাজ মহলের ভিতর আসে, তখন চলে আসে তার কাছে।

কি বলে ওরা?

রানীদের খুব কৌতূহল। মহলের ভিতরে রানীদেরও নিজস্ব গুপ্তচর আছে। লুকিয়ে শুনবার চেষ্টা করলো।

আশ্চর্য ব্যাপার! স্বামী-স্ত্রীদের মধ্যে যেরকম কথাবার্তা সেরকম কিছু নয়। লোদীদের কথা বলে, বাবর নামে কে এক বাদশা আছে কাবুলে

তার কথা বলে। জৌনপুর গুজরাট এসব জায়গার দরবারের নানা ব্যাপার আলোচনা করে। কিছুই বুঝি না। জানিও না অতো কথা।

সে তো প্রথম কিছুক্ষণ। তারপর কি বলে? সেটাই তো আসল জানবার ব্যাপার। আবার আড়ি পাতো। আবার ভালো করে শোনো।

সত্যি, ওদের ব্যাপার স্যাপার বুঝিনা। নানকের কথা বলছে, কবীরের কথা বলছে, তুলসীদাসের কথা বলছে, বাংলাদেশের চৈতন্য নামে কে এক সাধু নাকি সারা দেশ ঘুরে পুরীতে গিয়ে বসেছে, উড়িষ্যার রাজাও নাকি আবার তৈরী হচ্ছে বাংলার সুলতানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। রাজাবাদশার কথার সঙ্গে সাধুসন্তের কথা কি করে ওঠে বুঝি না।

মীরাবাঈ সেদিন কুমার ভোজরাজকে কি বলছিলো জানেন? সারা দেশকে এক করতে হলে শুধু তলোয়ার দিয়ে হবে না। গুরু নানক, সন্ত কবীর, চৈতন্যদেব এদেরও চাই। সারা দেশকে মজবুত করতে হলে শুধু সৈন্যসামন্ত দিয়ে হবে না, সাধারণ মানুষকেও সঙ্গে চাই।

কী সর্বনাশ, এই মেড়তিয়া রাঠোর মেয়েটি কি মেবারের প্রধানমন্ত্রী হতে চায় নাকি?

কুমার ভোজরাজ রাণা হলে তো এই মেয়েটিই দেখছি রাজত্ব চালাবার মতলব আঁটছে। রুখতে হবে, যেমন করেই হোক রুখতে হবে এই মেয়েটিকে।

অন্য রাস্তা ধরলো মহারানী কুঁয়রবাঈ। রাণা সাঙ্গাকে গিয়ে বললো,— ভোজরাজের আরেকটি বিয়ে দেওয়া দরকার।

—কেন?

শুধু একটি বৌ থাকলে, তার বশ হয়ে থাকবে। এটা ঠিক নয় মেবারের যুবরাজের জন্যে। এতে কর্তব্যে অবহেলা হবে।

সাঙ্গা প্রথমে একটু হাসলো। তারপর গম্ভীর হোলো। বললো,— ভোজরাজকে আমি তোমার চাইতে অনেক ভালো চিনি।

আরো একটি কারণ আছে,—বললো কুঁয়রবাঈ।

—বলো।

একটু ইতস্তত করার ভান করলো মেবারের মহারানী। রাণা সাঙ্গা বুঝলো এটা শুধু দেখানোর জন্যে। কুঁয়রবাঈয়ের মনে কোনো সঙ্কোচ নেই। অন্যে কি মনে করলো না করলো সে পরোয়া করে না।

—হ্যাঁ, বলো।

—আমি বলছিলাম কি, আপনিও সেদিন বিয়ে করেছেন কারমেতনবাঈকে। এরই মধ্যে আপনার ছেলে হয়েছে। আমার সঙ্গে বিয়ের পর ভোজরাজের জন্ম হতে বেশী দেরি হয়নি। রতন সিংহের জন্মও ধনবাঈয়ের সঙ্গে আপনার বিয়ের বছর ঘুরবার সঙ্গে সঙ্গেই। কারমেতনবাঈকে বিয়ে করলেন সেদিন। এরই মধ্যে বিক্রমজিতের জন্ম হোলো। কিন্তু মীরার এখনও ছেলেমেয়ে হয়নি। আমার ধারণা, অন্যান্য স্বামী স্ত্রী যেভাবে থাকে, সেরকম সম্পর্ক ভোজরাজ আর মীরার নেই।

তোমার তাই ধারণা?—নির্বিকারভাবে বললো মহারাণা সাঙ্গা,—কেন?

—ওদের বিয়ের পর এক বছরেরও বেশী হতে চললো। এখনও মীরার ছেলে হবার কোনো লক্ষণই নেই।

—তাতে কি? অনেকেরই ছেলেমেয়ে হতে দেরি হয়। এ নিয়ে আমাদের চিন্তিত হবার কোনো কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না।

রাণাজী বিশ্বাস করলেন না,—কুঁয়রবাঈ গিয়ে অনুযোগ করলো ঝালীর কাছে,—আমার ধারণা কিন্তু ঠিক। বাওলার অন্য মেয়েরাও তাই বলছে। প্রথম থেকেই আমি বলে আসছি এ বিয়ে ভুল ;হয়েছে, এতে কারো ভালো হবে না।

মহারানী যা বললো, সে রকম একটা সন্দেহ উঁকি মারছিলো রাজমাতার মনেও। ঝালী গিয়ে একদিন নিজেই কথা পাড়লো রাণার কাছে।

ভোজরাজ যদি রাজী হয়, আমার আপত্তি নেই,—বললো রাণা সাঙ্গা।

ডেকে পাঠানো হোলো ভোজরাজকে। তাকে বলা হোলো সিসোদিয়া রাজকুমারের, বিশেষ করে যে পরে গদী পাবে, তার শুধু একজনই পত্নী থাকবে, মেবার রাজবংশের এটা রীতি নয়।

ভোজরাজ উত্তর দিলো,—তাই যদি আপনার আদেশ হয়, আমিও আপত্তি করবো না, মীরাও মেনে নেবে। কিন্তু আমি একথাও লুকোতে চাইনা, এতে আমার নিজের সম্মতি নেই।

রাণা সাঙ্গা হাসলো। জিজ্ঞেস করলো,—কেন?

মীরার পাশে আর কাউকে আমার চোখে লাগবে না,—ভোজরাজ বললো কোনো কুণ্ঠা না দেখিয়ে।

মহারানী কুঁয়রবাঈয়ের মুখ মরুভূমির সূর্য হোলো। রাজমাতা ঝালীও অবাক হোলো। শুধু শরতের সকালবেলা মনে হোলো রাণা সাঙ্গাকে।

তবু একবার বললো,—রাণার ছেলেদের, বিশেষ করে যুবরাজকে, আরো কয়েকটা বিয়ে করতে হয়। এটা শুধু সংসার করার জন্যে নয়। অন্য শক্তিশালী রাজবংশের সঙ্গে একটা আত্মীয়তার সম্পর্ক তৈরী করার জন্যে, নানা রাজনৈতিক প্রয়োজনে।

ভোজরাজ সহজভাবে উত্তর দিলো,—আপনি যা বলবেন।

সে চলে যাওয়ার পর রাণা সাঙ্গা ওদের দিকে তাকিয়ে বললো,—তোমাদের ধারণা ভুল। ওরা স্বামী স্ত্রী এবং এবং সম্পর্কও সেরকমই। তোমরা যে বলছো সেরকম নয়, সেটা মহলের বানানো কথা।

বানানো কথা?—তোপের ফেটে যাওয়া গোলা হোলো কুঁয়রবাঈ।

ভোজরাজের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছ?—বললো রাণা সাঙ্গা, যে স্বামী তার স্ত্রীকে নিয়ে একটুও সুখী নয়, তার মুখে ওরকম আলো থাকতে পারে?

কুঁয়রবাঈ বললো,—সে যাই হোক, আমি আমার ছেলের আরেকটি বিয়ে দেওয়া দরকার মনে করি।

—সে তোমার একলার ছেলে নয়। সে আমারও ছেলে। আমি তার আরেকটি বিয়ে দেওয়া মোটেও দরকার মনে করি না।

—কেন?

—শ্রীরামচন্দ্রজীর একটি মাত্র স্ত্রী ছিলো, সীতা। আমি চাই তাঁরই মতো আদর্শ রাজা হবে আমাদের ছেলে। আমি চাই রাম ও সীতার মতো মীরা আর ভোজরাজকেও আদর্শ দম্পতি মনে করবে হিন্দুস্তানের সাধারণ মানুষ। ভুলে যেওনা, একদিন হয়তো সারা হিন্দুস্তানের একচ্ছত্র অধিপতি হবে আমাদের ছেলে ভোজরাজ। এই আমার জীবনের একমাত্র স্বপ্ন। আমি জানি আমার উদ্দেশ্য সফল হবেই। হতেই হবে। এ রকম সুযোগ ইতিহাসে আসেনি। বহুকাল আসবে না।

কুঁয়রবাঈ রাগে ফুলছিলো। বললো,—সীতা? রামচন্দ্র? হুঁঃ! তাহলে তার আগে ওদের দুজনকে চোদ্দো বছরের জন্যে বনবাসে পাঠিয়ে দাও।

কুঁয়রবাঈ রাগ করে উঠে চলে গেল। আর নিজের মনে হাসতে লাগলো রাণা সাঙ্গা।

মহারানী ঝালী এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিলো। এবার বললো,—কিন্তু রাজপুতানার অন্যান্য রাজবংশের সঙ্গেও তো আমাদের নতুন নতুন সম্পর্ক দরকার।

তার জন্যে রতন সিংহ আছে, বিক্রমজিত আছে।

—ওরা তো এখনও খুব ছোটো।

—আমাদেরও কোন তাড়া নেই।

মীরার নামে নালিশ করে কোনো লাভ হয়না। রাণাজী ওকে খুব ভালোবাসে, যুবরাজ ওকে আগলে রাখে। কারো কিছু বলার সাহস নেই।

মীরা আমাকেও মানতে চায় না,—কুঁয়রবাঈ চোখের জল ফেলে জানায় ঝালীকে।

—কেন? কোনোদিন কিছু বলেছে? কারো সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেছে বলে তো শুনিনি।

—না, তা করেনি। কিন্তু আমার জেনানা দরবারে যখন সর্দারদের বৌয়েরা আসে নজর নিয়ে, মীরারও তো সেখানে থাকা উচিত। ওকে বলেছিলাম। আসে নি। বলে পাঠালো, একমাত্র গিরধরজীর দরবারে ছাড়া আর কারো দরবারে সে যায় না।

ঝালী সায় দিলো। এটা তো খানিকটা অসম্মান বটেই। মহারানীর জেনানা দরবারে যুবরাজবধূরও থাকা উচিত।

অন্দর মহলের সর্বেসর্বা রাজমাতা রতনকুঁয়র ঝালী। তার নির্দেশেই সব কিছু চলে। কিন্তু এখন বয়েস হয়ে যাচ্ছে। তাই কারো কোনো ব্যাপারে নিজে আর বেশী আগ্রহ বোধ করে না। প্রথম বয়সে কাশীতে গিয়ে দীক্ষা নিয়েছিলো সন্ত রইদাসের কাছে। এখন সাধন ভজনেই সময় কাটে। নিজের মহলে পূজো ভজন শাস্ত্রপাঠ এসব লেগেই থাকে। রাওলার সব মেয়েরাই আসে। মীরা কোনোদিন আসেনি। ডাকলেও হয়তো আসবে না, তাই তাকে কোনোদিন ডাকেও নি।

এবার একটু কৌতূহল হোলো। সবারই মুখে শোনে মীরার বিগ্রহ গিরধরজীর কথা। মীরার পূজোয় কেউ যায় না। যখন ভজন হয়, তখনও কেউ থাকে না। মহারানী কুঁয়রবাঈ, রানী কারমেতনবাঈ কারো সুনজর নেই মীরার উপর, সুতরাং রাওলার অন্যান্য মেয়েদের মুখেও দুটো ভালো কথা নেই মীরার সম্বন্ধে।

কিন্তু ওদের মুখে মাঝে মাঝে শোনা যায় মীরার ভজনের একটি পংক্তি। ওরা বলে মীরা কাউকে মানে না, শ্বশুর মহারাণাজীকে নয়, যুবরাজ স্বামীকে নয়, মহারানী, অন্যান্য রানী কাউকে নয়। ওরা বলে মীরা বড় দাম্ভিক,

মহলের কাউকে সে মেলামেশার যোগ্য মনে করে না। এসব কথা বলে ব্যঙ্গ করে সুর করে শোনায় মীরার গান,—

মেরে তো গিরধর গোপাল

দুসরো না কোঈ…।

গানটা শুনে কিন্তু রতনকুঁয়র ঝালীর ভালো লেগেছিলো। ভারী মিষ্টি সুর। ভারী মিষ্টি প্রথম পংক্তির ভাষা। জিজ্ঞেস করেছিলো,—তারপর?

রাজমাতার এই অপ্রত্যাশিত আগ্রহ দেখে অবাক হয়েছিলো মেয়েরা। একজন বললো,—তারপর তো আর জানি না। ওর মহলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মাঝে মাঝে শুনতে পাই। প্রথম শুনে আমার হাসি পেয়েছিলো। তাই ওই প্রথম কথা কয়েকটি মনে আছে,—বলে হেসে ফেললো মেয়েটি।

কিন্তু যখন দেখলো মহারানী ঝালী হাসছে না, গম্ভীর হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছে, তখন হঠাৎ সে হাসিটা নিবিয়ে দিলো।

কয়েকদিন ধরেই কথাটা গুনগুন করছিলো ঝালীর মনের মধ্যে।—মেরে তো গিরিধর গোপাল, দুসরো না কোঈ …।—নিজের দৈনন্দিন পূজো আহ্নিকের মন্ত্র আর শাস্ত্রের শ্লোকের ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ মনের মধ্যে আবার শুনতে পেতো একটি মিষ্টি সুর,—মেরে তো গিরধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ…।

সেদিন হঠাৎ খুব ইচ্ছে হোলো।

তখন সন্ধ্যে। বাইরে কুম্ভশ্যামের মন্দিরে আরতি শুরু হয়ে গেছে।

রতনকুঁয়র ঝালী আস্তে আস্তে এগিয়ে এলো মীরার মহলের দিকে।

ধারে কাছে মহলের অন্যান্য মেয়ে যারা ছিলো ওরা অবাক হোলো। রতনকুঁয়র ঝালী রাজমাতা, তিনি মহারাণা ছাড়া অন্য কারো মহলে কোনোদিন যান না। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে হলে সবাই তাঁর মহলে আসে, এমন কি স্বয়ং মহারানীও। এই ছিলো চিতোরগড়ের রেওয়াজ।

ভিতর থেকে ভেসে আসছে মীরার গান।

মেরে তো গিরিধর গোপাল

দুসরো না কোঈ।

জাকে সির মোর মুকুট

মেরে পতি সোঈ॥…

রতনকুঁয়র আস্তে আস্তে ঘরের ভিতর ঢুকলো।

মীরার মহলটি ছোটো। একটি শোয়ার ঘর। পাশে আরেকটি ছোটো ঘর। সেখানে গিরধরজী।

সে ঘরে মেঝের উপর বসেছিলো রাণা সাঙ্গা আর ভোজরাজ। রাজমাতাকে দেখে অবাক হোলো রাণা এবং যুবরাজ। ওরা উঠে দাঁড়ালো।

কিন্তু মীরা উঠলো না। শুধু একবার তাকিয়ে দেখলো। মুখে ফুটে উঠলো খুশির হাসি। তার খুব ভালো লেগেছে রাজমাতার এই অপ্রত্যাশিত উপস্থিতি। সে গেয়ে চললো নিজের মনে—

তাত মাত ভ্রাত বধ্

আপনো না কোঈ···।

রতনকুঁয়র সাঙ্গা ও ভোজরাজকে বসতে বললো হাতের ইশারায়। নিজেও বসে পড়লো পাথরের মেঝের উপর।

মীরা গান গেয়ে যাচ্ছে নিজের মনে।

রানী ঝালী চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। চোখ পড়লো সামনে গিরধরজীর বিগ্রহের উপর। মনে চমক লাগলো। সামনে ঝুঁকে বসলো। ভাবলো, মীরা এ বিগ্রহ কোথায় পেলো?

—অঁসুয়ন জল সীঁচি সীঁচি

প্রেম বেলি বোঈ।

চোখের জল সিঞ্চন করে বুনে দিয়েছি প্রেম ভালোবাসার লতা···

অব তো বেলি ফ্যায়ল গঈ

এখন সেই লতা ছড়িয়ে পড়েছে···

আনন্দ ফল হোঈ ॥···

রাণা সাঙ্গা লক্ষ করলো রাজমাতার দুচোখ হঠাৎ জলে ভরে গেছে।

মীরার হাতে তানপুরো। খুব মিষ্টি গলা,—এবং খুব তৈরী গলা। ওর ঠাকুর্দা রাও দুদাজী বড় ওস্তাদ রেখে শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিখিয়েছিলো মীরাকে।

কুমার ভোজরাজ আর রাণা সাঙ্গা দুটো পাথরের মূর্তি। রানী ঝালী একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে।

—ভকত দেখো রাজী হুঈ

জগত দেখো রোঈ।

দাসী মীরা লাল গিরধর

তারো অব মোহী ॥

মেরে তো গিরধর গোপাল

দুসরো ন কোঈ···।

গান শেষ হোলো।

মা, তুমি এখানে?—রাণা সাঙ্গা জিজ্ঞেস করলো।

তুমিই বা এখানে কেন?—ভেজা গলায় বললো রতনকুঁয়র ঝালী।

—আজকের তিথিতে মীরা দীক্ষা নিয়েছিলো। তাই আমায় বলে পাঠালো এসে ওর ভজন শোনার জন্যে।

মীরা উঠে এসে রতনকুঁয়র ঝালীকে প্রণাম করলো। তারপর বসে পড়লো পায়ের কাছে।

রতনকুঁয়র তাকালো গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে। জিজ্ঞেস করলো,—এই বিগ্রহ তুমি কোথায় পেলে?

আমার গুরু দিয়েছেন আমায়,—মীরা উত্তর দিলো।

তোমার গুরু?—রতনকুঁয়র একটু যেন অবাক হোলো।

আমি তখন খুব ছোটো। আমাদের মহলে এসেছিলেন এক সাধুজী। তখন তিনি খুব বুড়ো। বোধ হয় একশোর কাছাকাছি বয়েস হবে। বেশিও হতে পারে। অন্তত সবাই তাই বলতো। তিনি এ বিগ্রহ আমায় দিয়েছিলেন?

—সন্ত রইদাসজী?

—আপনি কি করে জানেন?

—আগে বলো, রইদাসজী তোমার গুরু? তিনি তোমায় দীক্ষা দিয়েছিলেন?

ভোরের আলো হোলো মীরার মুখ। বললো,—দীক্ষা আর কি? আমার তখন তিনচার বছর বয়েস। তিনি আমার হাতে গিরধরজীকে তুলে দিলেন। তারপর কানের কাছে মুখ নামিয়ে বললেন,—গিরধর গোপাল। ব্যস, শুধু ওইটুকু।

রতনকুঁয়র ঝালী দু'হাত বাড়িয়ে মীরাকে হঠাৎ বুকে টেনে নিলো। অনেকক্ষণ কিছু বললো না। শুধু শিশির ভেজা ফুলের পাপড়ি হয়ে তাকিয়ে রইলো গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে।

খুব নরম গলায় বললো,—এই বিগ্রহ আমি দিয়েছিলাম আমার গুরু সন্ত রইদাসকে, যখন আমি কাশী গিয়েছিলাম।

রাণা সাঙ্গার দিকে ফিরে তাকালো রানী ঝালী।

হেসে বললো রাণা,—হ্যাঁ মা, তুমি যা চাইছো তাই হবে।

এবার হাসলো রতনকুঁয়র ঝালী।

—আমি কি চাইছি তুমি কি করে জানো?

রাণা সাঙ্গা উত্তর দিলো,—আমি তোমারই ছেলে। তোমার মন আমি বুঝবো না?

—মীরাকে বলো।

মীরার দিকে ফিরলো রাণা সাঙ্গা। বললো,—মহলের এক কোণে আর লুকিয়ে থাকতে হবে না গিরধরজীকে। কুম্ভশ্যামের মন্দিরের পাশে যেখানে আতার বাগান, সেখানে মন্দির তৈরী হবে গিরধরজীর জন্যে।

॥ ছয় ॥

ব্যাপার কি?—রানী কুঁয়রবাঈ জিজ্ঞেস করলো।

কেন?—বললো রাণা সাঙ্গা।

—শুনছি মহলের বাইরে মন্দির তৈরী হবে মীরার গিরধরজীর জন্যে। এদিকে রানী ঝালী প্রত্যেকদিন মীরার মহলে যাচ্ছেন ওর ভজন শুনবার জন্যে। উনি যাচ্ছেন বলে মহলের অন্য মেয়েরাও যাচ্ছে।

মাঝে মাঝে আমিও যাই,—রাণা সাঙ্গা উত্তর দিলো,—একদিন আমার সঙ্গে তুমিও যাবে।

—কক্ষনো না। আমি মেবারের মহারানী, আমি এসবের প্রশ্রয় দিতে পারি না।

—কিসের প্রশ্রয়?

—মেবারের যুবরাজবধূ বসে ভজন গাইবে আর সবাই বসে শুনবে?

—সবাই আর কে? মহলের মেয়েরাই তো।

—না।

—অনুমতি দিয়েছি আমি।

ফুলে উঠলো মহারানী কুঁয়রবাঈয়ের নাকের ফুটো। বললো,—মহলের ব্যাপারে কোনো অনুমতি দেওয়া বা না দেওয়ার অধিকার এবং দায়িত্ব আমার।

—না বাঈ-সা', তোমার নয়। আমার মা, রানী ঝালী এখনও বেঁচে আছেন। তাঁরই নির্দেশ, তাই আমার অনুমতি।

তাই তো জিজ্ঞেস করছি,—বললো কুঁয়রবাঈ,—ব্যাপারটা কি?

—কেন?

—আপনাকে তো চিনি। কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া তো আপনি কিছু করেন না। কিন্তু মীরার জন্যে একটা মন্দির তৈরী করে দেওয়ার হুকুম দিয়ে, তাকে সেখানে ভজন গাইতে দেওয়ার অনুমতি দিয়ে আপনার কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সফল হবে সেটাই আমি জানতে চাইছি। মেবারের মহারাজা হিসেবে নয়, ভোজরাজের মা বলে আমার জানার অধিকার আছে, আমার পুত্রবধূকে সংসার থেকে বার করে মন্দিরে এনে বসিয়ে দিয়ে আপনার কোন রাজনৈতিক অভিলাষ পূর্ণ হচ্ছে।

হেসে উঠলো রাণা সাঙ্গা।

কুঁয়রবাঈ বললো,—আমি যদ্দুর জানি আপনার শত্রুতা দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে, গুজরাটের সুলতানের সঙ্গে। আমার সঙ্গে তো নয়।

হাসি ছাড়া রাণার মুখে কোনো উত্তর নেই।

কুঁয়রবাঈয়ের চোখ দিয়ে জলের ধারা নামলো। বললো,—আপনি বুঝতে পারছেন না, কিন্তু আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, ওই মেরতানী মীরা সংসার করবে না।

তোমার ছেলে কি বলে ?—নিস্পৃহ প্রশ্ন করলো রাণা সাঙ্গা।

—ভোজরাজ আমার কাছে আসল কথাটা খুলে বলে না বলেই আমার ধারণা।

—ও কি কখনও তোমার কাছে মিছে কথা বলে ?

—ভোজরাজ একদিন রাজা হবে। প্রয়োজন হলে সে যে মিছে কথা বলতে পারবে না, একথা আমি বিশ্বাস করি না।

—ভোজরাজকে দেখে কি মনে হয়, ও অসুখী ?

—ওর সুখের চাইতেও একটা বড়ো ব্যাপার আছে। সেটা মেবার রাজবংশের ভবিষ্যৎ।

—কথাটা মায়ের মতো তো নয়, তবে রানীর মতো। অন্তত রানী বলতে আমরা ইদানীং চারদিকে যা দেখছি। তবে একটা কথা আমায় বলো, মেবার রাজবংশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কি তোমার ভাবনা আমার চাইতে বেশী ?

কুঁয়রবাঈয়ের কথায় লঙ্কার ঝাঁজ। বললো,—আপনার উদ্দেশ্য অন্য। আপনি গুজরাট জয় করতে চান, আপনি দিল্লী দখল করতে চান, আপনি সারা হিন্দুস্তানের রাজা হতে চান। তার জন্যে যে কোনো দাম দিতে আপনি রাজী। তাই তো জিজ্ঞেস করছি, আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কি ? আজ

মীরাকে মহলে ভজন গাইবার অনুমতি দিয়েছেন। কাল মন্দির তৈরী হলে তাকে সেখানে ভজন গাইতেও আপনি মানা করবেন না। হয়তো চিতোরগড়ের সাধারণ প্রজাকেও মন্দিরে এসে গান শোনার হুকুম দেবেন। হিন্দুস্তানের ভাবী মহারানীর কাজ কি হবে রাজ্যের প্রজাদের গান শোনানো ?

হিমালয় হোলো রাণা সাঙ্গা। উত্তর দিলো,—হিন্দুস্তানের ভাবী মহারানী যদি সাধারণ প্রজাদের মধ্যে একটু মেলামেশা করতে পারে, যদি সে মহলের ঐশ্বর্যের কয়েদী হয়ে বসে না থাকে তোমাদের মতো, তাহলে বুঝবো-আমার সারা জীবনের সাধনা কোনোদিন ব্যর্থ হবে না। আমি শুধু সারা দেশের ভাঙা ভাঙা টুকরোগুলো জুড়ে এক করে দিয়ে যেতে পারবো, কিন্তু সাধারণ প্রজাকে যে শান্তি, নিশ্চয়তা এবং স্বাচ্ছল্য দিয়ে সারা দেশকে চিরকাল একতাবদ্ধ করে রেখে দিতে পারা যাবে, তার চেষ্টা করতে হবে ভোজরাজকে। মীরার সহায়তা না পেলে সে একলা পারবে কেন ?

এবং মীরার সহায়তা কি ভাবে হবে ?—দ্বিতীয়ার চাঁদের ফালির মতো হাসলো মহারানী কুঁয়রবাঈ,—মন্দিরে লোক জড়ো করে গান গেয়ে ? শুনেছি বাংলায় সাধারণ মানুষকে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্যে চৈতন্যদেব নামে এক সন্ন্যাসী তাদের রাস্তায় বার করে এনে কীর্তন গাইয়েছেন। লোদীদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তুলবার জন্যে এখন মীরাকে ভজন গাইতে হবে ? শুনেছি চৈতন্যদেব দেশ ছেড়ে চলে এসে এখন পুরীতে বসে আছেন। দেখে নিয়ো তোমাদের মীরাবাঈও হয়তো একদিন দেশ ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।

রাণা সাঙ্গা বললো,—গুরু নানক, কবীর, চৈতন্যদেব এঁরা কি, তুমি বুঝবে না বাঈ-সা, তুমি বুঝবে না। তোমরা এদের ধর্মপ্রচারটাই শুধু দেখ, ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এদের রাজনৈতিক ভূমিকাটা দেখবার মতো তোমার চোখ নেই।

ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করলো রাণা সাঙ্গা। একবার ঝরোকার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখলো বাইরের দিকে।

অনেক নিচে বিরাট অঙ্গন। তারপর একটি প্রাচীর। সেখান থেকে পাহাড় খাড়া নেমে গেছে নিচের দিকে। অনেক নিচে সরু নদী। তার নাম গম্ভীর। নদীটাকে দেখাচ্ছে রুপালী ফিতের মতো। মনে হয় যেন মেঘের উপর বসে অনেক নিচের পৃথিবীকে দেখছি। গম্ভীর নদীর উপর গম্ভীরী পুল। সেই সাঁকো পেরিয়ে চলে যাচ্ছে একদল অশ্বারোহী। ঠিক যেন ছোটো ছোটো

পুতুল। চারদিকে দিগন্ত অবধি সবুজ আর সবুজ। তাকিয়ে দেখলো আকাশের দিকে। যতদূর দেখা যায় শুধু নীল শান্তি আর কখনও বলাকা।

ফিরে এসে দাঁড়ালো কুঁয়রবাঈয়ের সামনে। বললো,—আরো একটা কথা তুমি বুঝবে না বাঈ-সা'। শুধু রাণা সাঙ্গার তলোয়ার হিন্দুস্তান জয় করতে পারবে না। মীরাবাঈকেও দরকার।

॥ সাত ॥

দেখতে দেখতে কেটে গেল দুটি বছর,—নির্ঝঞ্ঝাট শান্ত মধুর।

রাজমাতা রতনকুঁয়র ঝালী ভালোবাসে মীরাকে। চিতোরগড়ের রাওলার কারো সাহস নেই মীরাকে ঘাঁটাবার। স্বয়ং রাণা সাঙ্গা মীরার খোঁজখবর করে সব সময়। তাই মীরাকে উপলক্ষ করে রাওলার ললনাদের সমস্ত গুঞ্জন থেমে গেছে।

কুমার ভোজরাজ মীরাকে না দেখে একদিনও থাকতে পারে না। সন্ধ্যের সময় ফিরে আসে নিজের মহলে। তাদের সম্পর্ক নিয়ে কোনোরকম অভিযোগ করার সুযোগ পায় না রাওলার মেয়েমহল।

মীরা বেশী মেশে না ওদের সঙ্গে। সে নিজের মহলেই পড়ে থাকে নিজের পড়াশুনো, নিজের সঙ্গীতচর্চা, কবিতা লেখা আর পূজো অর্চনায়। মেয়েরা দূর থেকে শুনতে পায় তার গান। এক একদিন দেখা যায় রাণাজী আর রাজমাতা ঝালীও গান শুনছে মীরার সামনে বসে। তাদের সঙ্গে থাকে ভোজরাজও।

অনেক সময় গভীর রাতে চিতোরগড় যখন নিঝুম, শুধু নিচে শোনা যায় প্রহরীর ভারী পায়ের আওয়াজ। অনেক উপরের মহল থেকে ভেসে আসে যুবরাজবধূ মীরাজীর গান।

ভোজরাজ মীরার সঙ্গে রাত জেগে ওর গান শোনে।—

বিরহিণী বৈঠী জাগুঁ
জগত সোয়রে আলী।...

সারা জগত ঘুমিয়ে আছে। একা জেগে আছি আমি এক বিরহিণী। রংমহলে বিরহিণী গাঁথছে মোতির মালা,—চোখের জলের মালা। আকাশের তারা গুনে গুনে তার সময় কাটছে।...

কার জন্যে এই বিরহ?—নিজেদের মধ্যে মুখ টিপে হাসাহাসি করে

রাওলার যুবতীরা।. কিন্তু সে অপরাহ্নে গল্পগুজবের সময়। গভীর রাত্তিরে যখন দূর থেকে গানের সুর ভেসে আসে, তখন কিন্তু মন উদাস হয়ে যায় অনেকেরই।

কার জন্যে এই বিরহ?—একদিন ভোজরাজও মীরাকে আদর করে জিজ্ঞেস করেছিলো।

মীরার হাসি খুব স্নিগ্ধ। চোখ দুটি সন্ধ্যাপ্রদীপ। সে উত্তর দিয়েছিলো,—তোমার মধ্যে যিনি আছেন তাঁর জন্যে।

আকাশে অনেক তারা। ভোজরাজের মনের মধ্যে গুনগুন করে ওঠে মীরার গান,—তারা গিন গিন রৈন বিহানী। আকাশের তারা গুনে গুনে সময় কাটে…।

খুব গভীর ভালোবাসা এ রকম,—ভোজরাজ সেদিন বলেছিলো,—তুমি এত কাছে, তবু মনে হয় তুমি অনেক দূরে। মনটা কি রকম যেন আনমনা হয়ে যায়। একটা মধুর ব্যথায় মন ভরে যায়।

ম্হারো জনম মরণ কো সাথী
থানেঁ নহিঁ বিসরূঁ দিনরাতি।

ও আমার জীবন-মরণের সাথী, দিনে রাতে তোমায় একটিবারও ভুলতে পারি না।…

আমি?—হাসিমুখে জিজ্ঞেস করে ভোজরাজ।

—হ্যাঁ তুমি। এবং তোমার মধ্যে যিনি আছেন তিনি।

এ রস ভোজরাজের কাছে একেবারে নতুন। রাজস্থানের ডিঙ্গল ভাষায় এ পর্যন্ত শুনেছে চারণদের গান, সাধুসন্তের ভজন, প্রাসাদের উৎসব অনুষ্ঠানে তেঁওহারে মেয়েদের লোকগীত। কিন্তু মারওয়াড়ের আঞ্চলিক ভাষায় এমন মিষ্টি প্রণয়ের গান এই প্রথম। এর যেন জুড়ি নেই সংস্কৃত সাহিত্যেও,—ভাবলো ভোজরাজ। এই গান, এই ভালোবাসা মনকে যেন জীবনের খাঁচা থেকে বার করে নিয়ে সব চাওয়া-পাওয়ার ওপারে পৌঁছে দেয়।

হে—রী ম্যঁয় তো দরদ দিওয়ানী
মেরো দরদ ন জাণৈঁ কোয়।—

ওরে, আমি যে ভালোবাসার বেদনায় বিবাগী, আমার ব্যথা তো কেউ জানে না।…

ভোজরাজের মনে পড়ে এ গান শুনে রাণা সাঙ্গার চোখও ছলছল করে উঠেছিলো সেদিন। এ যেন সবারই মনের একটা গোপন কথা।

আমি জানি,—বলেছিলো ভোজরাজ।

ভোজরাজের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়েছিলো মীরা।·

—মীরা দাসী জনম জনম কী,

পড়ী তুম্হারে পাঁয়।··· ···

সে গান ভেসে যেতো পাটরাণী কুঁয়রবাঈয়ের মহলেও। শুধু তারই ভালো লাগতো না। যুবরাজের বধূ নিশুতি রাতে গান শোনাবে তার স্বামীকে, আর সে গান শুনতে পাবে চিতোরগড়ের রাওলার মহলে মহলে নানা বয়েসের দম্পতি, এ একেবারেই পছন্দ নয় কুঁয়রবাঈয়ের। কিন্তু মীরাকে মানা করার উপায় নেই। রাণা, রাজমাতা, যুবরাজ, তিনজনেই মীরার অনুরক্ত। রাওলায় বড়োরানী কুঁয়রবাঈয়ের হুকুম চলে না, চলে রাজমাতা রতনকুঁয়রীর হুকুম।

খুব মন্থর রাজপুরীর মেয়েদের জীবন। প্রত্যেকের নিজের নিজের জায়গীর আছে। সেখান থেকে নিয়মিত টাকা আসে। যে যার নিজের মত পূজো-পার্বণ অতিথি-সেবা ব্রাহ্মণবিদায় নিয়ে মেতে থাকে। উৎসব তেঁওহারের দিনে হয়তো দল বেঁধে পূজো দিতে যায়, সুরজ কুণ্ডে স্নান করতে যায়। মিসরানী অর্থাৎ ব্রাহ্মণকন্যাদের ঘিরে গান শোনে। কিন্তু অন্যান্য সময় নিজেদের মধ্যে ছোটোখাটো কলহ বিবাদ। মহলের ভিতর তিন চারটে দল। কারো সঙ্গে কারো সম্পর্ক ভালো নয়। যে যার নিজের দলের মধ্যে বসে অলস গল্প-গুজবে কাটায় সুদীর্ঘ অপরাহ্ণ। সেখানে শুধু পরচর্চা এবং অনেক সময় মীরাকে নিয়েই।

কুঁয়রবাঈয়ের ভালো লাগে না।

দু'বছর হতে চললো। মীরার ছেলেপুলে হয়নি। হবে এমন কোনো সম্ভাবনাও নেই। তাই নিয়ে নানারকম আলোচনা করে রাওলার নানা মহলের মেয়েরা।

মীরা আর ভোজরাজের সম্পর্ক নাকি স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর মতো নয়। ওদের ছেলে হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

মেজোরানী ধনবাঈ রাঠোর এতে খুব খুশী। মীরার যদি ছেলে না হয়, ভোজরাজ যদি আর বিয়ে না করে, তাহলে ভোজরাজ যখন রাণা হবে, তখন যুবরাজ হবে ধনবাঈয়ের ছেলে রতনসিংহ। তার বয়েস এখন পাঁচ কি ছয়। মীরা খুব স্নেহ করে তাকে। কিন্তু ধনবাঈ তাকে মীরার কাছে ঘেঁষতে দেয় না। ধনবাঈ জোধপুরের রাঠোর। ওদের সঙ্গে মেরতিয়া রাঠোরদের বনিবনাও নেই। মীরা মেরতিয়া রাঠোর, তাই তাকে পছন্দ করে না ধনবাঈ। ভোজরাজ রাণা হলে জোধপুরের কোনো লাভ নেই।

যদি রতনসিংহ রাণা হোতো……। —মনে মনে স্বপ্নের জাল বোনে ধনবাঈ। কাউকে কিছু বলে না। মনের কথা কাউকে জানতে দেওয়া ঠিক নয়। কিন্তু আস্তে আস্তে তৈরী হতে হবে এখন থেকেই।

তার ভাই মালদেব চিতোরগড়েই থাকে। রাঠোর রাজকুমার এখানে বসবাস করার কথা নয়। একদিন সেই হবে মারওয়াড়ের রাজা, তার তো থাকা উচিত রাজধানী জোধপুরে রাও গাঙ্গার কাছে।

এ নিয়ে নানারকম কানাঘুষো শোনা যায় মহলের মধ্যে। রাও গাঙ্গা রাণা সাঙ্গাকে খুব শ্রদ্ধা করেন বলেই নাকি মালদেবকে রাখা হয়েছে চিতোরে রাণাজীর দরবারে। রাণাজী প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞ। তাঁর কাছে থাকলে রাজনীতিতে ভালো শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে কুমার মালদেব।

রাণা সাঙ্গা রাজী হয়েছে অন্য উদ্দেশ্যে। মারওয়াড়ের টিকায়েত চিতোরগড়ে থাকলে রাণার ও ভোজরাজের অনুগত হবে। তাহলে ভবিষ্যতে সে যখন জোধপুরে ফিরে যাবে, তখন একটা অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠবে জোধপুর ও চিতোরের মধ্যে।

কিন্তু দরবারে খুব রেষারেষি সর্দারদের মধ্যে। একদল সহ্য করতে পারে না রাঠোরদের। তাদের নেতা সুরজমল হাডা। তাদের মনে একটা সন্দেহ আছে জোধপুরের আসল মতলব সম্বন্ধে। ওদের ধারণা রানী ধনবাঈ রাঠোরের ছেলে কুমার রতনসিংহকে সামনে রেখে ওরা একটা গণ্ডগোল পাকাতে চায় ভবিষ্যতে। এবং তার জন্যে এখন থেকেই তৈরী হচ্ছে। সে জন্যেই রাঠোর রাজকুমার মালদেবকে রাখা হয়েছে চিতোরগড়ে।

তার বয়েস কম। এখনো কিশোর, কিন্তু এরই মধ্যে অত্যন্ত দুর্বিনীত এবং ধারালো বুদ্ধি। দরবারে তাকে ঘিরে খুব গোপনে তৈরী হচ্ছে রাঠোরদের সমর্থক একটি দল। সুরজমলের ধারণা তাদের কাছে জোধপুর থেকে নির্দেশ আসে মালদেবের মারফতে এবং অন্দরমহলে রানী ধনবাঈয়ের সঙ্গেও তাদের যোগাযোগ মালদেবের মারফতেই।

ভবিষ্যতে কি হবে বলা যায় না,—মালদেব নাকি বুঝিয়েছে ধনবাঈকে, যে টিকায়েত সেই যে রাণা হবে এমন কোনো কথা নেই।

খবরটা এসে গেছে সুরজমলের কাছে। মহলের রানীদের মধ্যেও পরস্পরের গোপন সংবাদ জোগাড় করে নেওয়ার ব্যবস্থা আছে। রাণা সাঙ্গার ছোটো রানী সুরজমলের বোন কর্মাবতী। তাকে মহলে ডাকা হোতো কারমেতনবাঈ। তারই কাছে থেকে জানতে পেরেছে সুরজমল।

মীরা খুব স্নেহ করে রতনসিংহকে। কিন্তু ধনবাঈ এখন থেকেই বিষ ঢেলে দিচ্ছে রতনসিংহের মনে। তাকে যেতে দেয় না মীরার কাছে।

সুরজমলের উদ্দেশ্য অন্য। সেও জানে, মীরার ছেলে হবে না হয়তো। কিন্তু তাহলে যখন রাণা হবে ভোজরাজ তখন কিছুতেই যুবরাজ হতে দেওয়া হবে না রতনসিংহকে। অন্তত সুরজমল সে চেষ্টাই করবে। যুবরাজ করতে হবে কারমেতনবাঈয়ের ছেলে বিক্রমকে।

বিক্রমের বয়েস এখন একবছরও হয়নি। কারমেতনবাঈকে পরামর্শ দিলো সুরজমল,—বিক্রমকে এখন বেশির ভাগ সময় মীরার কাছেই রেখো। মীরার ছেলে নেই। সে যেন বিক্রমকেই ভালোবাসে ছেলের মতো।

কারমেতনবাঈ প্রায়ই ধাইয়ের হাতে বিক্রমকে পাঠিয়ে দেয় মীরার কাছে। মীরা যখন গিরধরজীর শৃঙ্গার করে, তাকে বসিয়ে রাখে একপাশে। অনেক সময় তাকে কোলে বসিয়ে গান গায় নিজের মনে।

বিক্রম মীরার পূজোর ঘরে হামাগুড়ি দিয়ে বেড়ায়। তার হতে ক্ষীরের নাড়ু তুলে দেয় মীরা। একটা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে তার দিকে।

মীরা নাকি একদিন বিক্রমের ধাইকে বলেছিলো,—আমার যশোদাদুলালও তো এ রকমই ছিলো একদিন।

আবার কানাঘুষো শুরু হোলো রাওলার মেয়েমহলে।

মীরা কি দত্তক নেবে নাকি কারমেতনবাঈয়ের ছেলেকে? কারমেতনবাঈ আজকাল মাঝে মাঝে যাচ্ছে মীরার মহলে। নিশ্চয়ই তার একটা গভীর উদ্দেশ্য আছে।

ধনবাঈ রাঠোর গিয়ে নালিশ করলো কুঁয়রবাঈয়ের কাছে।

রাণা সাঙ্গাকে কিছু বলে লাভ নেই। কারো কোনো কথা কানে তুলবে না। ওসব কথায় কান দেওয়ার অবসর রাণার নেই। খুব জোর যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়েছে। ইব্রাহিম লোদী নাকি তৈরী হচ্ছে রাজপুতদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্যে।

শোনা যাচ্ছে কাবুলে বাবরের সঙ্গে যোগাযোগ করছে মেবারের রাণা। দুজনের সেনাবাহিনী একত্র হওয়ার আগেই রাজপুতদের শেষ করতে হবে, এই হোলো ইব্রাহিম লোদীর পরিকল্পনা।

গুজরাটের সুলতানের উদ্দেশ্যও ভালো নয়। সেও যুদ্ধের জন্যে তৈরী। দিল্লীর সঙ্গে মেবারের যুদ্ধের গতি কোন দিকে যায় সেটা দেখে হয়তো সেও সুযোগ বুঝে আক্রমণ করবে দক্ষিণ থেকে।

কারমেতনবাঈয়ের বিরুদ্ধে একজোট হোলো কুঁয়রবাঈ আর ধনবাঈ। রাণার এখন যা কিছু ভালোবাসা এই ছোটো রানীর জন্যে। সেটা ওদের পছন্দ নয়।

মীরার কোনোদিন কোনো আগ্রহ ছিলো না রাওলার এ সব অভ্যন্তরীণ কূটনীতিতে। কিন্তু সে ইদানীং সব খবর পায় কারমেতনবাঈয়ের কাছে।

সে একদিন ভোজরাজকে বললো,—আচ্ছা, ওরা আমাকে নিয়ে এত কথা বলে কেন? আমার আর তোমার সম্পর্ক নাকি স্বাভাবিক স্বামী-স্ত্রীর মতো নয়।

তোমাকে ওরা হিংসে করে,—উত্তর দিলো ভোজরাজ।

হিংসে? কেন?

—যে ভালোবাসা তুমি আর আমি জানি, সে তো ওরা কোনোদিন পাবে না। সে কথা ওরা জানে।

মীরা ভোজরাজের বুকে মুখ গুঁজে রইলো।

ভোজরাজ একটু আদর করলো মীরাকে। তারপর বললো, আমাদের মতো সামান্য মানুষের কতোটুকু সাধ্য ভালোবাসার? তোমার আর আমার মনে যিনি আছেন তিনিই আমাদের মাধ্যমে ভালোবাসেন, ভালোবাসা গ্রহণ করেন।

স্তব্ধ রাত। নিশুতি রাত।

রাওলার মহলে মহলে দম্পতিরা যে যার নিজের মতো করে ভালোবাসছে, ভালোবাসা নিচ্ছে।

ভোজরাজের বাহুর বন্ধনের মধ্যে অনেকক্ষণ স্নিগ্ধ হয়ে রইলো মীরাবাঈ।

রাওলায় নানারকম জটিলতা। চারটে দল,—কুঁয়রবাঈ সোলাঙ্কি, ধনবাঈ রাঠোর, কারমেতনবাঈ হাডা, আর রাজমাতা রতনকুঁয়র ঝালী, এদের চারজনকে নিয়ে চারটে দল।

এখন আবার কুঁয়রবাঈ আর ধনবাঈ একজোট হয়েছে কারমেতনবাঈয়ের বিরুদ্ধে।

এর মধ্যে মীরার নাম জড়িয়ে পড়েছে বলে কারমেতনবাঈয়ের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে রতনকুঁয়র ঝালী।

ধনবাঈ বলছে,—ঝালী রানী চেনেন শুধু নিজের ছেলে রাণাজীকে। আর কারো কথা তিনি ভাবেন না। রাণাজীর এখন যা কিছু মোহ সব ছোটো রানীর জন্যে। ঝালী রানী তো তার হয়ে কথা বলবেই।

কুঁয়রবাঈ বলেছে—তোমার ছেলেকেও মাঝে মাঝে পাঠাও মীরার কাছে।

মালদেবও বলেছে,—হ্যাঁ, তু একবার পাঠাতে পারো রতনকে।

কিন্তু রতনসিংহের মন বিষিয়ে গেছে। সে মীরার কাছে যেতে চায় না একদিন তাকে জোর করে পাঠিয়েছিলো ধনবাঈ।

মীরা তাকে আদর করে কাছে বসালো। কিন্তু সে আড়ষ্ট হয়ে বসে রইলো। তাকে নানারকম মিষ্টি ফল শরবৎ খেতে দিলো মীরা। সে খেলো না।

—কেন খাচ্ছো না কুঁয়র-সা' ?

মাথা নাড়লো রতনসিংহ। বললো,—তুমি মেড়তিয়া রাঠোর।

—হ্যাঁ, তাতে কি হয়েছে ?

—আমার মা জোধপুরের রাঠোর।

—তাই খাবে না ?

—মেড়তিয়া রাঠোরেরা খাবারের মধ্যে জহর দিতে পারে।

মীরা স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো রতনসিংহের দিকে, কিছুক্ষণ পরে বললো,—তুমি একেবারে ছেলেমানুষ। কি বলছো তুমি জানো না। এসব তোমার কথা নয়। বড়ো হলে যখন বুঝবে, তখন একথা আমায় একদিন বলেছিলে বলে তুমি নিজেই কষ্ট পাবে।

ওইটুকু ছেলে রতন ভুরু কুঁচকে বসে রইলো,—মীরা অনুযোগ করে বলছিলো ভোজরাজকে,—আমি বললাম, আর কখনো আমায় এ কথা বলবে না। সে কোনো উত্তর না দিয়ে উঠে চলে গেল।

ভোজরাজ একটু হাসলো। তারপর বললো,—রাজার ছেলে হয়ে জন্মানোর একটা অভিশাপ কি জানো মীরা ? সবাই রাজা হতে চায়।

হ্যাঁ, আমি বুঝি,—মীরা বললো।

সামনে খুব কঠিন সময় আসছে,—ভোজরাজ মীরাকে কাছে টেনে বললো, —এ সব নিয়ে আমাদের বিচলিত হলে চলে না।

আমি বিচলিত নই একটুও,—মীরা উত্তর দিলো,—অন্তত আমার নিজের জন্যে নই। দেশের কথা ভেবেই ভাবনা নয়। নিজেদের মধ্যেই যদি এত শত্রুতা, বাইরে শত্রুকে হারাবো কেমন করে ?

—এরই মধ্যে দিয়ে চলতে হবে মীরা। চিরকাল এরই মধ্যে দিয়ে চলতে হবে মানুষকে, দেশকে, ইতিহাসকে।

সেদিন খুব মধুর মনে হয়েছিলো অন্ধকার রাত। ঝরোকার বাইরে শুধু একটা বিরাট কালো আকাশ, তাতে অসংখ্য তারা।

ঝরোকায় পাশাপাশি দাঁড়িয়েছিলো ভোজরাজ আর মীরা।

- অনেক নিচে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত কালো অন্ধকার প্রান্তর। সেটি কোথায় গিয়ে কালো আকাশে মিশেছে বোঝা যায় না।

অনেক দূরে দূরে দেখা যাচ্ছে আগুনের কুণ্ড কিংবা মশালের আলো।

নিঃশব্দ রাত। কিন্তু চিতোরগড়ে এখন অনেকেরই চোখে ঘুম নেই।

শুরু হয়ে গেছে দ্রুত প্রস্তুতি।

খবর এসেছে দিল্লী থেকে ফৌজ নিয়ে রওনা হয়েছে সুলতান ইব্রাহিম লোদী।

মেবারের ফৌজ তৈরী হচ্ছে। স্বয়ং রাণা পরিচালনা করবেন মেবারের সেনাবাহিনী।

সঙ্গে যাচ্ছে কুমার ভোজরাজ।

মীরার বাবা রতনসিং রাঠোর, এবং জ্যাঠা বীরমদেবও যুদ্ধে যাচ্ছে রাণাজীর সঙ্গে।

এই শেষের কয়েকটা রাত বড় মধুর মনে হয়েছিলো মীরার।

আমার ভাবনা আমার নিজের জন্য নয়,—মীরা বলেছিলো,—আমার ভাবনা শুধু তোমার জন্যে।

ভোজরাজ হেসে কাছে টেনে নিয়েছিলো মীরাকে।

সাবধানে থেকো,—মীরা বলেছিলো।

আমি রাজপুত যোদ্ধা,—একটু হেসে উত্তর দিয়েছিলো ভোজরাজ,—তুমি রাজপুতানী। এর বেশী কি আর বলতে পারি?

—হ্যাঁ পারো। শুধু একটি কথা। তুমি আমার স্বামী। আমি তোমার স্ত্রী।

এক রাত দু-রাত তিন রাত করে রাতগুলো ফুরিয়ে গেল। কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার আকাশ। মীরার গান।

গুমোট অন্ধকার রাত্রি।

মীরা আর ভোজরাজ।

রাওলার অনেক মহলে রাত জাগছে অনেকে। অনেক যোদ্ধাই যুদ্ধে যাচ্ছে রাণাজীর সঙ্গে। তাদের প্রিয়তমাদের শেষের কটা রাত নিবিড় সান্নিধ্যে মধুময় হয়ে আছে।

মাঝে মাঝে ওরা অনেক দূর থেকে শুনতে পায় মীরার কণ্ঠস্বর।

ম্হারো জনম মরণকো সাথী—

ওদেরও মন উদাস হয়ে যায়। ওরা প্রিয়জনের আরো কাছে ঘেঁষে আসে,

তাকে চেপে জড়িয়ে ধরে। চোখ ঘুমে জড়িয়ে যায়, তবু ঘুমোতে চায় না কিছুতেই।

একদিন সকালে নাকারা-বেজে উঠলো। মন্দিরে পুজো দিয়ে মাথায় হলদে সাফা বেঁধে সবাই সারি বেঁধে দাঁড়ালো নিজের ঘোড়ার পাশে। চিতোরগড়ের চারদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু হলদে সাফা আর তলোয়ারের ঝিলিমিলি।

রাজমাতা টীকা এঁকে দিলো রাণা সাঙ্গার কপালে। তারপর রানীরা।

কুমার ভোজরাজ এগিয়ে এসে প্রণাম করলো রাজমাতা ঝালী রানীকে। তারপর অন্যান্য রানীদের।

রানীরা আরতির থালা তার সামনে ঘোরালো একজনের পর একজন। তারপর কপালে এঁকে দিলো চন্দনের টিকা।

সবার শেষে মীরা। ঘৃতপ্রদীপ কর্পূর রোলী ও ফল সাজানো থালা তার সামনে দুলিয়ে কপালে টিকা এঁকে দিলো, আঙুলে করে কয়েক কণা চাল এঁটে দিলো সেই টিকার উপর। তারপর গিরধরজীর প্রসাদী ফুল ও তুলসীপাতা গুঁজে দিলো ভোজরাজের হাতে। রাণা সাঙ্গার পেছন পেছন কুমার ভোজরাজ এগিয়ে গিয়ে ঘোড়ায় চড়ে বসলো।

বেজে উঠলো নাকারা আর শিঙা।

মহলের দরজায় রানীদের সঙ্গে মীরা দাঁড়িয়ে দেখলো সৈন্যদের সঙ্গে চিতোরগড় থেকে নিচের দিকে নেমে যাচ্ছে রাণা সাঙ্গা আর কুমার ভোজরাজ। তাদের পেছন পেছন মীরার বাবা রতনসিং আর জ্যাঠা বীরমদেব। তাদের পেছনে সুরজমল হাডা।

বিরাট বাহিনী সারি বেঁধে ঘুরে বেঁকে জোরলা পোল, গণেশ পোল, ভৈঁরো পোল নানা নামের তোরণগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। পাড়ল পোল দিয়ে বেরিয়ে এসে আরো খানিকটা এগিয়ে গম্ভীরী পুলের ওপর দিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছে গম্ভীর নদী।

প্রিয়জনেরা চিতোরগড়ের সিংহদ্বার দিয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর নিজের মহলে ফিরে এলো মীরাবাঈ।

ঝরোকায় দাঁড়িয়ে তাকিয়ে দেখলো অনেক নিচে খুব ছোটো ছোটো পুতুলের মতো দেখাচ্ছে রাজপুত সৈন্যদের। ফৌজের পুরোভাগ চলে গেছে অনেক দূরে।

চিতোরগড়ে একটা বিষণ্ণ স্তব্ধতা।

অনেকবার অনেক যুদ্ধে গেছে রাণা সাঙ্গা। কিন্তু এবার সবার মনে বেশ

ভাবনা। এবার যুদ্ধ দিল্লীর সুলতান ইব্রাহিম লোদীর সঙ্গে। এর উপর নির্ভর করছে মেবারের ভবিষ্যৎ, রাজপুতানার ভবিষ্যৎ, হিন্দুস্তানের ভবিষ্যৎ।

মহলের অসংখ্য ঝরোকায় দাঁড়িয়ে আছে অনেক রাজপুতানী। যতক্ষণ না সেনাবাহিনী দিগন্তে বিলীন হয়ে যাবে ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে।

মীরা আস্তে আস্তে ফিরে এলো ঘরের ভিতর। তারপর গিয়ে ঢুকলো পূজোর ঘরে। আস্তে আস্তে বসে পড়লো গিরধরজীর বিগ্রহের সামনে।

রানীরা যখন মহলের ভিতর ফিরছে, তখন শুনতে পেলো মীরা গান গাইছে।

ধনবাঈ কুঁয়রবাঈয়ের দিকে ফিরে মুখ টিপে হাসলো।

কুঁয়রবাঈয়ের কপালে দেখা দিলো ভ্রূকুটি।

সেদিন অনেক রাতে, যখন চারদিক স্তব্ধ,—নানা মহলে অনেকের কানে এসে পৌছালো মীরার গানের কলি।

সখী, মেরো নীঁদ নসানী হো।—

ও সখী, আমার চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে।……

পিয় কো পন্থ নিহারত সিগরী,
রৈন বিহানী হো।

সারা সময় কেটে যাবে প্রিয়তমের পথ চেয়ে……

জ্যুঁ চাতক ঘন কুঁ রটৈ,
মছরী জিমি পানী হো,

যেমনি মেঘের প্রত্যাশায় থাকে চাতক, আর মাছ খেতে চায় জল…

মীরা ব্যাকুল বিরহণী,
সুধ-বুধ বিসরানী হো,

তেমনি ব্যাকুল বিরহিণী হয়ে আছে মীরা, তার সব হুঁশ চলে গেছে।…

সে গান শুনলো অনেকেই। মহলের রানীরা, মহলের অন্যান্য কুলবধূরা, যাদের সবার স্বামী যুদ্ধে গেছে।

অনেকের চোখেই সেদিন জল এলো মীরার গান শুনে।

সেদিন রাতে অনেকেরই চোখে ঘুম নেই। স্তব্ধ রাত। কালো আকাশ। অসংখ্য তারা।

কেউ যেন ভেবেছিলো ওই তারাগুলো একটা বিরাট ফৌজ। তাদের মধ্যে ওই যে তারা, সেটি আমার প্রিয়তম।

সখী, মেরো নীঁদ নসানী হো।—

ও সখী, আবার চোখ থেকে ঘুম চলে গেছে।…

॥ আট ॥

ভোজরাজ যখন ফিরে এলো কয়েক মাস পরে, মীরার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা গড়িয়ে পড়লো।

ভালোই হোলো,—ফ্যাকাশে হাসি হেসে বললো ভোজরাজ,—এখন সব সময় তোমার কাছে কাছেই থাকতে পারবো। আর তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে না।

—কিন্তু এভাবে ?

…চিতোরগড় ছেড়ে যুদ্ধে যাওয়ার পর থেকে নিয়মিত খবর আসতো। এদিক থেকে এগিয়ে যাচ্ছে রাণা সাঙ্গার ফৌজ।

সুলতান ইব্রাহিম লোদী এগিয়ে আসছে উত্তরদিক থেকে। শীতকাল এসে গেছে। কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস। খ্রীষ্টাব্দ পনেরো শ' আঠারো।

বুঁদীর কাছে বাকারোল। সেখানে মুখোমুখি হোলো দিল্লী ও মেবারের ফৌজ।

প্রবল যুদ্ধ।—জীবনপণ করে লড়াই করলো দু'পক্ষই।

হিন্দুস্তান কার হবে, সুলতানের না রাণার, তারই ফয়সালা করতে হবে এই যুদ্ধে। একথা জানতো দু'পক্ষই। তাই মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করলো ইব্রাহিম লোদী ও সাঙ্গা দুজনেই।

শেষ পর্যন্ত ইব্রাহিম লোদীরই হার হোলো। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালাতে শুরু করলো দিল্লীর ফৌজ।

যুদ্ধ যখন শেষ হোলো তখন আনন্দ উল্লাস শুরু হোলো রাজপুতদের মধ্যে। ওরা এসে ছাউনি ফেললো খাটোলীতে।

সেদিন গভীর রাতে ক্লান্ত রাজপুতেরা যখন ঘুমে অচেতন হয়ে আছে, তখন হঠাৎ রাজপুতশিবিরের উপর চড়াও হোলো ইব্রাহিম লোদী।

রাজপুতেরা ভাবতেই পারেনি যে, সুলতান তার ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের একাংশকে জড়ো করে রাতারাতি আবার আক্রমণ করবে।

ভালো করে কিছু বুঝে উঠবার আগেই অনেকের বুকে বিঁধে গেল দিল্লী-ওয়ালাদের তলোয়ার। অনেকে ঘুমে ভারী চোখ একহাতে কচলাতে কচলাতে হাতড়ে হাতড়ে তলোয়ার নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। কিন্তু শত্রু দেখতে পেলো না। শুধু দেখলো অন্ধকারের মধ্যে সবাই এদিক ওদিক পালাচ্ছে।

কেউ পালালো, কেউ রুখে দাঁড়ালো, কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই মারা পড়লো। কেউ বা কিছুক্ষণ এলোপাথাড়ি তলোয়ার চালিয়ে শত্রুসেনার অস্ত্রাঘাতে জখম হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

চারদিকে শুধু উন্মত্ত চিৎকার আর আর্তনাদ। হাজার হাজার জুতোর আওয়াজ, আর ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি। চারদিকে শুধু হাজার হাজার লোকের উত্তরঙ্গ প্রবাহ।

শেষ পর্যন্ত কোনো রকমে রুখে দাঁড়ালো রাজপুতেরা।

সারারাত যুদ্ধ করে ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের নিয়ে পালিয়ে গেল ইব্রাহিম লোদী। অল্প সৈন্য নিয়ে দিনের আলোয় রাজপুতদের মোকাবিলা করার সাহস তার নেই।

অবসর পেয়ে চেনা-জানাদের খোঁজখবর নিতে লাগলো রাজপুতেরা।

মারা গেছে অনেকেই। দরবারের সর্দারদের মধ্যে যারা রাণা সাঙ্গার সঙ্গে ছিলো, তাদের মধ্যে বেঁচে আছে শুধু অল্প কয়েকজন।

রাণা সাঙ্গার জামা রক্তে লাল হয়ে গেছে। প্রাণ বেঁচেছে অল্পের জন্যে। কিন্তু একটি হাত কাটা গেছে।

ভোজরাজকে পাওয়া যাচ্ছে না।

অনেকক্ষণ উৎকণ্ঠ অনুসন্ধানের পর অনেক মৃতদেহের মধ্যে এক জায়গায় পাওয়া গেল ভোজরাজকে।

প্রথমে সবাই ভেবেছিলো সে বেঁচে নেই। কিন্তু তারপর দেখা গেল সে অজ্ঞান হয়ে আছে। জখম হয়েছে শরীরের অনেক জায়গায়। সারা শরীরে শুধু রক্ত আর রক্ত আর রক্ত।

রাণা সাঙ্গার বিশ্রাম নেওয়ার অবসর নেই। একটু সেরে উঠতে ওই অবস্থাতেই আবার ফৌজ নিয়ে রওনা হোলো দক্ষিণ দিকে। মালব ও গুজরাট মেবার আক্রমণ করার উদ্যোগ করছে। তাদের রুখতে হবে।

ভোজরাজকে ফিরিয়ে আনা হোলো চিতোরগড়ে।

ভোজরাজ জখম হয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে।

সবাই জেনে গেল সে আর বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না। হয়তো আর বাঁচবেও না বেশীদিন।

ভালোই হোলো,—ভোজরাজ বললো মীরাকে,—আর তোমাকে ছেড়ে যেতে হবে না। শেষদিন পর্যন্ত তোমার কাছেই থাকতে পারবো।

মীরা ওর চুলে হাত বুলিয়ে দিলো।

মহলে সবারই মন ভার। শুধু হাসি ফুটে উঠলো কুমার মালদেব রাঠোরের মুখে, রানী ধনবাঈয়ের মুখে।

ভোজরাজ আর রাণা হতে পারবে না। কুমার রতনসিংহের পথ পরিষ্কার হয়ে গেল।

রাণা সাঙ্গা চিতোরগড়ে নেই। যুদ্ধ করতে গেছে গুজরাটে।

নিজেকে একেবারে নিঃসঙ্গ মনে হোলো বড়োরানী কুঁয়রবাঈয়ের। শুধু নিজের মহলে বসে চোখের জল ফেলেই সময় কাটে।

ধনবাঈ মাঝে মাঝে আসে সান্ত্বনা দিতে।

কিন্তু কুঁয়রবাঈ জানে এ শুধু একটা মৌখিক সহানুভূতি। ভোজরাজের এই দুর্বিপাকে খুশী হয়েছে ধনবাঈ। তাকে দেখলে কুঁয়রবাঈয়ের বুকের ভিতর জ্বালা ধরে যায়।

মাঝে মাঝে মীরার মহলে যেতে হয় ভোজরাজকে দেখবার জন্যে। কুঁয়রবাঈয়ের মতো অন্য রানীরাও যায় এবং সঙ্গে যায় মহলের অন্য মেয়েরা।

সবাই যখন ভোজরাজকে ঘিরে নিজেদের মধ্যে বিলাপ করে, তখন আড়-চোখে তাকিয়ে দেখে মীরার দিকে।

মীরা শান্তভাবে নিজের পূজোর ঘরে বসে গিরধরজীর শৃঙ্গার করছে।

কুঁয়রবাঈ একবার ভোজরাজকে জিজ্ঞেস করেছিলো, তাকে অন্য কোনো মহলে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করবে কিনা।

কেন মা?—ভোজরাজ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিলো।

মীরা তখন মালা গাঁথছে গিরধরজীর সামনে বসে।

কুঁয়রবাঈ বললো,—এখানে তোমার যত্ন হচ্ছে না ঠিক মতো।

ভোজরাজ ঠোঁট কামড়ালো। সে জানে সে আর বেশীদিন নেই। এখন আর কারো মনে আঘাত দেওয়ার ইচ্ছে নেই। তবু না বলে পারলো না,—তোমার যদি তাই ধারণা হয়ে থাকে, তাহলে আমার কাছে তুমি আর বেশী এসো না।

কুঁয়রবাঈ কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলো মীরার মহল থেকে।

রাওলায় নানাজনের মুখে একই প্রশ্ন,—কেন ওভাবে বেরিয়ে আসতে হোলো রানী-সা'কে।

কিছু সত্যি কিছু বানানো কথা ছড়িয়ে পড়লো সবার মুখে মুখে।

মীরাজী তাঁর গিরধরকে নিয়েই ব্যস্ত। কুঁয়র-সা'কে দেখবার ফুরসত তার নেই।

কুঁয়র-সা'কে নিজের মহলে নিয়ে আসতে চেয়েছিলেন রানী-সা'। কি জানি, মীরা-জী কিছু বলেছেন হয়তো। তা নইলে রানী-সা'র মতো অতো শক্ত মানুষ চোখের জল ফেলবে কেন? সব শাশুড়ীর এই হাল হয় ছেলের বৌয়ের হাতে।

ওই শোনা, ওই শোনো, গান গাইছে মীরাজী।

তার স্বামীর জীবন শেষ হয়ে আসছে, আর তিনি গান গাইছেন মনের আনন্দে।

ম্হারো জনম মরণ কো সাথী,
থানে নহীঁ বিসরূঁ দিন রাতী।

বাঃ, এ গান গাইবার সময়? এখন উনি আমার জীবন-মরণের সাথীর কথা ভাবছেন। তাকে তিনি দিন রাত ভুলতে পারছেন না।—যতো ঢং।

আগেই রানীজীকে বলেছিলাম, বাবা, ওই মেড়তিয়া রাঠোর মেয়েটিকে বৌ করে ঘরে এনো না। ও সংসার করবে না।

এখন দেখছি এই মেয়েটি একেবারে অলক্ষুণে। অমন উপযুক্ত ছেলে ভোজরাজ। আহা, তাকে অকালে চলে যেতে হচ্ছে সংসার ছেড়ে? কোথায় মীরা তোমার গিরধরজী। রাতের পর রাত তো প্রভুজী প্রভুজী করে গান গাইছো। এখন বলো তোমার গিরধরজী এসে সারিয়ে দিয়ে যাক ভোজ-রাজকে।

আমরা আগেই জানতাম এরকম হবে। নতুন বৌ এসে যখন কালীজীর মন্দিরে ঢুকে প্রণাম করতে অস্বীকার করলো তখনই জানতাম কিছু একটা অঘটন ঘটতে যাচ্ছে, একটা অমঙ্গল এসে ঢুকেছে সিসোদিয়া রাজবংশে।

ভোজরাজের শয্যার পাশে বসেছিলো মীরা। চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ছিলো।

সংসারে আর কারো সামনে তার চোখের জল দেখা যায় না। কিন্তু এই একটি মানুষের কাছে মীরা দুর্বল।

ভোজরাজ তার শীর্ণ হাতখানি আস্তে আস্তে বাড়িয়ে হাত রাখলো মীরার মাথার উপর।

ওদের কথায় কান দিয়ো না মীরা। ওরা খুব সামান্য।

আমাকে আর কোনোদিন গান গাইতে বোলো না কুঁয়র-সা, আর কোনোদিন না।

না মীরা, তুমি গান গাইবে, চিরকাল গাইবে, যুগযুগান্তর ধরে গাইবে।

তুমি তো শুনতে পাবে না।

হ্যাঁ, শুনতে পাবো। তোমার সঙ্গে থেকে থেকে তো আমি নিজেকে চিনেছি। আমিই তিনি। তিনিই আমি। আমার মৃত্যু নেই। আমার জন্ম নেই। আমার তুমি। তোমার আমি। আমি চিরকাল তোমার চারপাশে ছড়িয়ে আছি। আমিই শুনবো। সবাই শুনবে। তাদেরই মনের মধ্যে থেকে আমি শুনবো।

জীবনে ওই একবারের মতো দুর্বল হয়ে পড়েছিলো মীরাবাঈ। একেবারে জোর পাচ্ছিলো না মনের মধ্যে।

কিন্তু ভোজরাজ তাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে তার মন শান্ত করে আনলো।

তোমার গান মীরা, আর কিছু নয়, শুধু তোমার গান। জীবন মৃত্যু যেখানে এক হয়ে মিশে গেছে, আমাকে সেখানে পৌঁছে দাও তোমার গানের মধ্যে দিয়ে।

কুঁয়র-সা কেমন আছেন?—চারদিকে উৎকণ্ঠ প্রশ্ন।

ভালো না। অবস্থা খুব খারাপ হয়ে এসেছে।

ওই শোনো, মীরা গান গাইছে।

—সুনি ম্যঁয় হরি আওয়নকে আওয়াজ…

চোখ বুজে আছে ভোজরাজ, জল গড়িয়ে পড়ছে মীরার চোখ দিয়ে। সে বছর পনেরো শো একুশ খ্রীষ্টাব্দ।—সে বছরই ভোজরাজ মারা গেল।

॥ নয় ॥

অত্যন্ত গুমোট থমথমে চিতোরগড়ের রাওলার আবহাওয়া। কুমার ভোজ-রাজের মৃত্যুর পর সেই যে শয্যাশায়ী হয়ে আছে মহারানী কুঁয়রবাঈ সোলাঙ্কী আর তাকে বাইরে দেখা যায় না। মন ভেঙে গেছে মহারাণা সাঙ্গারাও। চোখে সব সময় একটা শূন্য দৃষ্টি। এতদিনকার সব স্বপ্ন যেন অর্থহীন হয়ে গেছে।

উত্তর ভারতে খুব জটিল পরিস্থিতি। শোনা যাচ্ছে দিল্লীতে আস্তে আস্তে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে উঠছে ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে। কান্দাহার থেকে বাবরের দূত চিতোরে এসেছে রাণার সঙ্গে গোপনে কথাবার্তা চালাতে।

রাও সুরজমল, করমচাঁদ, সালুম্ব্রার রাও রতন এরা সবাই বলছে—দিল্লীর বিরুদ্ধে আবার অভিযান আরম্ভ করার এই উপযুক্ত সময়।

কিন্তু রাণা সাঙ্গার কোনো আগ্রহ নেই। সব উৎসাহ যেন হঠাৎ চলে গেছে।

কি হবে দিল্লী অধিকার করে? হিন্দুস্তানের সাম্রাজ্য? কার জন্যে?

—কেন? আমরা নেই?—বলছে কুমার রতনসিংহ। ভোজরাজের সঙ্গে সঙ্গেই কি শেষ হয়ে গেল মেবারের ইতিহাস?

কথাটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাণার কানে তুলেছিলো রতনসিংহের মা, রানী ধনবাঈ রাঠোর।

রাজ্য আমি গড়ে যেতে পারি,—বললো রাণা সাঙ্গা,—কিন্তু আমার পরে কেউ আর রাখতে পারবে না।

মুখ রাঙা করে ঠোঁট কামড়ে ফিরে এলো রানী ধনবাঈ।

বেশ দেখা যাবে,—বললো রতনসিংহ।

হ্যাঁ, দেখা যাবে,—গোঁফে তা দিয়ে বললো বনবীর সিংহ।

কিন্তু তার আগে স্থির করতে হবে, কে হচ্ছেন মেবারের টিকায়েত, রাজ্যের ভাবী রাজা,—বললো ধনবাঈয়ের ছোটো ভাই, জোধপুরের কুমার মালদেব।

ভাবী রাজা কুমার রতনসিংহ। এতে কি কারো কোনো সন্দেহ আছে?

কিন্তু রাণাজী তো সেকথা এখনো বলেন নি মুখ ফুটে। কে হবে রাজ-সিংহাসনের উত্তরাধিকারী সেটা স্থির করবেন রাণা। অন্যান্য সর্দারদের অনুমোদন নিয়ে যখন ঘোষণা করা হবে প্রকাশ্য দরবারে, তখনই হবে এ প্রশ্নের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি। তার আগে তো নিশ্চিত হয়ে কিছুই বলা যায় না।

ব্যাপারটা ঘোরালো হয়ে উঠেছে অনেক আগের থেকেই। খাটোলির যুদ্ধে জখম হয়ে যখন শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলো কুমার ভোজরাজ, কারো অজানা ছিলো না যে, ভোজরাজ আর বাঁচবে না বেশীদিন। কে হবে সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, এ প্রশ্ন নিয়ে আলোড়ন উঠেছে তখন থেকেই।

মেবারের ভাবী মহারাণা কে? অন্য রাজকুমারদের মধ্যে সবার বড়ো রতনসিংহ, রানী ধনবাঈয়ের ছেলে। তারই তো হওয়া উচিত। কিন্তু রাণা সাঙ্গা মুখ ফুটে কিছু বললো না। সবাই শুধু লক্ষ করলো যে, ছোটোরানী কারমেতনবাঈকে অনেক বেশী ভালোবাসে রাণা সাঙ্গা। শুধু তারই মহলে যাওয়া আসা। রানী ধনবাঈয়ের সঙ্গে মোটেও মাখামাখি নেই।

কারমেতনবাঈয়ের ছেলে বিক্রমজিতের তখন পাঁচ কি ছয় বছর বয়েস। রাণা সাঙ্গার যা-কিছু স্নেহ শুধু তার জন্যে।

তবু যে-কটা দিন কুমার ভোজরাজ বেঁচে ছিলো এ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো আলোচনা হয় নি। কিন্তু সে মার যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবার মুখে শোনা গেল শুধু একটি প্রশ্ন—রাণা সাঙ্গার উত্তরাধিকারী মনোনীত হচ্ছে কে? রতনসিংহ? না, বিক্রমজিত?

এরই মধ্যে আরেকটি ছেলে হয়েছে রানী কারমেতনবাঈয়ের। নাম রাখা হয়েছে উদয়। সবেমাত্র কয়েক মাস বয়েস।

মহলে এলেই রাণাজী তার খোঁজ করে। তাকে কোলে নিয়ে আদর করে। তবু তাকে নিয়ে কোনো প্রশ্ন নেই। রাণা সাঙ্গার আশপাশে ঘুরঘুর করে কুমার বিক্রমজিত আর তার তিন বছরের ছোটোবোন উদাবাঈ।

সবাই দূর থেকে তাকিয়ে দেখে আর পরস্পরকে জিজ্ঞেস করে,—কে আমাদের ভাবী রাণা? রতনসিংহ, না বিক্রমজিত?

কেউ বলে রতনসিংহ। কেউ বলে বিক্রমজিত।

দুটো দল হয়ে গেছে দরবারে, এবং মহলের ভিতরেও। রাও সুরজমল, করমচাঁদ, অম্বরের পৃথ্বিরাজ, এরা কেউ চায় না রতনসিংহকে যুবরাজ করতে। রতনসিংহ মারওয়াড়ের রাজার ভাগ্নে। সে রাণা হলে মারওয়াড়ের প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যাবে। আসল ক্ষমতা এসে যাবে রানী ধনবাঈ রাঠোর আর তার ভাই মালদেবের হাতে।

সেটা হতে দিতে চায় না অনেকেই, বিশেষ করে রানী কারমেতনবাঈয়ের ভাই রাও সুরজমল, মীরার বাবা রতনসিংজী আর ওর জ্যাঠা বীরমদেব। অনেকের সন্দেহ হচ্ছে, নিজের ভাগ্নে বিক্রমজিতকেই যুবরাজ করবার মতলব আঁটছে রাও সুরজমল।

রানী ধনবাঈ আর রানী কারমেতনবাঈয়ের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। মহারানী কুঁয়রবাঈ শয্যা গ্রহণ করেছে ভোজরাজের মৃত্যুর পর থেকে।

রাণা সাঙ্গা এসব ব্যাপারে একেবারে নিস্পৃহ।

রাজমাতা মহারানী রতনকুঁয়র ঝালীর শরীরও শোকে ভেঙে পড়েছে।

শোক আর চাপা রেষারেষিতে থমথমে হয়ে আছে চিতোরগড়ের আবহাওয়া।

মীরা কোথায়? মীরাবাঈ?—মাঝে মাঝে প্রশ্ন শোনা যায় কারো কারো মুখে।

তার সম্বন্ধে কারো আর কোনো মাথাব্যথা নেই। গিরধজীর মন্দির গড়া শুরু হয়েছিলো। এখন থেমে আছে। ছোটো মন্দির। কারও যেন

আর আগ্রহ নেই। মীরাকে দেওয়া হয়েছে একটি আলাদা মহল। কেল্লার প্রাচীরের কাছে এই মহল এককালে ছিলো রাণা কুম্ভের মহলের অংশ। এখন সবাই বলে কুঁয়র পদে_কা মহল। সেখানে গিরিধারীর বিগ্রহ নিয়ে একলা পড়ে আছে মীরাবাঈ। প্রাসাদের অন্তর্দ্বন্দ্বে তার কোনো কৌতূহল নেই। কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই। সে গিরিধারীর সেবা আর পূজো নিয়েই ব্যস্ত। অবসর সময় দেখা যায়, সে নিজের মনে গান তৈরী করছে, নিজের মনে গাইছে।

প্যারে দরসন দীজো আয়,
তুম বিন রহিয়ো ন জায়।
জল বিন কমল চাঁদ বিন রজনী,
ঐসে তুম দেখিয়াঁ বিন সজনী।...

নানা রকম কথা শোনা যায় চিতোরগড়ের রাওলার মেয়েদের মধ্যে।

—স্বামী মারা গেছে, তবু গান?

—কার জন্যে ভাই? প্যারে দরসন দীজো আয়। প্যারে, এসে দর্শন দিয়ে যাও। কার জন্যে এই প্যার? আহা, তুম বিন রহিয়ো ন জায়। তোমায় ছাড়া থাকতে পারছি না।

নিজেদের মধ্যে হাসাহাসি করে রাওলার রাজপুতানীরা।

কে হবে যুবরাজ? রতনসিংহ না বিক্রমজিত?—ঘুরে ফিরে আবার সেই একই প্রশ্ন।

মীরাবাঈয়ের বাবার নাম রতনসিংহ, আমাদের রাজকুমারের নামও রতনসিংহ। কিন্তু কেউ কাউকে দু'চোখে দেখতে পারে না।

হ্যাঁ, মীরার বাবা রতনসিংজী তো আমাদের কুমার রতনসিংহের বিপক্ষে। এবং মীরার জ্যাঠা বীরমদেবজীও।

মীরাকে দেখলে কুমার রতনসিংহ কি রকম চাউনিতে তাকায় দেখেছো? দু'চোখে যেন বিষ উপচে পড়ে।

কারো পরোয়া করে না মীরাবাঈ।

সে আর কদ্দিন। রাণা সাঙ্গাজী যদ্দিন বেঁচে আছেন, মীরাবাঈ কুমার রতনসিংহ আর রানী ধনবাঈয়ের পরোয়া না করে চলতে পারবে। কিন্তু পরে যখন রাণা হবে রতনসিংহ, তখন কি হবে? জোধপুরের রাঠোরেরা মেড়তার রাঠোরদের দু'চোখে দেখতে পারে না। মীরা মেড়তিয়া রাঠোর, রতনসিংহ জোধপুরের ভাগ্নে। ওকে আর মহলে থাকতে দেবে মনে করেছো?

আর যদি কুমার বিক্রমজিত রাণা হয়?

কিছুই বলা যায় না। বনবীরসিংহ আছে কুমার রতনসিংহের পেছনে। সে রাণাজীর ভাইপো। তার অনেক ক্ষমতা।

ভাইপো?—হেসে ওঠে দু-চারজন রাজপুতানী,—হ্যাঁ, তা তো বটেই, রাণাজীর ভাই কুমার পৃথ্বিরাজের ছেলে। কিন্তু যাই বলো, সে জারজ পুত্র। বিবাহিতাস্ত্রীর ছেলে তো নয়। তার যেটুকু ক্ষমতা সে শুধু রাণা সাঙ্গার অনুগ্রহে। রাণার অবর্তমানে ওই ক্ষমতা দু'দিনও থাকবে না। আসল ক্ষমতা রাও সুরজমলের হাতে। উনি এখন প্রধান মন্ত্রী। মীরার বাবা রতনসিংজী আর ওর জ্যাঠা বীরমদেবজীর ক্ষমতাও কম নয়।

কিন্তু যাই বলো, রাওলার ভিতর যখন এই অবস্থা, সবার মনমেজাজ খারাপ, মীরাবাঈ যে সারাদিন নিজের গানবাজনা নিয়ে পড়ে থাকে, এটা ভালো দেখায় না।

কথাটা মীরার কানেও ওঠে। রাওলায় দুটো দল হয়ে গেছে, একদল কুমার রতনসিংহের পক্ষে, অন্যদল তার বিপক্ষে। রাওলার অন্যান্য রাজপুতানীদের মতো সেও কোনো না কোনো পক্ষে থাকবে এটা প্রত্যাশা করে সবাই। কিন্তু মীরার কোনো আগ্রহ নেই এসব ব্যাপারে। সে একলা পড়ে থাকে নিজের মহলে। তার আছে গিরধরজীর বিগ্রহ। আর কাউকে তার প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ বিগ্রহ রাজনৈতিক দলাদলি কোনো ব্যাপারে তার নেই বিন্দুমাত্র কৌতূহল।

হ্যাঁ, তারও একটা স্বপ্ন ছিলো এককালে। সারা হিন্দুস্তান একসঙ্গে নিয়ে গড়ে উঠবে একটি সাম্রাজ্য। সেখানে থাকবে না কোনো সাম্প্রদায়িক বিভেদ। উঁচু জাত নিচু জাত বলে কিছু থাকবে না। গিরধরজীর চোখে যে সবাই সমান। যুদ্ধ বিগ্রহ সব বন্ধ হয়ে যাবে। সারা দেশে সবাই শান্তিতে থাকবে, সবাই সুখে থাকবে।

মীরা আর ভোজরাজ দুজনে মিলে তৈরী করেছিলো এই স্বপ্নের স্বর্গ। রাণা সাঙ্গাজীর সঙ্গেও কথা হোতো মাঝে মাঝে।

আমি তৈরী করে দিয়ে যাবো,—বলতেন রাণাজী,—তোমরা গড়ে তুলবে দুজনে মিলে।

সেকথা সেদিন মীরা বলছিলো মহারানী রতনকুঁয়র ঝালীকে।

প্রাসাদের অন্য রানীরা কেউ মীরাবাঈয়ের খোঁজখবর নেয় না। শুধু বৃদ্ধা রাজমাতা রানী ঝালী মাঝে মাঝে আসে মীরাকে দেখতে।

মীরা তখন চুপচাপ বসে গীতা পড়ছিলো। ঝালী রানীকে দেখে বই বন্ধ করে উঠে এসে প্রণাম করলো।

তাকিয়ে দেখলো রানী রতনকুঁয়র ঝালী। মীরার মুখ শান্ত। চোখ দুটি স্নিগ্ধ। কোনো রকম শোক বা বেদনার ছাপ নেই।

তোমাকে দেখলে আমার আর গীতা পড়ার দরকার হয় না,—ঝালী রানী বললো মীরাকে জড়িয়ে ধরে। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো।

আমরা ভুল রাস্তায় যাচ্ছিলাম,—মীরা সেদিন বলেছিলো ঝালী রানীকে, —একজন রাজা তলোয়ার হাতে নিয়ে সারা দেশ জয় করবেন, তারপর তিনি কিংবা তাঁর বংশধর নিজেদের মনের মতো করে ধর্মরাজ্য গড়ে তুলবেন, এভাবে হয় না।

—তা হলে আর কিভাবে হবে? আপনা আপনি?

মাথা নাড়লো মীরাবাঈ। না, এ তো কারো একলার কাজ নয়। তার আগে সচেতন করে তুলতে হবে সারা দেশের সাধারণ মানুষকে। যেমন করছেন বাংলার চৈতন্যদেব।

চৈতন্যদেবের খবর ঝালী রানীর কানে এসেছিলো। হিন্দুস্থানের পূর্বপ্রান্তে বাংলাদেশ। সেখানে এখন সুলতান হোসেন শাহর রাজত্ব। যাদের হাতে রাজনৈতিক ক্ষমতা, যাদের হাতে ধনদৌলত, ব্যবসাবাণিজ্য, আর জমিদারী, তাদের দাপটে অতিষ্ঠ হয়ে আছে সাধারণ মানুষ। এদের মনে শুধু ভয়, শুধু দুর্ভাবনা, শুধু আতঙ্ক। তাদের মনে নতুন করে জীবনবোধ জাগিয়ে তোলার কাজে নেমেছিলেন শ্রীচৈতন্য নামে এক বৈষ্ণব সন্ন্যাসী।

ভয়? কিসের ভয়? কাকে ভয়? সবাই সমান। শুধু হাতিয়ারের জোরে কি সাধারণ মানুষকে দাবিয়ে রাখা যায়? পথে নেমে এসো, সবার সঙ্গে গলার সুরে সুর মেলাও। আসল জোর ভালোবাসার জোর, সাধারণ মানুষের পরস্পরের জন্যে ভালোবাসা। মন থেকে ভয় চলে গেলে এক নতুন শক্তির সন্ধান পাবে। সেই শক্তির কাছে স্বৈরাচারীর রাজশক্তি একেবারে তুচ্ছ।

এক নতুন নেশায় সাধারণ মানুষকে মাতিয়ে তুলেছে সুদূর বাংলার এক শ্রীচৈতন্য, যে রাজা নয়, যোদ্ধা নয়, যার হাতিয়ার নেই, সৈন্য নেই। তুচ্ছ করো স্বৈরাচারী শাসনকে। পথে নেমে এসো। সুরে সুর মেলাও। একসঙ্গে দল বেঁধে এগিয়ে চলো। শুনেছো? দরজায় খিল দিয়েছে শহরের কাজী সাহেব।

সেই সুদূর বাংলা থেকে খবর এসে গেছে এখানে রাজপুতানায়,

চিতোরগড়ের রাওলায়। মীরাবাঈ শুনেছে, রাণা সাঙ্গা শুনেছে, ঝালী রানী শুনেছে। উদয়সিংহের ধাত্রী পান্নাবাঈ শুনেছে, বনবারও শুনেছে।

ভয়? কিসের ভয়? কাকে ভয়?—একই কথা শোনা গেছে কবীরের মুখেও। কাশীর এক অতি সাধারণ মুসলমান জোলা, যার চোখে হিন্দু মুসলমান সবাই সমান। দিল্লীর লোদী সুলতানও তার কোনো ক্ষতি করতে পারলো না? সত্যি, তার এ জোরই বা এলো কোত্থেকে?

তার খবরও চিতোরগড় জানতো।

কুম্ভশ্যামের মন্দিরে আসে নানা দেশের পরিব্রাজক সন্ন্যাসী। খবর আসে তাদের মুখে। কবীরের লেখা গান সেখানে এসে শুনিয়ে গেছে একজন। গৌড়দেশ থেকেও এসেছিলো দুজন পরিব্রাজক। কুম্ভশ্যামের মন্দিরে সেদিন জয়দেবের গীতগোবিন্দের গান। শুনতে শুনতে ওরা দুজন কেঁদে ভাসিয়ে দিলে। তারপর বললো, আমরাও গাইবো আমাদের দেশের গান।

কারো বুঝতে অসুবিধা হোলো না। ব্রজবুলি সবাই জানে।

সেদিন রাণা সাঙ্গাও ছিলো কুম্ভশ্যামের মন্দিরে।

এ গান কার রচনা?—জিজ্ঞেস করলো রাণা সাঙ্গা।

—আমাদের দেশের একজন পদকর্তা। বড়ু চণ্ডীদাস তার নাম।

পরিব্রাজকদের কাছে ডেকে তার কথা শুনলো মীরাবাঈ। ছিলো বাসুলীর মন্দিরের পূজারী। রামী নামে এক ধোবানীকে ভালোবাসতো। মাত্র অল্প কয়েক বছর আগেকার কথা। সে সময় গৌড়ে সুলতান ইউসুফ শাহর রাজত্ব।

ওরা যাওয়ার সময় মীরাবাঈকে দিয়ে গেল শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি পুঁথি।

সেখান থেকে বেছে বেছে অনেক গান মীরাবাঈ কয়েকবার গেয়ে শুনিয়েছে ঝালী রানীকে।

ভয়? কিসের ভয়? কাকে ভয়?—বলছে আরো একজন। নাম তার নানক।

নানক কে? তার নাম এখনো অনেকে জানে না। ঝালী রানীও মোটে সেদিন শুনেছে তার কথা।

মীরাবাঈও শুনেছে। পাঞ্জাবের আরেকজন অতি অসাধারণ মানুষ এই নানক: ভক্ত সাধক হিসেবে তাকে সবেমাত্র চিনতে শুরু করেছে কেউ কেউ। সেও বলছে একই কথা। কাকে ভয়? ভালোবাসতে শেখো। সবাই সমান।

রাজা আর রাজপুত্র, সুলতান আর বাদশাহ, এরা নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ করেই নিজেরা শেষ হয়ে যাবে,—বলছিলো মীরাবাঈ,—পুরোনো রাজ্য

যাবে, নতুন রাজ্য গড়ে উঠবে, আবার তাও শেষ হয়ে যাবে। ইব্রাহিম লোদী, রাণা সাঙ্গা, সবারই একই পরিণতি। এ পথে কিছু হবে না। তাই কে হবে মেবার রাজতক্তের ভাবী উত্তরাধিকারী, কুমার রতনসিংহ, না কুমার বিক্রমজিত, এতে আমার আর কোনো আগ্রহ নেই।

ঝালী রানী স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো, তোমার বাবা রতনসিংজী আর তোমার জ্যাঠা বীরমদেবজী যে কুমার রতনসিংহের বিপক্ষে একথা সবাই জানে। এ জন্যে রানী ধনবাঈ, কুমার রতনসিংহ এদের মনে একটা বিরূপ ধারণা আছে তোমার সম্বন্ধে। তাই তোমায় সাবধান করে দেওয়ার জন্যেই আমি এসেছি।

মীরাবাঈ হেসে বললো,—আমি তো কাউকে ভয় পাই না।

—সে আমি জানি। তবু তোমার সাবধান হওয়া উচিত।

—কেন?

—কেউ তোমাকে কিছু বলতে সাহস করে না রাণাজীর ভয়ে। কিন্তু উনি যুদ্ধে যাচ্ছেন।

—যুদ্ধ? আবার? কার সঙ্গে?

মীরা এখনো শোনে নি। দরবারে আজই খবরটা এসেছে। কিন্তু চিতোরের রাওলায় এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে।

মালবের সুলতান মাহমুদ আর গুজরাটের সুলতান মুজফ্‌ফর শাহ একসঙ্গে মেবার আক্রমণ করেছে। রাণা সাঙ্গা নিজে যুদ্ধে যাচ্ছেন তাদের রুখবার জন্যে। সঙ্গে যাচ্ছে রাও সুরজমল, আর মীরার বাবা রতনসিংজী ও জ্যাঠা বীরমদেবজী।

তীব্র দৃষ্টিতে তাকালো মীরা। বললো,—মালব আর গুজরাট একসঙ্গে আক্রমণ করেছে? ওদের সাহস হয়েছে মেবার আক্রমণ করার? এই তো সেদিন রাণাজী গগরাঁওর যুদ্ধে মালবের সুলতানকে হারিয়ে রণথম্ভোর কেল্লা দখল করলেন আজ পুরো চার বছরও হয় নি। উনি তো উত্তর মালব অধিকার করেছেন সেদিন। মাত্র দু'বছর আগে যখন গুজরাট আক্রমণ করেছিলেন, তখন পিছু হটে গিয়েছিলো মুজফ্‌ফর শাহ। এরই মধ্যে তাদের এত জোর বেড়ে গেল?

দরবারে আর রাওলার সবাই তো এ কথাই বলছে।—বললে ঝালী রানী।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো মীরাবাঈ। না, তাদের জোর বাড়ে নি, নিশ্চয়ই আমরা দুর্বল হয়ে পড়েছি। সে খবর ওরা জেনে গেছে।

বলতে বলতে হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো মীরাবাঈ।

—আমার দেখা করা দরকার রাণাজীর সঙ্গে। খুব জরুরী দরকার।

—কেন?

—কথা আছে ওঁর সঙ্গে। খুব গোপন, খুব জরুরী।

—রাণাজীর মহলে তোমার যাওয়া তো ঠিক হবে না মীরাবাঈ। চারদিকে সবার সতর্ক দৃষ্টি। সবার মনে হবে রতনসিংহ বিক্রমজিত এ দু'পক্ষের রেষারেষিতে তুমিও জড়িয়ে পড়ছো।

—কিন্তু ওঁকে এখানে আসবার জন্যে তো আমি ইত্তলা দিতে পারি না।

—আজ সন্ধ্যায় রাণাজী আমার মহলে আসছে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্যে। উনি তোমার কথা একবার জিজ্ঞেস করবেন নিশ্চয়ই। আমি তখন ওঁকে সঙ্গে নিয়ে একবার এখানে আসতে পারি। এ তো কিছু নতুন নয়। রাণাজী মাঝে মাঝে আসেন গিরধরজীকে প্রণাম করার জন্যে।

॥ দশ ॥

যুদ্ধে যাচ্ছেন?—মীরা রাণা সাঙ্গাকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলো।

হ্যাঁ মীরাবাঈ, যুদ্ধে যাচ্ছি,—বলতে বলতে হঠাৎ রাণার চোখে জল এসে গেল। সজল হয়ে উঠলো ঝালা রানীর চোখ দুটিও। শুধু মীরা শান্তভাবে গিরধরজীর পাদোদক এনে দিলো রাণার হাতে।

কেউ কিছু বললো না। কিন্তু সবাই বুঝলো। একটা বড়ো রকম যুদ্ধে এই প্রথম একা যাচ্ছে রাণা সাঙ্গা। এবার আর সঙ্গে নেই কুমার ভোজরাজ।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো সবাই। তারপর মীরা জিজ্ঞেস করলো,—কুঁয়র-সা যাচ্ছেন না আপনার সঙ্গে?

—কে? রতনসিংহ? না, সে যাচ্ছে না।

—কেন?

—ও একেবারে ছেলেমানুষ।

মীরা একটু হাসলো। বললো,—কিন্তু কুমার বিক্রমজিতকে সঙ্গে নিচ্ছেন। সে তো আরো ছেলেমানুষ। মোটে ছয় বছর বয়েস।

—ওকেও নিতাম না। কিন্তু রানী কারমেতনবাঈ সঙ্গে যাচ্ছে, তাই বিক্রমজিতকেও সঙ্গে নিতে হচ্ছে।

—সবাই এটা লক্ষ্য করবে। আগে বড়ো কুমারজী আপনার সঙ্গে থাকতেন

প্রত্যেকটি যুদ্ধে। এবার নিয়ে যাচ্ছেন বিক্রমজিতকে। রতনসিংহকে এখানে রেখে যাচ্ছেন।

একটু কঠিন হয়ে গেল রাণা সাঙ্গার মুখখানি। কোনো উত্তর দিলো না।

আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?—মীরা জিজ্ঞেস করলো।

—বলো।

—কুমার রতনসিংহকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

একটা ম্লান হাসি ফুটে উঠলো রাণা সাঙ্গার মুখে। চুপ করে একটু ভাবলো। তারপর বললো,—হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরতে পেরেছো। ভেতরের রহস্য আমিও টের পেয়েছি। আর কেউ বুঝতে পারে নি।

ঝালী রানী বিস্মিত হয়ে তাকালো দু'জনের দিকে।

মায়ের দিকে ফিরে রাণা সাঙ্গা বললো,—রাওলার ভেতরে যে রেষারেষি চলছে, এ খবর এখান থেকেই গেছে গুজরাট ও মালবের সুলতানদের কাছে। ওদের এক রকম আমন্ত্রণই জানিয়েছে আমাদেরই কয়েকজন প্রভাবশালী সর্দার।

ঝালী রানী বিচলিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো,—সে কি? নাম কি ওদের?

মীরাবাঈকে জিজ্ঞেস করো,—বললো রাণা সাঙ্গা।

সে কি করে জানবে?—জিজ্ঞেস করলো ঝালী রানী।

একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললো রাণা সাঙ্গা। তারপর বললো রাজপুতানায় রাজনীতি বোঝে শুধু দু'জন। একজন আমি, অন্যজন মীরাবাঈ। হিন্দুস্তানের দুর্ভাগ্য যে, কোনোদিন মীরাবাঈকে রাজরানী হিসেবে পাবে না।

আবার চুপ করে রইলো সবাই।—অনেকক্ষণ।

ঝরোকার বাইরে অনেক নিচে খুব মৃদু শোনা গেল নাকারার আওয়াজ। ফৌজের কুচকাওয়াজ আরম্ভ হয়েছে। কাল সকালেই রওনা হবে গুজরাট ও মালবের সম্মিলিত বাহিনীর মোকাবিলা করার জন্যে।

ওদের নাম যদি জানাই আছে তো ওদের কয়েদ করে রাখা যায় না?—জিজ্ঞেস করলো ঝালী রানী।

বলো,—রাণা সাঙ্গা বললো মীরার দিকে তাকিয়ে।

মীরা শান্তভাবে বললো,—চিতোরগড়ের ভিতরে গৃহযুদ্ধ বেধে যাবে। হয়তো মারওয়াড়ের রাজার সঙ্গেও যুদ্ধ বেধে যেতে পারে। তাতে গুজরাট আর মালবেরই সুবিধে।

সন্দেহের ভ্রূকুটি দেখা দিলো ঝালী রানীর কপালে। জিজ্ঞেস করলো,—কুমার মালদেব? ধনবাঈয়ের ছোটো ভাই?

মীরা মাথা নাড়লো খুব আস্তে। মৃদু হাসি দেখা দিলো রাণা সাঙ্গার মুখের উপর। কুমার মালদেবের খুব কম বয়েস। কিন্তু এই বয়েসেই এমন ধূর্ত, যার জুড়ি পাওয়া যায় না বড়োদের মধ্যেও।

আর কে ?—জিজ্ঞেস করলো ঝালী রানী।

তুমি বলো,—বললো রাণা সাঙ্গা।

বনবীর ?—ঝালী রানী বললো।

এবার একটু হাসলো মীরাবাঈ। আর মাথা নাড়লো রাণা সাঙ্গা। বললো, জারজ পুত্র তো। তার উচ্চাভিলাষের শেষ নেই।

মীরা বললো,—সে জন্যেই বলছিলাম, কুমার রতনসিংহকেও সঙ্গে নিয়ে যান। তা নইলে আপনার অনুপস্থিতিতে এখানে গণ্ডগোল হতে পারে।

তোমার তাই ধারণা ?—জিজ্ঞেস করলো রাণা সাঙ্গা।

মীরা মাথা নাড়লো।

—কেন ?

মীরা খুব মৃদু গলায় বললো,—সে কথা বলার জন্যেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলাম।

—বলো।

—বনবীর আমার সঙ্গে এসে দেখা করেছিলো সেদিন।

হঠাৎ সামনে ঝুঁকে বসলো রাণা সাঙ্গা।

এমনি হঠাৎ এলো। খুব ঘটা করে প্রণাম করলো গিরধরজীকে। বেশ বুঝলাম, সেটা আমাকে দেখানোর জন্যে। তারপর ওই ঝরোকার ওখানে গিয়ে দাঁড়ালো, ওই ওখানটায়, যেখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় রানী কারমেতনবাঈয়ের মহলের ঝরোকা। সেখানে পান্না-ধাই দাঁড়িয়েছিলো উদয়কে কোলে নিয়ে। কি রকম একটা ক্রূরদৃষ্টিতে সেদিকে তাকালো। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে খুব নরম গলায় বললো,—আচ্ছা, বাই-সা, রাণাজী তো আপনাকে খুব ভালবাসেন।

আমি বললাম,—হ্যাঁ। ঠিক নিজের মেয়ের মতোই।

বনবীর বললো,—আপনার কথা শোনেন।

হ্যাঁ, তাও শোনেন বই কি,—আমি বললাম।

আপনার বাবা রতনসিংজী আর আপনার জ্যাঠা বীরমদেবজী, এঁরাও তো খুব মানেন আপনার কথা,—বললো বনবীর,—আপনার কিসে ভালো হবে, তা নিয়েও নিশ্চয়ই ভাবেন সব সময়।

তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম,—এ সব প্রশ্ন কেন ?

সে আমার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে চারদিকে তাকিয়ে নিজের মনে বললো,—আপনি ভালোই আছেন বাঈ-সা'। রাওলার কোনো ঝুটঝামেলার মধ্যে নেই। গিরধরজীর সেবা আর পূজো নিয়েই আছেন। আপনার গানগুলিও বেশ চমৎকার। বেশ ভালো লাগে শুনতে। ওসব গান শুনলে মনে হয়, সত্যি আমরা অন্যান্য সবাই কতো তুচ্ছ সাধারণ মানুষ। সেদিন কি যেন গাইছিলেন ? আমি নিচে দিয়ে যেতে যেতে দাঁড়িয়ে পড়ে শুনেছিলাম কিছুক্ষণ।

এই বলে বনবীর নিজের মনেই গুনগুন করে একটু গাইলো,—মীরা রে প্রভু থেঁ মিলিয়া বিন, প্রাণ ধরত না ধীর।

তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে বললো,—হয়তো আমরা সবাই আপনাকে শ্রদ্ধা করবো। মস্তো বড়ো মন্দির গড়ে দেবো গিরধরজীর জন্যে। মাঝে মাঝে এসে আপনার পায়ের কাছে বসে ভজন শুনবো, কেঁদে ভাসিয়ে দেবো ভক্তিতে আপ্লুত হয়ে, চারদিকে সবাইকে জানাবো, আপনি মহান সাধিকা। কিংবা—

এই পর্যন্ত বলে বনবীর আবার ফিরে গেল ঝরোকার কাছে। ওদিকের মহলের ঝরোকায় তখনো পান্না দাঁড়িয়ে আছে কুমার উদয়কে কোলে নিয়ে। উদয় তখন কাঁদছে। ধাত্রী পান্না তাকে ভোলানোর জন্যে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে আকাশের পাখি।

সেদিকে তাকিয়ে বাঁকা হাসি হেসে বনবীর খুব নরম গলায় বললো,—কিংবা হয়তো আমরা আপনার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হয়ে যাবো। হয়তো পরবর্তী কোনো মহারাণার পছন্দ হবে না যে, আপনি রাওলার রীতি লংঘন করে সব সময় কৃষ্ণশ্যামের মন্দিরে গিয়ে সাধারণ লোকেদের সঙ্গে মেলামেশা করেন। হয়তো আপনাকে একেবারে আটক করে রেখে দেওয়া হবে মহলের ভিতর। কিংবা হয়তো আপনাকে চলে যেতে হবে চিতোরগড় ছেড়ে। কোথায় যাবেন জানি না, কারণ হয়তো সে সময় রতনসিংজী কি বীরমদেবজী কেউ আর বেঁচে নেই। কিন্তু তা' নিয়ে আমরা মাথা ঘামাবো না, ফিরেও তাকাবো না।

তারপর হঠাৎ আবার আমার দিকে ফিরলো। বললো,—আমি জানি না কি হবে। আপনি জানেন। কারণ, আপনি যা চান, তাই হবে।

আমি বললাম,—মনে হচ্ছে, আপনি শাসিয়ে গেলেন।

বনবীর উত্তর দিলো,—না, না, সে কি কথা। আপনি আমাদের ভাবীজী,

আমাদের গুরুজন। শুধু মনটা একটু উদাস হয়ে গেল, ভবিষ্যতের চেহারাটা একটু অনুমান করে নেওয়ার চেষ্টা করলাম।

আমি বললাম,—একটা গান শুনবেন? শুধু এক পংক্তি।

—আপনার উত্তর?

আমি বললাম,—হ্যাঁ।

—বেশ, তাই শুনি।

আমি আস্তে আস্তে গাইলাম,—ম্হারা রী গিরধর গোপাল, দুসরো ন কোঈ……।

বনবীর প্রথমটা গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর হঠাৎ খুব জোরে হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বেরিয়ে গেল আমার মহল থেকে।

রাণা সাঙ্গা আর ঝালী রানী গম্ভীর মুখে শুনছিলো মীরার কথা। মীরা থামতে রাণা বললো,—তাহলে মনে হচ্ছে ষড়যন্ত্র বহুদূর গড়িয়েছে।

হ্যাঁ, কিছু একটা উদ্দেশ্য আছে ওদের,—বললো মীরা,—তাই বলছিলাম, আপনি কুমার রতনসিংহকেও সঙ্গে নিয়ে যান।

ঝালী রানী বললো,—বনবীর বড়ো ভয়ঙ্কর লোক। ওকে তো চিনি।

রাণা সাঙ্গা মাথা নাড়লো। বললো,—আমি ওদের চিনি। কিন্তু ওরা আমাকে চেনে না। যাই হোক, এখনই ওরা কিছু করতে সাহস করবে বলে আমার মনে হয় না। আমি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসি। তারপর দেখা যাবে।

মীরা বললো,—আমি কিন্তু ভালো বুঝছি না। আপনি থাকবেন যুদ্ধক্ষেত্রে। এখানে থাকবেন রানী ধনবাঈ, কুমার রতনসিংহ, কুমার মালদেব আর বনবীর। আপনার অনুপস্থিতিতে কিছু একটা গণ্ডগোল না হয়।

কি হবে?—রাণা সাঙ্গা গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো মীরার দিকে তাকিয়ে।

মীরা চোখ নামালো না। শান্তভাবে বললো,—আপনাদের সিংহাসন। আপনারাই বুঝবেন। আমি আর কিছু বলতে চাই না।

হেসে ফেললো রাণা সাঙ্গা। বললো,—না মীরাবাঈ, তুমি অকারণ বিচলিত হয়েছো। আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, তদ্দিন যা'র মনে যাই থাক, কোনো রকম গণ্ডগোল করার সাহস কারো হবে না।

মীরা কোনো উত্তর দিলো না।

রাণা সাঙ্গা বললো,—আমি শিগ্‌গিরই ফিরে আসবো। এরা ভেবেছে, আমার একটি হাত নেই, একটি চোখ নেই, আমার ছেলে ভোজরাজ আর নেই, তাই আমার আর মনের জোরও নেই। গুজরাট ও মালবের সম্মিলিত

বাহিনীর সামনে আমি দাঁড়াতে পারবো না। আমি হেরে যাবো, আমি হটে আসবো। তখন এরা বলবে, রাণা সাঙ্গা অক্ষম হয়ে পড়েছেন, তিনি এবার গদী ছেড়ে দিন। তখন আমার পক্ষে আর কেউ থাকবে না। ওরা ওদের পছন্দ মতো রতনসিংহকে গদীতে বসাবে। না, না মীরাবাঈ, তা হবে না। আমি খুব তাড়াতাড়িই ফিরবো এবং মালব ও গুজরাটকে যুদ্ধে বেশ ভালোরকম ভাবেই হারিয়ে তবে ফিরবো। তারপর একবার দেখে নেবো এদের সবাইকে।

মীরা আস্তে আস্তে বললো,—আমায় একটি জিনিস দিয়ে যাবেন?

কি?

—একটি কবুতর।

—কবুতর?

—হ্যাঁ, আপনার তো খুব শিক্ষিত কবুতর আছে অনেকগুলো। একটি দুটি আমায় দিয়ে যান।

—কেন?

—যদি হঠাৎ খুব প্রয়োজন হয়……

মীরা কথা শেষ করার আগেই হেসে উঠলো রাণা সাঙ্গা,—আমায় খবর দেবে? না মীরা, সেটা ঠিক হবে না। ওরা জেনে যাবে যে দুটি কবুতর আমি তোমায় দিয়ে গেছি আমাকে খবর দেওয়ার জন্যে। অনর্থক ওদের খারাপ নজরে পড়বে তুমি। ভেবো না, আমি সব খবরই যথাসময়ে পাবো। মেবারের রাণাকে চারদিকে চোখ রেখে চলতে হয় মীরাবাঈ।

কিছুক্ষণ পরে চলে গেল রাণা সাঙ্গা আর ওর মা, রানী ঝালী।

মীরা একা বসে রইলো ঘরের ভিতর।

মনে কোন উদ্‌বেগ নেই, কোনো দুর্ভাবনা নেই। শুধু একটা ফিকে বিষণ্ণতা। সবার সঙ্গে সবার ঝগড়া, সবার বিদ্বেষ, রেষারেষি, শত্রুতা। এসব আর কদ্দিন প্রভুজী, আর কদ্দিন। যুগ যুগ তো এভাবেই কেটে গেল। কোনো দিন কি এসবের শেষ হবে না?

আস্তে আস্তে তানপুরোটা তুলে নিলো মীরাবাঈ। মন যখন এমনি বিষণ্ণ হয়ে ওঠে, তখনই স্বর গুনগুনিয়ে ওঠে মনের ভিতর। একটু একটু করে তৈরী হয়ে গেল গানের প্রথম কলি।

শ্যানে কোঁ্যা তরসাও,—আমাকে কেন ভয় দেখাচ্ছো শ্যামকিশোর।
—থাঁরে কারণ কুল জগ ছাঁড়িয়া,—কুল আর জাত ছেড়েছি তোমারই জন্যে।
—অব থেঁ কোঁ্যা বিসরাও,—এখন তুমি কেন ভুলে গেছ আমাকে।

ঝ্মানে কোঁ্যা তরসাও,—নিজের মনে গেয়ে গেল মীরাবাঈ। প্রথমে খুব আস্তে, তারপর ক্রমশ গলা ছেড়ে।

মীরা জনম জনম রী দাসী, ভগতাঁ পেজ নিভাওয়াঁ।—

গানটা শেষ হতে মনে হোলো গলার উপরে যেন কিসের ভার। কেউ যেন গলা জড়িয়ে ধরে বসে আছে। চোখ খুলে ফিরে তাকিয়ে মীরার মুখ হাসিতে ভরে গেল।

তার গলা জড়িয়ে পিঠের উপর মুখ রেখে গান শুনছে তিন-চার বছরের একটি ফুটফুটে মেয়ে। ভারি মিষ্টি তার মুখ।

তুমি কখন এলে উদাবাঈ,—মীরা জিজ্ঞেস করলো।

—একটু আগে। মাও এসেছেন।

অন্যদিকে তাকিয়ে দেখলো মীরা। ঘরের একপাশে বসে আছে ছোটো রানী কারমেতনবাঈ হাডা। তার সামনে পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চা রাজকুমার বিক্রমজিত। পাশে ধাত্রী পান্নার কোলে তিন-চার মাসের শিশু রাজকুমার উদয়সিংহ।

মীরা আর কারমেতন দু'জনেই সমবয়েসী। তাই মীরা আর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো না তার সৎ-শাশুড়ীকে। কাছে এসে হাসিমুখে দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বললো,—কখন এলেন ?

রাওলায় মীরাবাঈয়ের মর্যাদা ছোটো রানীর চাইতে কম নয়। তার স্বামী ছিলো যুবরাজ, নিয়তির বিধান অন্য রকম হলে ভবিষ্যতে একদিন সেই হোতো মেবারের মহারানী। তাই কারমেতনবাঈও উঠে দাঁড়িয়ে দু-হাত জুড়ে অভিবাদন জানালো মীরাবাঈকে।

মীরাকে প্রণাম করলো বিক্রমজিত। মীরা সামনে ঝুঁকে তাকে জড়িয়ে ধরে তার কপালে চুমু খেলো। তারপর ধাত্রী পান্নার হাত থেকে শিশু উদয়কে নিজের কোলে তুলে নিয়ে তাকে একটু আদর করলো, তার পায়ে গলায় আঙুল দিয়ে সুড়সুড়ি দিয়ে তাকে হাসাবার চেষ্টা করলো।

তারপর বললো,—আজ সন্ধ্যায় আমি নিজেই যেতাম আপনার কাছে। রাণাজীর কাছে শুনলাম যে আপনিও যাচ্ছেন ওঁর সঙ্গে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো কারমেতনবাঈ। তারপর মীরার গলা জড়িয়ে ধরে বললো,—বাই-সা', এবার কিন্তু আমার ভয় করছে।

কেন ?—স্নিগ্ধ হাসি হেসে মীরাবাঈ জিজ্ঞেস করলো।

জানি না। সকাল থেকেই মনে পড়ছিলো আপনার কথা। তাই চলে

এলাম। ভাবলাম, যাওয়ার আগে একবার গিরধরজীকে প্রণাম করে যাই।

রাণাজীর কাছে কাছে থাকবেন, এত ভাবনা কিসের ?

উদয়কে আর উদাবাঈকে রেখে যাচ্ছি পান্নার কাছে। ওদের জন্যেই একটু মন খারাপ হচ্ছে। আপনি ওদের একটু খোঁজ-খবর নেবেন।

হ্যাঁ, উদাবাঈ তো আমার কাছে আসবে সব সময়। ও তো আমায় খুব ভালোবাসে।

কারমেতনবাঈ সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকালো, তারপর বললো,— আচ্ছা, একটা কথা আপনি শুনেছেন ? রাইসিনের রাও সিলহাডী আর আরো অনেকে নাকি বলছেন রাণাজী এখন অক্ষম হয়ে গেছেন, ওঁর গদী ছেড়ে দেওয়া উচিত ?

রাণাজী নিজে কি বলছেন ?—মীরাবাঈ হেসে জিজ্ঞেস করলো।

একথা শুনে একটু হাসি ফুটলো রানী কারমেতনবাঈয়ের মুখে। তারপর বললো,—সত্যি, এই এক বছরের মধ্যে জীবনটা কতো তাড়াতাড়ি বদলে গেল।

॥ এগারো ॥

সে বছরটা ছিলো পনের শো বাইশ খ্রীষ্টাব্দ।

মালবের সুলতান মাহমুদ ও গুজরাটের সুলতান মুজফ্‌ফর শাহ'র সম্মিলিত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যে চিতোরগড় ছেড়ে দক্ষিণদিকে রওনা হোলো রাণা সাঙ্গা। সঙ্গে গেল ছোটোরানী কারমেতনবাঈ আর ওর বড়ো ছেলে বিক্রমজিত। চিতোরে থেকে গেল বড়োরানী কুঁয়রবাঈ, মেজোরানী ধনবাঈ আর ওর ছেলে রতনসিংহ। চিতোরগড় দেখাশোনা করার জন্যে থেকে গেল বণবীর সিং। রানী কারমতেনবাঈয়ের ছোটো মেয়ে উদাবাঈ আর শিশুপুত্র উদয়কে রেখে যাওয়া হোলো ধাত্রী পান্নার কাছে।

বছরের পর বছর যুদ্ধ লেগে আছে একটা না একটা। রাণা আর দরবারের অন্যান্য সর্দারেরা এবং চিতোরের অনেক যুবাপুরুষই প্রায় থাকে না। যুদ্ধে যায়, ফিরে আসে, আবার যুদ্ধে যায়। চিতোরগড়ের দৈনন্দিন জীবনের কোনো পরিবর্তন হয় না।

চিতোরের জীবনধারাটাই এরকম। প্রথম চারদিন বিমর্ষ হয়ে থাকে

প্রোষিতভর্তৃকা যুবতীরা। তারপর আবার যে যার দৈনন্দিন কাজে মন দেয়। সকালে উঠে দুর্গের নিচের দিকে নেমে সুরজ কুণ্ডে স্নান করে। মন্দিরে পুজো দেয়। তারপর মহলের আঙিনায় বসে জটলা করে।

প্রত্যেকদিন একবার করে খবর আসে রাণাজীর শিবির থেকে। রাওলার ভেতরে খবর নিয়ে আসে কোনো একজন। তাকে ঘিরে বসে সবাই খবর শোনে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর ঘুম। বিকেলে স্নান আর প্রসাধন। সন্ধ্যায় মহলের ভিতর গীত শোনে মিসরানীদের মুখে। সেই চিরন্তন বিরহিণীর গীত,—নায়ক গেছে যুদ্ধে, নায়িকা মহলের জানলায় একা। সামনে শুধু আকাশ। কি করে নায়ক পাবে নায়িকার খবর। সে জন্যে আছে কুর্জা নামে এক জাতের ছোটো কালো পাখি। রাজপুতানার বিরহিণীরা চিরকাল তাকে উদ্দেশ করেই গান তৈরী করে এসেছে, গাঁয়ের মেয়ে, মহলের মেয়ে, সবাই। ওগো কুর্জা পাখি, আমার খবর নিয়ে যাও প্রিয়তমের কাছে। যখন আকাশে মেঘ করে, ওর কথা আমার মনে পড়ে। কুয়োর ধারে জল তুলতে গিয়ে আনমনা হয়ে বসে থাকি। শাশুড়ী গঞ্জনা দেয়, ননদ পেছনে লাগে। ভাই কুর্জা পাখি, ওকে গিয়ে বলো, তাড়াতাড়ি চলে আসতে। না কি, সেখানেই একটি নতুন বিদেশী বৌ বিয়ে করে নিয়েছে? তাও দেখে এসো, আমাকে এসে বলে যেতে সংকোচ কোরো না। ও যদি সুখে থাকে, আমার মনে কোনো দুঃখ থাকবে না।

এক একদিন রাতে চাঁদ ওঠে। রাওলার ছাদে এসে জড়ো হয় মহলের সব রাজপুতানী। সব দুঃখ ভুলে যায়, গানের তালে তালে শুরু হয় ঘুমড় নাচ। পরনের ঘাগরা চারদিকে গোল হয়ে ঘুরন্ত চাকতির মতো হয়ে যায়, চুড়িদার পায়জামা ঢাকা সুঠাম পা'গুলো অতি দ্রুত লয়ের ছন্দে ছন্দে উদ্দাম হয়ে ওঠে। ঘামে ভিজে লেপ্টে যায় বুকের বাঁধনী, নেশার ঘোর লাগে চটুল চোখে।

কোনো কোনোদিন আসে ভিনগাঁয়ের চারণী। তার মুখে শোনে আগের দিনের কোনো গৌরব গাঁথা। কুমার চুণ্ডার মহান আত্মত্যাগের কথা, বাপ্পা রাও বীর হাম্বীর এদের বীরত্বের ইতিকথা, প্রায় পঞ্চাশ ষাটবছর আগেকার রাণা কুম্ভের শৌর্যকাহিনী। মেয়েদের বিশেষ করে শুনতে ইচ্ছে করে গুজরাটের সুলতানের সঙ্গে রাণা কুম্ভের যুদ্ধের বিবরণ, যিনি সুলতান বাহাদুর শাহকে হারিয়ে চিতোরে নির্মাণ করিয়েছিলেন বিরাট উঁচু বিজয়স্তম্ভ। চারণীর গান শুনতে শুনতে সেই স্তম্ভের দিকে তাকিয়ে দেখে রাওলার রাজপুতানীরা।

তারপর এক সময় চিতোরগড়ে নেমে আসে রাত্রির অন্ধকার। আস্তে

আস্তে একটি একটি করে নিবে যায় বিভিন্ন মহলের প্রদীপ। দুর্গপ্রাকারে শোনা যায় প্রহরীর ভারী পায়ের আওয়াজ।

কখনো বা বনবীরের মহল থেকে শোনা যায় ঘুঙুরের আওয়াজ, হালকা চটুল গানের কলি। চিতোরের রাজপুত প্রায় সবাই গেছে যুদ্ধে, কিন্তু তা নিয়ে বনবীরের কোনো মাথাব্যথা নেই। তার মহলে ফুর্তি চলছে সব সময়। রাত্রিবেলা বসে নাচ গান আর মদের আসর। সেখানে যোগ দেয় কুমার রতনসিংহ, কুমার মালদেব।

সে সময় হয়তো মীরার পূজো হয়ে গেছে। সে একা এসে দাঁড়িয়েছে ঝরোকার ধারে। স্তব্ধ হয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আছে। অনেক নিচে দুর্গের প্রশস্ত আঙিনায় মশাল জ্বলছে। বহুদূর থেকে অস্পষ্ট শব্দ। রাত জেগে জাঁতায় গম ভাঙছে কোনো সাধারণ ঘরের রাজপুতানী।

দূরে বনবীরের মহল। সেখানে নাচ গান হাসি—।

মীরা তাকিয়ে দেখে শান্ত দৃষ্টিতে। মনে একটা অস্বস্তি। এই যে স্তব্ধতা, এই যে শান্ত পরিবেশ, এ যেন বড্ড অস্বাভাবিক। এ শুধু উপরের একটা ঠুনকো খোলস। কখন হঠাৎ ভেঙে যাবে, ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে একটা ক্রূর বীভৎস আকৃতি। তার নিশ্বাসে বিষ। সে এসে সৃষ্টি করবে একটা প্রকাণ্ড বিভীষিকা। তার আগে একটা ষড়যন্ত্রের থমথমে ভাব।

সেটা মীরা অনুভব করতে পারে।

অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে মীরা তাকিয়ে দেখে। সেদিকে কারমেতনবাঈয়ের মহল। সেই মহল অন্ধকার। ওখানে লোকজন বেশী নেই। শুধু বাচ্চা মেয়ে রাজকুমারী উদাবাঈ আর শিশু রাজকুমার উদয়কে নিয়ে থাকে ধাত্রী পান্না। আর থাকে ধাত্রী পান্নার নিজের ছেলেটি, সে আর উদয় একই বয়েসী। মাঝে মাঝে শোনা যায় ক্ষীণ কান্নার আওয়াজ। ঘুম ভেঙে গেছে কুমার উদয়ের। কিংবা হয়তো পান্নার নিজের ছেলেটির। ঘুম পাড়ানোর চেষ্টা করছে পান্নাবাঈ। তার ঘুমপাড়ানী গানের একটা দুটো কলি অস্পষ্ট ভেসে আসে।

এমনি করে দিনের পর দিন।

মীরার অস্বস্তি লাগছে। আগে কোনোদিন এরকম হয়নি। কতোবার যুদ্ধে গেছে রাণা সাঙ্গা। সঙ্গে গেছে কুমার ভোজরাজ। চিতোরগড়ে পুরুষ মানুষ খুব বেশী নেই। শুধু দুর্গ পাহারা দেওয়ার জন্যে একদল সৈন্য আর তাদের দায়িত্ব নিয়ে দু'চারজন রাজপুত সর্দার। মহলে শুধু রাজপুতানীরা।

কিন্তু সবাই নিশ্চিন্ত। কারো মনে দুর্ভাবনা নেই। যুদ্ধে যারা গেছে তারা ফিরে আসবে বিজয়ী হয়ে, এটুকু বিশ্বাস সবারই মনে আছে। হয়তো দু চারজন আর ফিরবে না। কিন্তু এও জীবনের একটা ধারা। তাদের জন্যে হয়তো কয়েকজনের মনে কষ্ট হবে। কিন্তু কারো কোনো অভিযোগ থাকবে না। সুতরাং দিন কেটে যাবে। রাত কেটে যাবে। সকালে সুরজ কুণ্ডে স্নান, একলিঙ্গজীর মন্দিরে পূজো, কুম্ভশ্যামের মন্দিরে পূজো, কালীজীর মন্দিরে পূজো, সবই চলতে থাকবে।

রাওলায় রাজপুতানীদের নানা রকম জোট। কখনো পরচর্চা, কখনো যুদ্ধক্ষেত্রের খবর। কখনো বা তরুণীদের নাচ আর গান, কখনো বা চারণীদের মুখে অতীতের গৌরব গাঁথা। আবার রাত, নিস্তব্ধ রাত, ঘুম, স্বপ্ন। কিংবা রাত জেগে জেগে প্রিয়তমকে শুধু মনে পড়া। শেষ রাতে জাঁতার শব্দ, ঘোড়ার ডাক, দুর্গের ভারী দরজার পাশে ছোটো লোহার দরজাটি খুলে দেওয়ার শব্দ, বাইরে থেকে শাকসব্জী দুধ এসব নিয়ে গাঁয়ের লোক যারা আসে, তাদের পায়ের সাড়া। চিতোরগড়ের রাওলার জীবন মন্থর, শান্ত, স্নিগ্ধ।

সে সময় মীরাও নিশ্চিন্ত। গিরধরজীর সেবা, পূজো অর্চনাও চলতো নিয়মিত। মাঝে মাঝে দু চারজনকে ডেকে ভজন গান। কখনো বা কুম্ভশ্যামের মন্দিরে গিয়ে কোনো অতিথি সাধু সন্ত পরিব্রাজকের কাছে ভাগবত শোনা। সঙ্গে থাকতো রাজমাতা ঝালী। এক একদিন অন্য রানীরাও।

এবার কিন্তু অন্যরকম। সাধু সন্ত পরিব্রাজক অতিথি কাউকে আসতে দেখা যাচ্ছে না। ওদের নাকি ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না চিতোরগড়ে। বাইরের কোনো লোক আসতে পারছে না। চিতোরগড় থেকেও কেউ বাইরে যেতে পারছে না বনবীর কিংবা মালদেবের হুকুম না নিয়ে।

কেন ?—প্রথম প্রথম জিজ্ঞেস করছিলো সবাই। হঠাৎ একদিন দেখা গেল সবার মুখ বন্ধ। সবার মুখে একটা ছায়া পড়েছে। সবার চোখে একটা ভয়।

কেন ?—মীরা জিজ্ঞেস করেছিলো ঝালী রানীকে।

ঠিক বুঝতে পারছি না,—ঝালীরানী বললো। খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিলো তাকে।—আমার খুব ভালো লাগছে না এখানকার অবস্থা। কিছু একটা গণ্ডগোল পাকিয়ে উঠছে বলে মনে হচ্ছে।

বনবীরকে খবর পাঠিয়েছিলো মীরা। একবার যেন তার মহলে আসে। মীরা সামান্যরকম সাধুসেবা করে নিয়মিত, দানধ্যান করে ভোজরাজের নামে, সুতরাং দু'চারজনকে যেন আসতে দেওয়া হয়।

বনবীর এলো না। খবর পাঠালো, সাধুসেবা এখন বন্ধ থাকুক কিছুদিনের মতো। সময় ভালো নয়। সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশে শত্রুপক্ষের কিছু চর নাকি দুর্গে ঢুকবার মতলব করছে বলে সন্দেহ করার কারণ ঘটেছে।

সে কথা মীরার বিশ্বাস হচ্ছে না। ঝালীরানীরও বিশ্বাস হোলো না। নিশ্চয়ই বনবীরের কোনো মতলব আছে। সে চিতোরগড়কে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চায় বাইরের দুনিয়া থেকে। মীরা ঝালীরানীকে বললো, রাওলার অবস্থা জানিয়ে রাণাজীর কাছে চিঠি লিখতে।

কোনো লাভ নেই,—বললো ঝালীরানী,—সে চিঠি রাণাজীর কাছে পৌছোবে না। দুর্গের বাইরে যাবার অনুমতি যারা পায় তাদের ভালো করে খানাতল্লাশ করা হয় দুর্গের ফটকের কাছে। দুর্গের যা কিছু খবর রাণা সাঙ্গার শিবিরে যায়, সবই বনবীরের নিজের হাতে লেখা খবর। বাইরের খবর যা আসে তাও বনবীরের মারফতেই।

মীরা একবার ভেবেছিলো,—আমার কিসের ভাবনা, আমি আর আমার গিরধরজী, ব্যস। আর কিছু নিয়ে আমার তো বিচলিত হওয়ার দরকার নেই। অন্য সবার কি হবে না হবে, সে তো আমার দেখবার প্রয়োজন নেই।

কিন্তু পূজোয় বসলে মন বসে না। গান গাইতে বসলে মন বিচলিত হয়ে ওঠে। অন্তরের ভিতর থেকে কে যেন বলে, চারদিকের জীবন সম্বন্ধে নিস্পৃহ হয়ে থাকবার জন্যে তো সাধনা নয়।

মীরা নিজের মহল থেকে বেরোয় না বড় একটা। কিন্তু এবার আর থাকতে পারলো না। একদিন প্রণাম করতে গেল বড় রানী কুঁয়রবাঈকে।

ভোজরাজের মৃত্যুর পর সেই যে শয্যা নিয়েছে কুঁয়রবাঈ, আর বেরোয় না নিজের মহল থেকে। মীরার উপর একটুও প্রসন্ন নয়। তার ধারণা মীরার সঙ্গে তার ছেলের বিয়ে সুখের হয় নি। মীরাই দুর্ভাগ্য নিয়ে এসেছিলো তার জীবনে। কিন্তু এতোদিন পরে মীরাকে নিজের মহলে দেখে চোখের জল থামাতে পারলো না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেললো মীরাকে জড়িয়ে ধরে।

মীরা গিরধরজীর প্রসাদী ফল ও মিষ্টি নিয়ে এসেছিলো শাশুড়ীর জন্যে, কাছে বসিয়ে খাওয়ালো। তারপর কথায় কথায় বললো নিজের আসার কারণ।

নানা রকম কথা শোনা যাচ্ছে রাওলার রাজপুতানীদের মুখে। গুজরাট আর মালবের সুলতানের সঙ্গে নাকি আগে থেকেই যোগাযোগ করেছিলো বনবীর। তারই কাছ থেকে কতকগুলো খবর পেয়ে মেবার আক্রমণ করার সাহস ওদের হয়েছে।

কিন্তু কি খবর ? সে কথাই কেউ বলতে পারছে না।

তবে আমরা কিছু অনুমান করতে পারি,—মীরা বললো,—রাণাজীর পর কে বসবেন সিংহাসনে, রতনসিংহ না বিক্রমজিত, তাই নিয়ে মতভেদ হয়েছে সর্দারদের মধ্যে। চিতোর-দরবার দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে। একটা বড়ো দল মেজো রানী ধনবাঈয়ের ছেলে কুমার রতনসিংহের পক্ষে, এবং তারা সব রকম সহায়তা পাচ্ছে মারওয়াড় দরবার থেকে। আরেক দল রানী কারমেতনবাঈয়ের ছেলে কুমার বিক্রমজিতের পক্ষে। বুঁদী এবং অন্যান্য রাজ্য আছে তাদের পেছনে। এ দুটো দলের ঝগড়া শুধু মেবারকে দুর্বল করে দিয়েছে তা নয়, রাজপুতানার অন্যান্য রাজ্যকেও দু পক্ষে ভাগ করে দিয়ে নষ্ট করে দিয়েছে রাজপুতদের সংহতি।

আমার তাতে কি ?—কুঁয়রবাঈ নিস্পৃহভাবে বললো।

এতে আমাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে,—উত্তর দিলো মীরা।—আমি রাণাজীর কাছেই শুনেছি, গুজরাট ও মালব যোগাযোগ করেছে কাবুলের সুলতান বাবরের সঙ্গে। রাণাজী বাবরকে হিন্দুস্তানে আসার জন্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সুলতান ইব্রাহিম লোদীকে দুর্বল করে দেওয়ার পরিকল্পনা করে। কিন্তু বাবর শাহ রাণাজীকে বিশ্বাস করেন না। তাই তিনি চান রাণাজী গুজরাট আর মালবের সঙ্গে যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকুন। বনবীরের সঙ্গে বাবর শাহর একটা গোপন যোগসাজশ আছে, তেমন একটা খবর পেয়েছেন রাণাজী। কিন্তু মারওয়াড় দরবার বনবীরের পেছনে আছে বলে তিনি এখনই কিছু বলতে চান না, কারণ তাহলে মারওয়াড়ের সঙ্গে খোলাখুলি শত্রুতা দেখা দেবে, এবং তাতে বাবর শাহ্‌রও সুবিধে, গুজরাট ও মালবের সুলতানদেরও সুবিধে।

কুঁয়রবাঈ কোনো আগ্রহ প্রকাশ করলো না এ সব খবরে। বললো,—কে রাণা হবে, কে পাবে চিতোরের গদি, এ-ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ নেই।—বলতে বলতে কুঁয়রবাঈয়ের গলা ধরে এলো,—আমার ভোজরাজ নেই। আমার জন্যে দুনিয়াও নেই।

বলতে বলতে কেঁদে ফেললো কুঁয়রবাঈ।

মীরার চোখে জল নেই। মীরা স্তব্ধ, শান্ত।

কী নিষ্ঠুর এই মেয়েটির মন,—কুঁয়রবাঈ ভাবলো,—কোনো দিন এক ফোঁটা জল দেখলাম না ওর চোখে। ছেলে আমার। কিন্তু ওরই তো স্বামী।

মীরা কোনো উত্তর দিচ্ছিলো না। চুপচাপ তাকিয়ে ছিলো কুঁয়রবাঈয়ের দিকে।

কুঁয়রবাঈ ভাবলো,—মীরারই বা এত আগ্রহ কেন সিংহাসনে কে বসবে তা নিয়ে? সেদিন কে যেন বলছিলো, কারমেতনবাঈয়ের ছেলে উদয়কে ও খুব ভালোবাসে, প্রায়ই ডাকিয়ে নেয় নিজের মহলে, নিজের কাছেই রাখে অনেক সময়। ওকে কি পুষ্যি নিতে চায়? তারপর তাকেই কি বসাতে চায় সিংহাসনে? তাহলে তো মীরারই হাতে চলে যাবে সব ক্ষমতা। তারই কি ব্যবস্থা করছে গোপনে গোপনে?

কুঁয়রবাঈয়ের মনে পড়লো, যুদ্ধে রওনা হওয়ার আগে রাণা সাঙ্গা আর ঝালী রানী গিয়েছিলো মীরার মহলে। এটা রাওলার কায়দা নয়। রাণাজীর কাছেই যেতে হয় সবাইকে, রাণাজী রানীদের মহল ছাড়া আর কোথাও নিজে যান না। তা নিয়ে নানা রকম কানাঘুসো শোনা গিয়েছিলো মহলে। ওরা নাকি দরজা বন্ধ করে অনেকক্ষণ গোপনে নানা রকম কথা বলেছিলো। এবং তার কিছুক্ষণ পরে উদয়কে নিয়ে মীরার মহলে গিয়েছিলো কারমেতনবাঈ। এটাও রাওলার রেওয়াজ নয়। রানী অন্য কারো মহলে যায় না। অন্যরাই আসে রানীর মহলে।

ধনবাঈ নিজেই এসে বলেছিলো কুঁয়রবাঈকে। রতনসিংহের পক্ষ আর বিক্রমজিতের পক্ষ নিয়ে দরবারে দুটো দল হয়ে গেছে এটা রাণাজীর ভালো লাগছে না। কিন্তু এখনই এ-ব্যাপারের একটা সুরাহা করতে চান না। রাণাজী এদের যে কোনো একজনকে মেবারের টিকায়েত মনোনীত করলে অন্য দল হয়তো তলোয়ার ধরবে। সম্ভবত রাণাজী একথা ভাবছেন যে, মীরাবাঈ কারমেতনবাঈয়ের ছেলে উদয়কে দত্তক গ্রহণ করুক। তারপর উদয়কে টিকায়েত মনোনীত করা হবে। মৃত যুবরাজের বিধবা পত্নীর দত্তকপুত্র বলে কেউ হয়তো আর আপত্তি করার কারণ পাবে না। রতনসিংহের পক্ষের সর্দারদের মুখ বন্ধ হয়ে যাবে। মীরাবাঈ নিজে রাঠোর বলে জোধপুরের রাঠোরেরাও চুপ করে থাকবে। কারমেতনবাঈয়ের ছেলে বলে অন্য পক্ষও আপত্তি করবে না। স্বয়ং রাণা সাঙ্গার সন্তান বলে প্রজাসাধারণও খুশি হবে।

ধনবাঈকে বলেছিলো কুঁয়রবাঈ,—আমার কোনো আগ্রহ নেই। আমার কোনো স্বার্থ নেই। যা হবে হোক।

আজ মীরাকেও একই কথাই বললো।

মীরা তখন বললো,—মেবারের স্বাধীনতা ও নিরাপত্তার জন্যেই আমাদের ভাবনা। কারো ব্যক্তিগত স্বার্থের প্রশ্ন এখানে অবান্তর। স্বার্থ আপনার যে রকম নেই, আমারও নেই।

হঠাৎ একটু রুক্ষ হয়ে উঠলো কুঁয়রবাঈ। বললো,—তোমার স্বার্থ নেই? আমরা তো শুনছি তুমি উদয়কে দত্তক গ্রহণ করছো। রাণার চোখে বনবীরকে ছোটো করতে পারলে তো তোমারই লাভ। উদয় রাণা হলে আসল ক্ষমতা তো হবে তোমার এবং তোমার বাবা রতনসিংজী রাঠোর ও তোমার জ্যাঠা বীরমদেবজীর। তুমি কি আমার কাছে এজন্যেই এসেছো যে আমি বনবীরের নামে নালিশ করে চিঠি পাঠাবো রাণাজীর কাছে?

একথা শুনে একটুও আহত হোলো না মীরা। সে পরিষ্কার বুঝতে পারে মানুষের মন, পরিষ্কার বুঝতে পারে চারদিকের পরিস্থিতি। সে শান্তভাবে বললো,—চিতোরগড়ের খুব বিপদ। ঝালীরানীজী, আপনি এবং আমি এক হলে বনবীর এদেশের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। মহারাণাজী এখানে নেই। চিতোরগড়কে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। আমি গিরধরজীর সামান্য সেবিকা। কিন্তু প্রয়োজন হলে দেশের জন্যে রাজপুতানী তলোয়ার ধরতে পারে।

কুঁয়রবাঈ অবহেলার ভঙ্গীতে উত্তর দিলো,—দেশ তোমার নয়, রাজ্যও তোমার নয়। তোমায় কারো জন্যে তলোয়ার ধরতে হবে না। তুমি থাকো তোমার গিরধরজীকে নিয়ে। রাজ্য রক্ষা করার ক্ষমতা ও বুদ্ধি রাণাজীর আছে।

॥ বারো ॥

যা করবার তুমি আমি মিলেই করবো,—মীরা ভাবলো গিরধরজীর মূর্তির দিকে তাকিয়ে। একদিন তুমি বাঁশী ছেড়ে হাতে নিয়েছিলে সুদর্শন চক্র। আজ যদি প্রয়োজন হয় আমিও তলোয়ার ধরবো তানপুরো একপাশে রেখে দিয়ে। একদিন তুমি কুমার ভোজরাজ হয়ে আমার জীবনে এসেছিলে, আজ আবার এসো হৃদয়ে এক নতুন শক্তি হয়ে।

অন্ধকার রাত। প্রাসাদের কোথাও কোনো আলো নেই। শুধু অনেক নিচে প্রাঙ্গণে জ্বলছে কয়েকটি মশাল। কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত পাহারাদারদের পায়ের আওয়াজ শোনা যাচ্ছিলো দুর্গপ্রাকারে। তাও আর শোনা যাচ্ছে না। চারদিক একেবারে নিস্তব্ধ।

মীরা খবর পেয়েছিলো অপরাহ্নেই। ঝালীরানী এক বিশ্বস্ত দাসীকে পাঠিয়েছিলো মীরার কাছে। বলে পাঠিয়েছিলো,—বড়ো বিপদ, তুমি

তাড়াতাড়ি চলে এসো আমার মহলে। তারপর তোমাকে নিরাপদে দুর্গের বাইরে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করবো। খুব শক্ত কাজ, চারদিকে বনবীর আর মালদেবের লোকের সতর্ক পাহারা, কিন্তু দু'চার জন বিশ্বস্ত অনুচর আমাদেরও আছে। অন্তত তোমাকে বাঁচাতে পারবো।

মীরা চুপচাপ শুনলো। তারপর বলে পাঠালো, লোকটিকে তৈরী থাকতে বলবেন! গভীর রাত্তিরে যে কোনো সময় আমি আসতে পারি।

বনবীরের মহলে নাচগানের হুল্লোড় থেমে গেছে বেশ কিছুক্ষণ আগে। শুধু আলো জ্বলছে ঝরোকায়। তাকিয়ে দেখলো মীরা। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলো নিজের মহল থেকে।

চারদিকে সব দরজা ভেজানো। অন্যান্য সময় নারী রক্ষীরা তলোয়ার হাতে পাহারা দেয় মহলের ভিতর। আজ কাউকে কোথাও দেখা গেল না।

খবরটা আগেই পাঠিয়েছিলো ঝালীরানী। আজ অপরাহ্নে নারীরক্ষাদের কাছে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ওদের আর রাত্তিরে পাহারা দিতে হবে না। সবাই থাকবে নিজেদের রক্ষীনিবাসে।

তাই থেকে সন্দেহ হয়েছিলো ঝালীরানীর।

মহলের ভিতর পথগুলো অন্ধকার। বাঁকে বাঁকে দেওয়ালের গায়ে যে মশাল আটকানো থাকে, সেগুলো আজ নেই। অন্ধকারের ভিতর দিয়ে একা এগিয়ে চললো মীরা। বনবীরের মহলের কাছে এসে থমকে দাঁড়ালো। তাকিয়ে দেখলো ভেজানো দরজার ফাঁক দিয়ে।

ঘরের ভিতর শুধু কুমার মালদেব, কুমার রতনসিংহ আর বনবীর।

বনবীরের হাতে মদের পিয়ালা, তার চোখ দুটো লাল হয়ে আছে।

রতনসিংহ বসে আছে চুপচাপ। হঠাৎ তার শরীরটা একবার কেঁপে উঠলো। বললো—না, না, এতটা ঠিক হবে না।

এ ছাড়া আর উপায় নেই,—বললো মালদেব।

রতনসিংহ মাথা নাড়লো।—না, এ আমি পারবো না।

বনবীর এসে দাঁড়ালো তার সামনে। বললো,—তুমি রাজপুত। তোমার এত ভয়?

ভয়?—চট করে সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো রতনসিংহ।—তলোয়ার ধরতে আমি ভয় পাই না, কিন্তু পেছন থেকে ছুরি মারতে আমার গা গুলোয়।

কেন?—জিজ্ঞেস করলো বনবীর।

এ অন্যায়,—বললো রতনসিংহ।

অন্যায়?—একটু ব্যঙ্গ করলো বনবীর,—এসব ধারণা নিয়ে তুমি রাজত্ব করবে? তোমাকে আর বিক্রমজিতকে এড়িয়ে রাণা সাঙ্গা যে উদয়কে টিকায়েত মনোনীত করার মতলব এঁটেছেন, সেটা অন্যায় নয়?

আমি লড়াই করে আমার নিজের রাজত্ব ছিনিয়ে নেবো।

মহলের ভেতর বসে তড়পানো খুব সোজা,—বললো বনবীর,—কিন্তু তলোয়ার হাতে রাণা সাঙ্গার মোকাবিলা করা তোমার পক্ষে অসম্ভব।

বেশ, দেখা যাক।

সে সুযোগ তোমায় দিচ্ছে কে?

কি বলছো তুমি?

এতদিন ধরে সমস্ত পরিকল্পনা করে, সব কিছু ঠিকমতো ব্যবস্থা করে এনে, এখন তোমার একটা খামখেয়ালির জন্যে সব নষ্ট হবে? সে আমি হতে দেবো না।

আমি যদি রাজী না হই?

তুমি রাজী হওয়ার বা না হওয়ার কেউ নও। আমি যা স্থির করছি তাই হবে।

বেশ, আমি রাজী নই। আমি চললাম।

কোথায়?

আমার মহলে।

বেশ তো, যাও।

এক পা এগোলো রতনসিংহ। আর সঙ্গে সঙ্গে বনবীর তার তলোয়ার বার করে রতনসিংহের বুকের উপর ঠেকালো।

আমায় ভয় দেখাচ্ছো?

হ্যাঁ, দেখাচ্ছি।

এত সাহস? আমাকে তলোয়ার দেখাতে পারো?—তুমি?

আজ রাত্তিরে আমার কাছে কারো প্রাণের কোনো দাম নেই।

রতনসিংহ ফিরে তাকালো তার মামা মালদেবের দিকে।

তুমি কি চুপচাপ দাঁড়িয়ে দেখবে মালদেবজী?

মালদেব শুধু একটু হাসলো। তারপর উত্তর দিলো,—এসব ব্যবস্থা তো তোমারই জন্যে।

রতনসিংহ তাড়াতাড়ি নিজের তলোয়ারে হাত দিতে গেল। তার হাতটা আস্তে চেপে ধরলো মালদেব।

তুমিও ?—বললো রতনসিংহ।

উপায় নেই। আগেই বলেছি, সব তোমারই জন্যে।

আস্তে আস্তে আবার বসে পড়লো রতনসিংহ।

তাহলে আমরা আর দেরি করছি কেন ?—মালদেব বললো বনবীরের দিকে তাকিয়ে।

বনবীর আবার মদ ঢাললো হাতের পিয়ালায়। বললো,—অতো তাড়া কিসের ? দাঁড়াও, এটা শেষ করি আস্তে ধীরে।

মীরা সেখানে আর দাঁড়ালো না। সরে গেল অন্যদিকে। তারপর অন্ধকারে ছায়ায় ছায়ায় এগিয়ে গেল কারমেতনবাঈয়ের মহলের দিকে।

সেখানে চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে ছায়ার আড়ালে। ওরা এগিয়ে এলো। তাদের হাতে খোলা তলোয়ার।

কে ?

আমি,—উত্তর দিলো মীরা।

ওরা সসম্ভ্রমে পথ ছেড়ে দিলো।

তোমরা এখানে ?—মীরা জিজ্ঞেস করলো।

ঝালীরানী পাঠিয়েছেন।

কেন জানো ?

জানি।

ঠেকাতে পারবে বনবীরকে ? মহলের পাহারাদারেরা সব ওর লোক।

রাজপুতকে এ প্রশ্ন করছেন বাঈ-সা ?

মীরা আর কিছু বললো না। দরজার দিকে এগিয়ে গেল, আবার ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলো,—পান্নাবাঈকে কিছু জানানো হয়েছে ?

—না।

—কেন ?

—পান্নাবাঈ ভয় পেয়ে যাবেন। তাতে হয়তো আমাদের সব পরিকল্পনা পণ্ড হয়ে যাবে। ঝালীরানী বলেছেন, যা করবার আপনিই করবেন।

আমরা চলে যাবো অন্য দিকে। ততক্ষণ বনবীরকে ঠেকিয়ে রাখতে হবে।

ওরা নিঃশব্দে মাথা নাড়লো।

দরজায় আস্তে আস্তে টোকা দিলো মীরা।

কে ?—পান্নার গলা শোনা গেল ভেতর থেকে।

আমি। মীরাবাঈ।

পান্না দরজা খুলে দিলো।

আপনি?

মীরা ভেতরে এসে দরজা ভেজিয়ে দিলো। তাকিয়ে দেখলো ঘরের ভিতর। এক পাশে ঘুমিয়ে আছে শিশু রাজকুমার উদয়। অন্য পাশে ঘুমোচ্ছে উদাবাঈ। নিচে মেঝের উপর ঘুমিয়ে আছে পান্নার শিশুপুত্র।

একটি প্রদীপ মিটমিট করে জ্বলছে ঘরের ভিতর।

আপনি এত রাত্তিরে?—জিজ্ঞেস করলো ধাত্রী পান্না।

স্থির দৃষ্টিতে পান্নার দিকে তাকালো মীরা। তারপর বললো, উদয়কে নিয়ে এক্ষুনি চলে যাও চিতোরগড় থেকে।

পান্না রাজপুতানী। হঠাৎ ভয় পেলেও শান্তভাবে জিজ্ঞেস করলো,—কেন?

অতো কথা বুঝিয়ে বলার সময় নেই। উদয়ের খুব বিপদ।

কিন্তু কি করে বেরোবো?

কৃষ্ণশ্যামের মন্দিরের পেছনে আতাগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে সাঁওরমল নামে একটি লোক। সে তোমায় গোপনে বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। আমার নাম করবে তার কাছে গিয়ে।

তারপর?

দেওলার সিংহ রাও-এর কেল্লায় গিয়ে আশ্রয় নেবে। সব ব্যবস্থা করা আছে।

শুধু উদয়কে? উদাবাঈয়ের কি হবে?

ওকে আমি নিয়ে যাচ্ছি। এদিক থেকে বেরোনোর অন্য পথ আছে?

পান্না পাশের একটি দরজা দেখিয়ে দিলো।

মীরা ঘুমন্ত উদাবাঈকে কোলে তুলে নিলো। একবার তাকালো উদয়ের দিকে। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সেই পাশের দরজা দিয়ে।

বাইরে অন্ধকার। ঘুটঘুটে অন্ধকার। খুব আস্তে আস্তে সন্তর্পণে এগিয়ে গেল মীরাবাঈ। উদাবাঈয়ের চোখে তখন গভীর ঘুম। খানিকটা যেতেই পেয়ে গেল একটা সিঁড়ি। খুব উঁচু উঁচু পাথরের ধাপ। নিঃশব্দে উপরে উঠে গেল মীরাবাঈ। এসে পড়লো মহলের ছাতে, একবার তাকালো আকাশের দিকে। সেখানে অনেকগুলো তারা।

হাজার চোখ দিয়ে তুমি আমায় দেখছো,—মীরা মনে মনে বললো,—পারবো তো?

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারবে,—উত্তর দিলো মীরার মন।

মীরা এগিয়ে গেল। প্রশস্ত ছাদ পেরিয়ে পেয়ে গেল আরেকটি সিঁড়ি। সেখানেও ঘুটঘুটে অন্ধকার। ধাপগুলো উঁচু উঁচু। বড়ো বড়ো পাথরের টুকরো দিয়ে বানানো হয়েছে এসব সিঁড়ি। ঠাণ্ডা, একেবারে বরফের মতো ঠাণ্ডা।

পা টিপে টিপে মীরা নেমে এলো। অন্ধকার অঙ্গন পেরিয়ে এসে গেল নিজের মহলে। সেখানে নিজের বিছানায় খুব আস্তে শুইয়ে দিলো কারমেতন-বাঈয়ের তিনবছরের মেয়ে উদাবাঈকে।

তারপর আবার বেরিয়ে এলো ঘর থেকে। মনে হোলো যেন একটা শোরগোল শোনা যাচ্ছে। অনেক দূরে,—তারপর আস্তে আস্তে মহলের ভিতর।

মীরা এসে দাঁড়ালো নিজের মহলের বাইরে।

শোরগোল শুনে জেগে উঠেছে অনেকে। কয়েকজন চাকরানী এদিক ওদিক ছুটোছুটি করছে।

তাদের একজনকে থামালো মীরাবাঈ।

কি হয়েছে?

বুঝতে পারছি না। শুনছি বনবীর সিংহের লোকেরা কারমেতনবাঈয়ের লোকদের ধরে ধরে মেরে ফেলছে।

সে চলে গেল অন্য দিকে।

মীরা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো অন্ধকারের মধ্যে মিশে। শোরগোলটা ক্রমশ কারমেতনবাঈয়ের মহলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তলোয়ারের ঝনঝনা শোনা গেল।—আর আহতের আর্তনাদ।

কে একজন নিঃশব্দ ছায়ার মতো ছুটে যাচ্ছিলো মীরার মহলের দিকে।

মীরা তাকে ডাকলো। সে এসে দাঁড়ালো মীরার কাছে।

আপনি এখানে?

তার গলা শুনে মীরা চিনতে পারলো। একেই অপরাহ্নে পাঠিয়েছিলো ঝালীরানী।

হ্যাঁ,—উত্তর দিলো মীরা।

—আপনি পালালেন না?

—আমি পালাবো কেন?

—কিন্তু তাইতো ব্যবস্থা ছিলো।

—আমার জন্যে নয়।

সে আর কিছু বললো না। মীরা তাকে বললো,—তুমি একবার কুম্ভ-শ্যামের মন্দিরে যাও। খোঁজ নাও সাঁওরমলের। আমাকে এসে জানিয়ে যেয়ো।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেছে কারমেতনবাঈয়ের মহল। মীরা কান পেতে শুনলো। একটুখানি শোনা গেল একটি মেয়ের কাতর কান্না। পান্নাবাঈয়ের গলা বলে মনে হোলো। আবার সব চুপচাপ।

একটু চিন্তিত হোলো মীরাবাঈ।

এমন সময় ফিরে এলো ঝালীরানীর পরিচারিকা। সে খবর দিলো, একটি ঝুড়িতে চাপা দিয়ে উদয়কে সাঁওরমলের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলো পান্নাবাঈ। সাঁওরমল তাকে নিয়ে চলে গেছে চিতোরগড়ের বাইরে।

মীরা একটু নিশ্চিন্ত হোলো। তবু একটু ভাবনা হোলো,—পান্নাবাঈ ফিরে এলো কেন? সে কাঁদলোই বা কেন?

একটা পায়ের শব্দ শুনতে পেল। পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে মীরার মহলের দিকে। কি একটা যেন চিকচিক করে উঠলো তার হাতে।—একটি খোলা তলোয়ার।

লোকটি আস্তে আস্তে গিয়ে ঢুকলো মীরার মহলে। তারপর এদিক ওদিক দেখতে লাগলো।

ঠিক সেই সময় মীরা এসে দাঁড়ালো ওর পেছনে। বললো—বনবীর, আমি এখানে।

বনবীর চট করে ঘুরে দাঁড়ালো। দেখতে পেলো মীরার হাতেও একটি তলোয়ার।

বনবীর তাকিয়ে দেখলো মীরার দিকে। আবছা আলোয় একটা হাসি রেখা গেল তার মুখে।

গিরধরজীর সেবিকার হাতে তলোয়ার?—খুব মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো বনবীর।

হ্যাঁ,—তেমনই সহজভাবে উত্তর দিলো মীরাবাঈ।

—কেন?

—এত রাত্তিরে তোমার মতো লোক এখানে, সেইজন্যে।

—আপনার কি ধারণা ওই তলোয়ার দেখে আমি ভয় পাবো?

—ভয় পাবে না, কিন্তু তফাতে থাকবে।

বটে ?—হেসে উঠলো বনবীর।—হ্যাঁ, আমি জানি রাও দুদাজী নিজের হাতে আপনাকে তলোয়ার চালাতে শিখিয়েছেন। যাই হোক, আমি রাজপুত। মেয়েদের সঙ্গে তলোয়ার নিয়ে লড়াই করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

—তোমার তলোয়ারে রক্ত। কার সঙ্গে লড়াই করে এলে ?

গম্ভীর হয়ে গেল বনবীর। মীরার এ প্রশ্নের উত্তর দিলো না। জিজ্ঞেস করলো,—উদাবাঈ কোথায় ?

—এখানেই আছে।

—আপনার ঘরে ?

—হ্যাঁ।

একটু চুপ করে রইলো বনবীর। তারপর জিজ্ঞেস করলো,—আমি জানতে পেরেছি আপনি কারমেতনবাঈয়ের মহলে গিয়েছিলেন। কেন ? আপনি কি ভেবেছিলেন উদয়কে আপনি বাঁচাতে পারবেন ?

মীরা শুধু একটু হাসলো, কোনো উত্তর দিলো না।

বনবীর বললে—আমি জানি, আপনি তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করেন নি। তাকে বাঁচাবার কথা ভাবেনও নি। আপনি শুধু উদাবাঈকেই তুলে নিয়ে এসেছেন। কিছু দরকার ছিলো না। উদাবাঈয়ের কোনো ক্ষতি আমি করতাম না। সেকথা আপনিও জানেন।

তারপর ?—হেসে জিজ্ঞেস করলো মীরাবাঈ।

—আমি তাই ভাবছিলাম, আপনার আসল উদ্দেশ্যটা কি। মনে হচ্ছে আমি ঠিক আঁচ করতে পেরেছি।

তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে তুমি খুব বুদ্ধিমান,—আস্তে আস্তে বললো মীরা।

—হ্যাঁ, কিছু বুদ্ধি আমার আছে, তা নইলে কি সাঙ্গাজীকে সরিয়ে রতন সিংহকে গদিতে বসানোর ব্যবস্থা করতে পারতাম ?

—পেরেছো ?

—হ্যাঁ, তা পেরেছি বই কি। কাল থেকে রতনসিংহই মেবারের রাণা।

—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ। এবং সাঙ্গাজীকে আমরা চিনি না।

—খুব ভালো কথা। কিন্তু এসব তো সাঙ্গাজী আর তোমার মধ্যে বোঝাপড়ার ব্যাপার। আমাকে শুনিয়ে কি লাভ ?

—আপনাকে আমার দরকার।

—কেন ?

—রতনসিংহ আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে। আপনি যদি রতনসিংহের পেছনে এসে দাঁড়ান, তাহলে মেড়তিয়া রাঠোরেরাও এসে যাবে তাঁর পক্ষে। জোধপুরের রাঠোরেরা তো আমাদের পক্ষে আছেনই। সিসোদিয়া আর সমস্ত রাঠোর এক হলে রাজপুতদের শক্তি অনেক বেড়ে যাবে।

মীরা জিজ্ঞেস করলো,—তোমার কি করে ধারণা হোলো আমি তোমাদের পক্ষে যোগ দেবো ?

আগে সে বিশ্বাস ছিলো না,—উত্তর দিলো বনবীর,—কিন্তু যেই শুনলাম আপনি পান্নার ঘরে গিয়ে উদাবাঈকে তুলে নিয়ে এসেছেন অমনি বুঝে গেলাম আপনার উদ্দেশ্য।

মীরা একটু হাসলো, কোনো উত্তর দিলো না।

বনবীর বললো,—আপনি উদয়কেও তুলে নিয়ে আসতে পারতেন, লুকিয়ে রাখতে পারতেন তাকে, কিন্তু সে চেষ্টা আপনি করেন নি। অবশ্যি তাতে কোনো লাভ হোতো না। যাই হোক, আপনি নিশ্চয়ই ভাবলেন, ওঁকে বাঁচিয়ে কোনো লাভ নেই। তাই মনে হোলো, রতন সিংহ যদি রাণা হয়, তাতে আপনার কোনো আপত্তি নেই। এদিকে আপনি যে উদাবাঈকে তুলে নিয়ে এলেন, আমার গুপ্তচর আড়াল থেকে আপনাকে লক্ষ করেছে।

প্রথমটা আমি বুঝতে পারলাম না কেন,—বনবীর বলে গেল,—কিন্তু একটু ভাবতেই কথাটা পরিষ্কার হয়ে গেল।

বনবীর একটু থেমে মীরার দিকে তাকালো।

মীরা শান্তভাবে বললো,—হ্যাঁ, বলে যাও, আমি শুনছি।

—আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে চান,—বললো বনবীর,—কিন্তু ওখানে সবার চোখে পড়বে, আমাকে এখানে ডাকিয়ে আনলেও মহলে জানাজানি হয়ে যাবে। উদাবাঈকে আপনি তুলে নিয়ে এলেন, কারণ আপনি জানেন তাহলে আমি তারই খোঁজ করতে আপনার এখানে আসবো। সবাই জানবে আপনি তলোয়ার নিয়ে আমায় রুখেছিলেন, আমি আপনাকে অনেক ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছি, আপনাকে শাসিয়েছি, কিন্তু আপনাকে কাবু করতে পারি নি। আসলে আপনার সঙ্গে আমার কি কথা হয়েছে সেটা কেউ জানবে না, কিছু সন্দেহও করবে না। যদি আমাদের এই পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়, যদি সাঙ্গাজী ফিরে এসে চিতোরগড় দখল করতে পারেন, তাহলে কেউ জানতে পারবে না যে আপনি ছিলেন আমাদের পক্ষে।

সাঙ্গাজী ও কারমেত্তনবাঈ বরং কৃতজ্ঞই হবেন একথা ভেবে যে আপনি উদাবাঈকে বাঁচাতে পেরেছেন। উদয়কেও বাঁচাতে চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু পারেন নি।

পারেন নি।—কথাটা ঝাঁঝরের আওয়াজের মতো মীরার কানে এসে বাজলো। সে ভুরু কুঁচকে বনবীরের দিকে তাকালো।

বেচারা উদয়,—বনবীর বললো—আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তার জন্যে। নিষ্পাপ অবোধ শিশু, তার কোনো দোষ নেই, কিন্তু ভাগ্যের লিখন কে খণ্ডাবে। তাকে অকালেই বিদায় নিতে হোলো এই দুনিয়া থেকে।

শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মীরা। অন্তত বনবীরের তাই মনে হোলো আবছা অন্ধকারে।

কিন্তু বনবীরের রক্তাক্ত তলোয়ারের দিকে তাকিয়ে মীরার বুক কেঁপে উঠেছিলো এক পলকের জন্যে।

ঝালীরানীর পরিচারিকা তাকে খবর দিয়েছিলো সাঁওরমল উদয়কে একটি ঝুড়িতে লুকিয়ে চিতোরগড়ের বাইরে নিয়ে গেছে।

বনবীর কি তাহলে ভুল করেছে?—মীরা ভাবলো,—পান্নার কান্না শুনতে পেয়েছিলো সে। বনবীর কি তাহলে ভুল করে ধাত্রী পান্নার ছেলেকেই,—না, না,—মীরা শিউরে উঠলো। আর ভাবতে পারলো না।

বনবীর দেখলো মীরা তার দিকে তাকিয়ে আছে শান্তদৃষ্টিতে।

মহলে একটা শোরগোল আরম্ভ হয়েছে। মনে হচ্ছে চারদিকে যেন অনেক দ্রুত পায়ের শব্দ।

সব আমার লোক,—বনবীর হেসে বললো,—অন্য সবাই যে যার নিজের মহলে দরজায় খিল এঁটে বসে আছে। কারো সাহস নেই বাইরে বেরোনোর। আমাদের কেউ বিরক্ত করবে না।

রাণা সাঙ্গা যখন জানতে পারবেন?—মীরা আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো।

চার পাঁচ দিনের মধ্যে কেউ চিতোরগড়ের বাইরে যেতে পারবে না,—উত্তর দিলো বনবীর,—সুতরাং দশ বারো দিনের আগে সাঙ্গাজী কিছুই জানতে পারবেন না। এখন জোর যুদ্ধ চলছে গুজরাটের সীমান্তে। হঠাৎ সেখান থেকে চলেও আসতে পারবেন না। যদি আসেনও বা, আরো ছয় সাত দিনের আগে এখানে পৌঁছাতে পারবেন না। আগামী পনেরো কুড়ি দিনের মধ্যে অবস্থার অনেক পরিবর্তন হবে। জোধপুর থেকে একদল রাঠোর

সৈন্য এসে পড়বে মেবারে। সর্দারেরাও অনেকে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে। সাঙ্গাজী ঢুকতেই পারবেন না চিতোরে।

তাহলে রতন সিংহই নতুন রাণা ?—মীরা একটু হেসে বললো।

অন্তত নামে,—উত্তর দিলো বনবীর,—তারপর হাসলো। বললো,—আসল রাণা আমি,—নেপথ্যে।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মীরা। তারপর বললো,—মনে হচ্ছে তোমাদের পক্ষে না থাকলে আমার মতো লোকের একটু অসুবিধে হতে পারে।

বনবীরের মুখে হাসি দেখা দিলো,—কয়েদখানায় থাকতে হবে। এবং গিরধরজীর সেবাও বন্ধ হয়ে যাবে। বাজেয়াপ্ত হয়ে যাবে আপনার সমস্ত জায়গীর। মন্দির যেটা তৈরী হচ্ছে সেটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে।

—আর যদি তোমাদের সঙ্গে হাত মেলাই ?

—কারমেতনবাঙ্গিয়ের জায়গীরের বেশ কিছুটা আপনাকে দেওয়া হবে, তবে মেড়তিয়া রাঠোরদের হাজির হতে হবে চিতোর দরবারের সেবায়।

—তা হলে তো খবর দিতে হয় আমার জ্যাঠামশাই বীরমদেবজী ও আমার বাবা রতন সিং রাঠোরকে।

—আমারই লোক যাবে। চিঠির মুসাবিদাও আমি করে দেবো। আপনাকে শুধু একটা সই করতে হবে।

মীরা হেসে বললো,—ওঁরা বিশ্বাস করবেন না, ওঁরা ভাবতেই পারবেন না যে, আমার পক্ষে এরকম কিছু করা সম্ভব। বিশ্বাস করলেও ওঁরা রাণা সাঙ্গার পক্ষ ত্যাগ করে চলে আসবেন না। রাঠোর রাজপুত বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে না।

বনবীরের গলা এবার ধারালো হোলো,—সে ভাবনা আপনার, আমার নয়। আমার চাই মেড়তিয়া রাঠোরদের সমর্থন। তার দাম আপনার প্রাণ, এবং জায়গীর, সারাজীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য, নিরাপত্তা।

হ্যাঁ, আমি জানি,—মীরা হাসলো,—তবে বীরমদেবজী কি রতন সিং রাঠোরের কাছে চিঠি লিখে কিছু হবে না। অন্য উপায় ভাবতে হবে।

আবার হাসি দেখা দিলো বনবীরের মুখে। বললো,—আমি জানি আপনি বুদ্ধিমতী, আপনি ভাবতে পারবেন অন্য উপায়।

—মেড়তায় আছে আমার ভাই জয়মল। আমি তাকে খবর দিচ্ছি উদয়পুরে আসবার জন্যে।

একটা ব্যাপারে আমাকে মাপ করতে হবে,—বনবীর বললো,—খবর আপনি যাকে দেবেন দিন, কিন্তু যাবে আমার নিজের বিশ্বাসী লোক।

—আমার কোনো আপত্তি নেই।

—বেশ, কবে যাবে বলুন।

—কাল দুপুরে।

—দুপুরে কেন? সকালেই যেতে পারে।

—পুজোর প্রসাদী ফুল পাঠাবো জয়মলের কাছে। দুপুরের আগে তো গিরধরজীর পুজো শেষ হবে না।

—বেশ, আপনার যা ইচ্ছে।

আজকের মতো এ পর্যন্ত,—মীরা গম্ভীর গলায় বললো। বনবীর মীরার দিকে একবার তাকালো। দু'তিন মুহূর্ত তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে।

তলোয়ারের হাতলে মীরার হাত আরো যেন শক্ত হয়ে গেল। বনবীর চোখ নামিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল সেখান থেকে।

মীরা কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো।

বনবীরের পায়ের শব্দ অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। একটু পরে আর শোনাই গেল না।

মীরা বেরিয়ে এলো নিজের মহল থেকে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল কারমেতনবাঈয়ের মহলের দিকে। পান্নার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছে চার-পাঁচজন সশস্ত্র প্রহরী। মীরাকে দেখে সসম্ভ্রমে অভিবাদন করলো কিন্তু পথ ছাড়লো না।

পান্না কোথায়?—মীরা জিজ্ঞেস করলো।

একজন উত্তর দিলো, কুমার উদয়ের মৃতদেহ নিয়ে সমিধেশ্বরের মন্দিরের ওদিকে চলে গেছে। কয়েকজন অনুচর গেছে সঙ্গে।

মীরা মহলের বাইরে যাওয়ার চেষ্টা করে বাধা পেলো। সেখানে একদল প্রহরী। কারো আজ বাইরে যাওয়ার হুকুম নেই।

তা হলে আমি এখানেই অপেক্ষা করবো,—বললো মীরা।

সমিধেশ্বরের মন্দিরের পাশে ছোটো শ্মশান। সিসোদিয়া রাজবংশের সবাইকেই দাহ করা হয় সেখানেই। চিতোরগড়ের ভিতরেই এই মন্দির আর শ্মশান।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হোলো না। একটু পরে পান্না ফিরে এলো একজন পরিচারক ও রক্ষীর সঙ্গে।

স্থির তার পদক্ষেপ। চোখ জলে ভাসছে, কিন্তু কোনোরকম বিচলিত ভাব নেই।

মীরা এগিয়ে এসে পান্নার কাঁধে হাত রাখলো।

পান্না ভাঙা গলায় বললো,—ওকে নিজের হাতে চিতায় শুইয়ে দিলাম। মুখাগ্নি হতে চলে এলাম। নিজের চোখে আর দেখতে পারলাম না।

প্রহরীদের একজন আরেকজনকে বললো,—তা তো হবেই। উদয়কে ও তো নিজেই কোলে পিঠে করে মানুষ করেছিলো।

মীরা ধাত্রী পান্নাকে শুধু বললো,—এসো আমার সঙ্গে।

পান্নার যেন পা চলছে না কিছুতেই। তবু জোর করে স্থির হয়ে হাঁটবার চেষ্টা করছে।

মীরা ওর কোমর জড়িয়ে ধরে সঙ্গে করে নিয়ে এলো নিজের মহলে। দরজা ভেজিয়ে ভেতর থেকে বন্ধ করে চলে এলো পূজোর ঘরে।

সেখানে এসে পান্না একবার তাকালো গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে।

তারপর মীরার বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে একেবারে ভেঙে পড়লো।

মীরার মুখে কোন সান্ত্বনার ভাষা এলো না। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো পান্নার পিঠের উপর।

চিতোরগড় তখন আবার নিস্তব্ধ হয়ে গেছে।—একেবারে নিস্তব্ধ। একেবারে প্রেতপুরীর মতো নিস্তব্ধ। শুধু বাইরে অনেক নিচে অঙ্গনের পাশে প্রাচীরের ধারে শোনা গেল প্রহরীর পদচারণার ভারী জুতোর শব্দ।

ফুলে ফুলে কাঁদছে ধাত্রী পান্না। তারই ফাঁকে একবার বললো,—উদয়কে নিরাপদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে চিতোরগড়ের বাইরে। তার জায়গায় আমার ছেলেকে—বলে কথা শেষ না করে আবার ডুকরে কেঁদে উঠলো।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো মীরা। গিরধরজীর বিগ্রহের মুখের দিকে এক পলক তাকালো। তারপর মৃদুকণ্ঠে বললো,—আমি জানি। আমি সব জানি।

॥ তেরো ॥

পরদিন যখন সকাল হোলো রাওলার রাজপুতানীরা যে যার নিজের ঘরের দরজা একটু একটু করে ফাঁক করে উঁকি মারলো। চারদিকে একটা থমথমে ভাব। একটা অস্বাভাবিক স্তব্ধতা।

মাঝে মাঝে দু একজন পরিচারিকা নিঃশব্দে হেঁটে চলে যাচ্ছে।

একজন হয়তো সাহস করে তাদের একজনকে হাতছানি দিয়ে ডাকলো। চুপি চুপি জানতে চাইলো চারপাশের খবর।

পরিচারিকা হয়তো দু-চার কথা বলে অন্যদিকে চলে গেল।

ওদিকের ঘর থেকে একজন হয়তো বেরিয়ে এসে এঘরের মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করলো।

তাদের দুজন হয়তো চলে গেল আরেকজনের ঘরে।

দুর্গের ভিতর মহলে মহলে মেয়েদের মধ্যে নানারকম গুঞ্জন, নানারকম গুজব। কিন্তু নিজের মহল ছেড়ে অন্য মহলে যাওয়ার সাহস কারো নেই। প্রত্যেক মহলের সামনে কড়া পাহারা। দুর্গের সামনের প্রশস্ত অঙ্গনে মোতায়েন করা হয়েছে একদল সৈন্য। প্রত্যেকটি ফটকে এক একদল করে পাহারাদার সৈন্য। বনবীরের বিশ্বাসী লোক ছাড়া কেউ দুর্গের বাইরে যেতে পারছে না, দুর্গের ভিতরে আসতে পারছে না।

সব চাইতে বেশী কড়াকড়ি ধনবাঈয়ের মহলের সামনে। সেখানে রতন সিংহকে সতর্ক পাহারায় রাখা হয়েছে যাতে তার নিরাপত্তার কোনো বিঘ্ন না হয়।

শোনা যাচ্ছে বনবীর, মালদেব এরা খুব শিগগিরই রাণার গদিতে বসাবে রতন সিংহকে। রাণা সাঙ্গা ফিরে এলে যাতে চিতোরগড়ে ঢুকতে না পারে সেই আয়োজনে সবাই ব্যস্ত। চিতোরগড়ের ভিতর জড়ো করা হচ্ছে এদের বিশ্বাসী সৈন্যদের। আরো অনেক সৈন্য নাকি এসে পড়বে কয়েকদিনের মধ্যেই।

ঝালীরানীর মহলের সামনেও কড়া পাহারা,—ঝালী রানী যাতে বেরিয়ে এসে কোনো গণ্ডগোল করতে না পারে।

শিশু রাজকুমার উদয়কে কি মেরে ফেলা হয়েছে?—সবাই প্রশ্ন করছে পরস্পরকে।

তাই তো শোনা যাচ্ছে। গভীর রাতে বনবীর নাকি রানী কারমেতন-বাঈয়ের মহলে ঢুকে নিজের হাতে তলোয়ার বসিয়ে দিয়েছে উদয়ের বুকে।

তাকে কেউ আর দেখেনি। রাতারাতি তাকে দাহ করা হয়েছে।

পান্নার খবর জানবার জন্যে সবাই উৎসুক। কিন্তু তার সঙ্গে যোগাযোগ করা আর সম্ভব নয়। পান্না আর শিশু রাজকন্যা উদাবাঈকে নিজের মহলে নিয়ে গেছে মীরাবাঈ।

আর পান্নার ছেলেটি?

সেও নিশ্চয়ই আছে পান্নাবাঈয়ের সঙ্গে।

মীরাবাঈয়ের মহলে যাওয়ার উপায় নেই। সেখানেও কড়া পাহারা।

মীরাবাঈ কি করছে কেউ জানো ?

কেউ চোখে দেখেনি তাকে। তবে শোনা গেছে সে নাকি গিরধরজীর পুজোয় মগ্ন। পরিচারিকাদের কে একজন তার মহলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে শুনতে পেয়েছে ভজন গান।

বাবাঃ, ধন্যি মেয়ে বটে এই মীরাবাঈ। কোত্থেকে যে রাণাজী নিয়ে এসেছেন এমন একটি মেয়েকে! সে আর তার গিরধরজী। সংসারে আর যেন কিছু নেই। এত বড়ো একটা কাণ্ড হয়ে গেল রাত্তিরে। রাওলার ভিতর খুন হয়ে গেল এক রাজকুমার। এত সাংঘাতিক ষড়যন্ত্র। বাপের সিংহাসনে ছেলে বসতে চলেছে বাপের জীবদ্দশাতেই। চিতোরগড় বেরিয়ে গেল রাণা সাঙ্গার দখল থেকে।—আর এমন দিনেও মীরা ভজন গাইছে ?

পালাও, পালাও, বনবীর আসছে রাওলার ভিতর।

চুপ, চুপ। চট করে ঢুকে পড়ো যে যার ঘরে।

ঝরোকার ফাঁক দিয়ে দ্যাখতো বনবীর কোথায় যাচ্ছে ?

আশ্চর্য ব্যাপার। বনবীর যাচ্ছে মীরাবাঈয়ের মহলের দিকে।

যারা শুনলো, তাদের মুখ শুকিয়ে গেল। মীরাকেও মেরে ফেলবে নাকি ? মীরা তো রাণাজীর প্রিয়পাত্রী। ধনবাঈয়ের সঙ্গে মীরাজীর বনিবনাও নেই। মেড়তিয়া রাঠোরদের সঙ্গে জোধপুরের রাঠোরদের দারুণ শত্রুতা।

শোনো, জমনাবাঈকে পাঠিয়ে দাও তো, পা টিপে টিপে গিয়ে দেখে আসুক আড়াল থেকে।

অনেকক্ষণ দেখা নেই জমনাবাঈয়ের। তারপর এক সময় ফিরে এলো।

মীরাবাঈয়ের মহলের বাইরে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেছে বনবীর। তারপর এক সময় নাকি মীরা দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে।

হাসিমুখে মীরাবাঈকে প্রণাম করেছে বনবীর। মীরা তার হাতে দিয়েছে গিরধরজীর প্রসাদী ফুল।

যারা শুনলো, সবাই শুম্ভিত হোলো। মীরাবাঈ ?—প্রসাদী ফুল দিয়েছে ?—গিরধরজীর প্রসাদী ফুল ?—বনবীর সিংহকে ?

সাত জন্মেও কোনো রাজপুতানী এমন কথা শোনে নি। কাল রাতে উদয়কে যে লোকটি খুন করেছে নিজের হাতে, তাকে গিরধরজীর প্রসাদী ফুল

দিয়েছে মীরাবাঈ? যে মীরাকে এত ভালোবাসেন রাণাজী, এত ভালোবাসেন রানী কারমেত্তনবাঈ?

কালে কালে কতো কিই যে শুনবো!

শোনো, শোনো, আসল কথাটাই তো এখনও বলা হোলো না।

কি ব্যাপার? তারপর কি হোলো?

চুপ চুপ, বড্ড শোরগোল হচ্ছে। চুপ, পাহারাদারেরা শুনলে তেড়ে আসবে।

আরে শুনিই না তারপর কি হোলো?

বলতে দিচ্ছো কোথায়? শুধু শোরগোল করছো।

এই চুপ করলাম।—বলো।

বনবীরের নির্দেশে একজন পরিচালক নিয়ে এলো কাগজ কলম আর দোয়াত। মীরাবাঈ কলম তুলে নিলো। বলে গেল বনবীর সিংহ। মীরাবাঈ লিখে গেল চুপচাপ।

বনবীর খুব খুশী হয়ে চিঠি নিয়ে চলে গেল।

কিসের চিঠি? কার জন্যে চিঠি?

অতো কথা তো জানি না। তবে শুনছি বনবীর সিংহের একজন বিশ্বাসী লোক কিছুক্ষণের মধ্যেই মেড়তা রওনা হচ্ছে।

মেড়তা? ওখানে তো বীরমজী বা রতন সিং রাঠোর কেউই নেই। ও হ্যাঁ, মীরার জ্যাঠতুতো ভাই জয়মল আছে সেখানে।

তার মানে কি বুঝেছো? মীরা আর জয়মলও আছে আছে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে। জয়মলের মেড়তিরা রাঠোরেরাও যোগ দিচ্ছে রতন সিংহের পক্ষে। বোধ হয় জয়মলকে করা হবে মেড়তার রাজা।

কলিকাল। ন্যায় ধর্ম বলে কিছু নেই। তা নইলে ছেলে তলোয়ার ধরে বাপের বিরুদ্ধে? স্ত্রী দাঁড়ায় স্বামীর বিপক্ষে?

স্ত্রী? কার কথা বলছো?

আমাদের রানী ধনবাঈ, যাঁকে এত সম্মান করেন রাণা সাঙ্গাজী। সব কিছুর পেছনে কাজ করছে তো তাঁরই বুদ্ধি।

তাই নাকি?

তাও শোনোনি? রতন সিংহ এখনো নাবালক বলে রাজপ্রতিনিধি হচ্ছেন ধনবাঈ।

শুনেছো—? শুনেছো?—ছুটে এলো একজন।

আরে? কুন্তীবাঈ? কি করে এলে এই মহলে?

মীরার কথায় মহলের ভিতর থেকে পাহারা তুলে নিয়েছে বনবীর সিংহ। এখন পাহারা শুধু মহলের বাইরে। কেউ বাইরে বেরোতে পারবে না, কিন্তু মহলের ভিতরে স্বচ্ছন্দে ঘুরে বেড়াতে কোনো বাধা নেই। তবে রানী ধনবাঈয়ের মহলে যাওয়া যাবে না, মীরাবাঈয়ের মহলেও যাওয়া যাবে না।

ধনবাঈয়ের মহলে তো তো না যাওয়ার কারণ বুঝলাম। সেখানে থাকেন নতুন রাণা এবং রাজমাতা। কিন্তু মীরাবাঈয়ের মহলে যাওয়া যাবে না কেন?

তা তো জানি না। সেটাই তো একটা বিরাট রহস্য বলে মনে হচ্ছে।

কোনো রহস্য নেই। মীরাবাঈ এখন নতুন রাণা রতন সিংহের দলে।

তা হলে তো ভাই এখন মীরাবাঈকেই খোসামোদ করে চলতে হবে। চলো, ওঁর গিরধরজীকে প্রণাম করে আসি।

মীরা নেই তার মহলে।

সে কি? কোথায় গেল? এই তো কিছুক্ষণ আগে কথা বলছিলো বনবীরের সঙ্গে।

বনবীর চলে যাওয়ার পরই প্রণাম করতে গেছে ঝালীরানীকে।

ওদের মধ্যে কি কথাবার্তা হচ্ছে জানতে পারলে ভালো হোতো।

ওখানে তো পাহারা নেই। পাঠিয়ে দাও না কাউকে।

না বাবা, ঝালীরানী টের পেলে রাগ করবে।

টের পাবে কেন? সুরজবাঈকে পাঠিয়ে দাও একথালা লাড্ডু দিয়ে ঝালীরানীর বাঁদী সুভদ্রার কাছে। বলো আমি পাঠিয়েছি।

কিছুক্ষণ পরে ফিরে এলো সুরজবাই। সুভদ্রার সঙ্গে দেখা হয়নি। ঝালীরানী আর মীরাবাঈ কুণ্ডে স্নান করতে গেছে সুভদ্রাকে সঙ্গে নিয়ে।

বনবীরের কথামতো মীরা তার ভাই জয়মলকে যে চিঠি লিখে দিয়েছিলো, সেটি পাওয়ার পর বনবীর আর মহলের ভিতর কি হচ্ছে না হচ্ছে তা নিয়ে মাথা ঘামালো না।

একজন এসে যখন বনবীরকে জানালো যে ঝালীরানী ও মীরাবাঈ এক পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে কুণ্ডে স্নান করতে গেছে, বনবীর তাকে ধমক দিয়ে বললো,—সে তো যাবেই। কে কুণ্ডে স্নান করতে গেছে আর কে মন্দিরে পুজো দিতে গেছে এসব খবরও কি আমায় বসে শুনতে হবে নাকি? এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে তোমায় মাথা ঘামাতে হবে না। শুধু এটুকু নজর রাখো যেন মহলের কেউ পাহারাদারদের চোখে ধুলো দিয়ে বাইরে বেরিয়ে না পড়ে, কিংবা কেউ আমাদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করার উপক্রম না করে।

॥ চোদ্দো ॥

কুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে খুব নিচু গলায় কথা বলছিলো ঝালীরানী আর মীরা।

রাণাজী সাত আট দিনের মধ্যে এসে পড়তে পারবেন তো?

যদি না আসেন, তাহলে হয়তো রাজ্যই হারাতে হবে তাঁকে।

সব কিছু নির্ভর করছে ভট্টোজীর উপর।

কিন্তু সে এত দেরি করছে কেন?

বলতে না বলতেই সেখানে এসে গেল এক প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ। হাতে ফুল বেলপাতা।

ভট্টোজী, হাতে কিন্তু সময় নেই একেবারেই,—বললো মীরা।

আমি এক্ষুনি রওনা হচ্ছি।

ঝালীরানী বললো,—আপনি নদীর ওপারের গ্রামে গিয়ে পেয়ে যাবেন কাহ্না সিংকে। ওকে বলবেন সব খবর। ও সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া নিয়ে রওনা হয়ে যাবে। কিন্তু সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসবেন। সারাদিন হয়তো কারো চোখে পড়বে না যে আপনি এখানে নেই কিন্তু সন্ধ্যেবেলা কালীজীর মন্দিরে আরতির সময় আপনাকে দেখা না গেলে হয়তো খোঁজ পড়তে পারে।

আপনি ভাববেন না। আমি ঠিক সময় ফিরে আসবো।

মীরা নিজের হাত থেকে একটি আংটি খুলে দিলো ভট্টোজীকে। বললো' —এ আংটি রাণাজী আমায় দিয়েছিলেন। এটা দেখে উনি চিনবেন এবং বিশ্বাস করবেন।

ভট্টোজী বললো, এবার আসুন, আপনাদের মন্ত্র পড়িয়ে দিই।

দূরে দূরে দু' একজনকে দেখা যাচ্ছিলো।

ঝালীরানী ও মীরাবাঈ হাত পেতে ফুল নিলো। ভট্টোজী মন্ত্র পড়াতে লাগলো ওদের। ওরা মন্ত্রপাঠ করে ফুল ছুঁড়ে দিতে লাগলো কুণ্ডের জলে।

সুভদ্রা চারদিকে নজর রেখেছিলো।

হঠাৎ বললো,—এখন কেউ নেই কোথাও।—এইবার।

আমি আসি তাহলে,—বললো ভট্টোজী,—তারপর আপনারা অবগাহন করে নেবেন।

একটু মাথা নাড়লো মীরাবাঈ।

ভট্টোজী দম নিয়ে কুণ্ডের জলে একটা ডুব দিলো। দু চারটা বুদবুদ ভেসে উঠলো। কিন্তু ভট্টোজী আর উঠলো না।

একটু পরে জলে নেমে অবগাহন করলো ঝালীরানী আর মীরাবাঈ।

ইতিমধ্যে আরো দু চারজন এসে গেছে কুণ্ডে স্নান করতে। ঝালীরানী ও মীরাবাঈকে দেখে ভয়ে ভয়ে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখলো। কেউ কারো সঙ্গে কথা বললো না। কেউ জানলো না যে ভট্টোজী এখানে ছিলো। কেউ ভাবতেও পারলো না যে, জলের তলায় একটা গুপ্ত পথ দিয়ে সে চলে গেছে। সে পথের খবর মহলে বিশেষ কেউ জানেনা কোনোদিনই।

স্নান করে নিজের নিজের মহলে ফিরে গেল ঝালীরানী আর মীরাবাঈ।

একদিন দু'দিন তিনদিন কেটে গেল। মহলের ভিতরের জীবনযাত্রা আবার স্বাভাবিক হয়ে উঠলো আস্তে আস্তে, যদিও বাইরে বেরোনোর হুকুম নেই। তারপর আরো দু'দিন কেটে গেল। বনবীর একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলো। যে সব সৈন্য সে আশা করছিলো ওরা এখনো এসে পৌছালো না। তাড়াতাড়ি করিয়ে নিতে হবে রতন সিংহের অভিষেক।

আরো একদিন।—তারপর হঠাৎ চিতোরগড়ের বাইরে শোনা গেল নাকারা। হই চই পড়ে গেল। শোনা গেল ফিরে এসেছেন রাণা সাঙ্গা।

॥ পনেরো ॥

রাণা সাঙ্গা ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই যেন কেটে গেল বিভীষিকার অন্ধকার। আগেকার সেই নিস্তব্ধ থমথমে পরিবেশ আর নেই। আবার সহজভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখা গেল রাওলার রাজপুতানীদের। গীত উৎসব পুজো-পার্বণ, অবসর সময়ের জটলা, সব আবার সাবেক দিনের মতো।

মীরার মহলের ভিতর থেকে শোনা যেতো চিতোরগড়ের অন্যান্য মহলের রাজপুতানীদের কলকণ্ঠ উচ্ছ্বাস, অনুভব করা যেতো রাওলার প্রাণচাঞ্চল্য। কিন্তু মীরা বাইরে আসতো না বড়ো একটা। কখনো সখনো হয়তো বা কিছুক্ষণের জন্যে যেতো ঝালীরানীর কাছে। বাকী সময়টা নিজের মহলের মধ্যেই।--শুধু গিরধরজীর সেবা, আর পড়াশুনো। আর মাঝে মাঝে গোমস্তাকে ডাকিয়ে এনে খোঁজখবর নিতো কুম্ভশ্যামের মন্দিরের অতিথিশালার ভক্ত সাধুসন্ত অতিথিদের।

কারো সঙ্গে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কোনো আলোচনা হোতো না।

ঝালীরানীও কিছু বলতো না মীরাকে। এক এক সময় খুব চিন্তিত দেখাতো তাকে।

বয়েস হয়ে গেছে ঝালীরানীর। প্রায়ই অসুস্থ থাকে। মীরার সঙ্গে কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে চোখে জল এসে যায়।

মীরা নিজের চুনড়ীর প্রান্ত দিয়ে মুছে দেয় ঝালীরানীর চোখের জল।

ভাবনা কিসের? রাণাজী এখন চিতোরগড়ে আছেন। এখান থেকে তো আর নড়বেন না এখন। রাণার সঙ্গে শত্রুতা করার সাহস আর কারো নেই।

মীরার কথা শুনে বিষণ্ণ হয়ে যায় ঝালীরানী।

রাণা ফিরে এসেছে সত্যি, কিন্তু অনেক বদলে গেছে চিতোরগড়ের পরিস্থিতি। দিনগুলি আর আগের মতো হবে না। ঝালীরানী জানে একথা। মীরাও জানে।

প্রতিপক্ষ বিদ্রোহ করার সাহস পায়নি, কিন্তু হার মানে নি মোটেও। ওরাও জানে রাণার আর শক্তি নেই আগের মতো। চিতোরগড়ের বিদ্রোহের ষড়যন্ত্রের খবর পেয়ে রাণা সাঙ্গাকে তাড়াতাড়ি একটা সন্ধি করে ফেলতে হয়েছিলো গুজরাটের মুজফ্‌ফর শা'র সঙ্গে। সন্ধির শর্তগুলি অসম্মানজনক না হলেও সুবিধেজনক নয়। এ এক রকম যুদ্ধে হেরে যাওয়ার মতো। ছয় বছরের বালক রাজকুমার বিক্রমজিৎকে প্রতিভূ হিসেবে পাঠিয়ে দিতে হয়েছে সুলতান মুজফ্‌ফর শা'র কাছে। তা নইলে যুদ্ধ থামতো না। তাড়াতাড়ি চিতোরগড়ে ফিরে আসতে পারতো না রাণা সাঙ্গা।

কুমার রতন সিংহের মা রানী ধনবাঈ খুশী হয়েছিলো। কারমেতন-বাঈয়ের ছেলে বিক্রমজিৎ গুজরাটের দরবারে নজরবন্দী থাকলে চিতোরের গদির জন্যে রতন সিংহের কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো না।

ধনবাঈয়ের ভাই কুমার মালদেব রাণা সাঙ্গার প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলো। সে বলেছিলো, রাণা বেশীদিন চিতোরগড় অবরোধ করতে পারবে না, জোধপুরের রাঠোরেরা তাদের রাজকুমার মালদেবকে বাঁচানোর জন্যে পেছন থেকে আক্রমণ করবে রাণা সাঙ্গাকে। হয়তো উস্কে দেওয়া যাবে সুলতান মুজফ্‌ফর শাহকে, সুলতান ইব্রাহীম লোদীকে। একজন আক্রমণ করবে দক্ষিণ থেকে, অন্যজন উত্তর থেকে। রাণা সাঙ্গা দিশেহারা হয়ে মেবার থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হবে, কিংবা প্রাণ দিতে হবে যুদ্ধে। তখন নিজেকে রাণা বলে ঘোষণা করবে রতন সিংহ।

কিন্তু বনবীর অনেক ধূর্ত, অনেক বিচক্ষণ, সে বললো,—না, মহারাণাকে

আসতে দাও চিতোরগড়ের ভিতর। জোধপুর দিল্লী আর গুজরাটের সাহায্য নিয়ে রাণাজীর সঙ্গে লড়তে গেলে, অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলো মহারাণার পাশে এসে দাঁড়াবে, বিশেষ করে অম্বর আর বিকানীর। আমরা চাই না যে, রাজপুতদের কাছে সিসোদিয়া রতন সিংহ দেশদ্রোহী বলে পরিচিত হোক।

রাণা সাঙ্গা চিতোরগড়ে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে বনবীরের পক্ষের সৈন্যরা গড়ের বাইরে চলে গেল। রাণা বলেছিলো বনবীরকে ডেকে,—ওদের অস্ত্র ত্যাগ করতে বলো।

বনবীর হেসে উত্তর দিয়েছিলো,—তলোয়ার খুলে নেবো রাজপুতের কোমরবন্ধ থেকে?

রাণাও বুঝলো, এ অসম্ভব। তাহলে চিতোরের ভিতর গৃহযুদ্ধ ও রক্তপাত আরম্ভ হবে। এই পরিস্থিতি এড়াতে চায় রাণা সাঙ্গা।

তোমরা বিদ্রোহ করেছিলে,—বললো মহারাণা,—এর জন্য তোমাদের বিচার হবে।

—আমাদের? কার? মেবারের রানী ধনবাঈয়ের? কুমার রতন সিংহের? জোধপুরের কুমার মালদেবের?

রাণা বুঝলো, এও অসম্ভব। জোধপুরের রাঠোরেরা এটা সহ্য করবে না। তারা যুদ্ধ করবার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। যুদ্ধ করতে রাণাও ভয় পায় না। কিন্তু রাজপুতানায় চিতোর আর জোধপুরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হলে দিল্লী আর গুজরাটের সুলতান তার সুযোগ নেবে।

এখন হাতে সময় চাই। কাবুলের বাদশাহ বাবরকে উস্কে দিতে হবে ইব্রাহীম লোদীর বিরুদ্ধে। গুজরাটের সুলতান মুজফ্‌ফরের সঙ্গে শাহজাদা বাহাদুর শা'র সঙ্গে মন কষাকষি চলছে। বাহাদুর শাহকে প্ররোচিত করতে হবে বিদ্রোহ করবার জন্যে। এদের সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন হলে তবেই জোধপুরের রাঠোরদের মোকাবিলা করা যাবে। সুতরাং হাতে আরো কিছু সময় চাই।

বিচার হবে তোমার,—রাণা সাঙ্গা বললো বনবীরকে।

বনবীর হাসলো। সে একটুও ভয় পেলো না মহারাণার কথা শুনে। বললো,—বেশ, দরবারের অভিমত নিন। দরবার যা বলে, তাই হবে।

রাণা বললো,—আমিই দরবার।

বনবীর হাসতে হাসতে মাথা নাড়লো।

রাণাও বুঝলো, যতোই হম্বিতম্বি করি না কেন, আমার সেইদিন আর নেই।

এ সব খবর ঝালীরানী জানে, মহলের সবাই জানে, মীরাও জানে।

ঝালীরানীর খুব দুশ্চিন্তা।

কেন ভাবছেন,—বললো মীরা,—সব ঠিক হয়ে যাবে।

না মীরা, ঠিক আর হবে না, সময়ের অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

আমাদের তাতে আর ভাবনা কিসের ?

ভাবনা আমার নিজের জন্যে নয় মীরা, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। আমার সময় ফুরিয়ে আসছে। আমার ভাবনা তোমার জন্যে।

গিরধরজী আছেন, উনিই ভাববেন আমার ভাবনা।

মীরাকে দেখে মনে হয় সে খুব নিশ্চিন্ত। কিন্তু অতো নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারে না ঝালীরানী। যতোদিন ঝালীরানী বেঁচে আছে, যতোদিন রাণা সাঙ্গা আছে, ততোদিন মীরাকে কেউ ঘাঁটাবে না। ঘাঁটানোর সাহস কারো হবে না।

কিন্তু তারপর ?

মীরার শুধু একটি উত্তর,—আমার গিরধরজী আছেন।

ঝালীরানী কোনো উত্তর দেয় না, শুধু একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। পুরোনো দিনের স্বপ্নগুলো মনে পড়ে। সারা হিন্দুস্থান দখল করবে রাণা সাঙ্গা। পরে আর্যাবর্তের সম্রাট হবে কুমার ভোজরাজ। তার পট্টমহিষী মীরাবাঈ।

রাণা সাঙ্গার সঙ্গে মীরার দেখা হয়েছিলো শুধু একদিন। চিতোরগড়ে ফিরে আসার পর মীরা গিয়েছিলো প্রণাম করতে।

রাণা মীরার মাথায় হাত রেখে নিস্তব্ধ হয়ে ছিলো কিছুক্ষণ। তারপর সাধারণ দুটো চারটে কুশল প্রশ্ন করেছিলো।

মীরার মনে হয়েছিলো রাণা অনেক কিছু বলতে চায় তাকে। কিন্তু সেখানে অনেকেই ছিলো, তাদের সামনে রাণা কিছু বললো না।

তার পরদিনই দরবার।

সব খবর মীরার কানেও এলো।

রাণা সাঙ্গা বনবীরের বিচার করতে চেয়েছিলো। কিন্তু প্রতিপক্ষও দলে ভারী। ওরা বললো, বনবীরের বিচার তো হবেই না, বরং সুরজমল হাডার বিচার হওয়া উচিত। সে নাকি ষড়যন্ত্র করছে জ্যেষ্ঠ রাজকুমার রতন সিংহকে বঞ্চিত করে তার বোন রানী কারমেতনবাঈয়ের ছেলে বিক্রমজিৎকে সিংহাসনে বসানোর জন্যে।

কিন্তু আমি তো এখনো বেঁচে আছি,—গর্জে উঠলো রাণা সাঙ্গা।

প্রতিপক্ষ বললো,—সিংহের দাঁত পড়ে গেছে, নখের ধার চলে গেছে। খাটোলীর যুদ্ধে একটি হাত কাটা যাওয়ার পর মহারাণা রাজ্য শাসনে অক্ষম। তাঁর দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছেন তরুণী মহারানী কারমেতনবাঈ।

রাণা তখন জানালো,—দরবারের অন্যান্য সর্দারদেরও যদি এই ধারণা, তাহলে আমি ছেড়ে দিচ্ছি এই সিংহাসন।

কিন্তু রাণার অনুগতদের শক্তিও কম নয়। সুরজমল হাডা, মেড়তার রাও বীরমদেব, অম্বরের রাজা পৃথ্বিরাজ, সালুমব্রার রাও রতন সিংজী, এদের নেতৃত্বে অন্যান্য সর্দারেরা সবাই মহারাণার প্রতি তাদের আনুগত্য ঘোষণা করলো।

ঝনঝন করে উঠলো প্রতিপক্ষের সবারই তলোয়ার, রাণা সাঙ্গা বুঝলো যে এখনই কোনোরকম একটা বোঝাপড়া না করলে গৃহযুদ্ধ অনিবার্য। খবর এসেছে যে, প্রতিপক্ষের সৈন্যেরা তৈরী হয়ে আছে চিতোরগড়ের ফটকের কাছে। যে কোনো মুহূর্তে ওরা দুর্গ আক্রমণ করার জন্যে প্রস্তুত।

রাণা তখন ঘোষণা করলো,—যেহেতু দরবারের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মহারাণার অনুগত, মহারাণা সিংহাসন অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কোনো প্রয়োজন মনে করছেন না।

প্রতিপক্ষ সদলবলে সভাকক্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার উপক্রম করছিলো।

আমার কথা এখনো শেষ হয়নি,—বললো মহারাণা।

ওরা থমকে দাঁড়ালো।

রাণা সাঙ্গা বললো,—আমরা এসে পড়েছি ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে। হয় আমাদের একজোট হয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে, সমগ্র আর্যাবর্তকে এক রাজচ্ছত্রের নিচে এনে দেশের জনসাধারণকে শান্তি ও সমৃদ্ধির আশ্বাস দিতে হবে, কিংবা নিজেরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ করে সম্পূর্ণভাবে নিস্পৃহ হয়ে থাকতে হবে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। এবং এই সুযোগে সুদূর পশ্চিমের কান্দাহার থেকে বিদেশীরা এসে দখল করে নেবে সারা হিন্দুস্তান। হয়তো আমাদের মেবারও তাদের সামন্তরাজ্যে পরিণত হবে।

কক্ষনো না,—গর্জে উঠলো সমস্ত দরবার।

—তাহলে আমাদের উচিত সবাই এক হয়ে এতদিনকার সমস্ত শত্রুতা ভুলে যাওয়া। আমি যে অন্তর থেকে একথা বিশ্বাস করি, সেটা প্রমাণ করার জন্যে ঘোষণা করছি যে, আমার অনুপস্থিতিতে যাঁরা আমাকে সিংহাসনচ্যুত করার পরিকল্পনা ও ষড়যন্ত্র করেছিলেন তাঁদের সবাইকে আমি বিনা শর্তে মার্জনা করলাম।

মহারাণার পক্ষের সর্দারেরা হর্ষধ্বনি করে উঠলো। তাতে যোগ দিলো প্রতিপক্ষের অনেকেই। গৃহযুদ্ধের সম্ভাবনায় সবার মনের উপর একটা চাপ পড়েছিলো। তাই মহারাণার ঘোষণায় তাদের মন হালকা হয়ে গেল।

মহারাণা বলে গেল,—অনেকের মনে আমার সম্বন্ধে যে অভিযোগ, সেটা এ ভয়ে যে কুমার রতন সিংহকে বঞ্চিত করে আমি কুমার বিক্রমজিতকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করবো। এই সামান্য কারণে যে আমাদের মধ্যে ঝগড়া হবে একটা আমি চাই না। তাই আজ আমি কুমার রতন সিংহকে মেবারের টিকায়েত বলে ঘোষণা করছি। আমার পর সেই হবে মেবারের মহারাণা। এই মনোনয়নে যদি কারো আপত্তি থাকে তো এখানেই জানাতে পারেন।

দরবারের সবাই একসঙ্গে একবাক্যে এই মনোনয়নের অনুমোদন করলো।

কুমার মালদেব বনবীরকে বললো,—তাহলে আমরাই জিতে গেলাম শেষ পর্যন্ত।

বনবীর বললো,—এত তাড়াতাড়ি উৎফুল্ল হোয়ো না। মহারাণাকে তুমি চেনো না।

রাণা সাঙ্গা বলে গেল,—তাহলে আমাদের মধ্যে আর কোনো ঝগড়া নেই। আমরা সবাই এক। এখন থেকে আমাদের তৈরী হতে হবে আগামী দিনের চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্যে। কাবুলের বাবর শাহ ও সুলতান ইব্রাহীম লোদীর মধ্যে যুদ্ধ হওয়ার সময় এসে যাচ্ছে। সে যুদ্ধে পতন হবে লোদীদের। কিন্তু বাবর দিল্লী দখল করার আগেই আমরা যাতে লোদী বংশের এই বিপর্যয়ের সুযোগ নিতে পারি, তার জন্যে আমাদের তৈরী হতে হবে এখন থেকে। এই প্রস্তুতির আরম্ভেই প্রয়োজন একজন বিচক্ষণ প্রধানমন্ত্রীর। আমি এই পদের জন্যে মনোনীত করছি সুরজমল হাডাকে। এবং সুরজমল যাতে রতন সিংহের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে এজন্যে তার এবং আমাদের প্রিয়তমা রানী কারমেতনবাঈয়ের ছোটো বোন সুজাবাঈয়ের সঙ্গে রতন সিংহের বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছি।

দরবারে সবার মুখে খুশির আভাস দেখা গেল।

কুমার মালদেব উত্তেজিত হয়ে কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো।

বনবীর তাকে বাধা দিলো,—না কুঁয়র-সা, এখন কিছু বোলো না।

—কিন্তু আমরা যে হেরে গেলাম। রানী কারমেতনবাঈয়ের ভাই হবে প্রধানমন্ত্রী? তার বোন হবে রতন সিংহের বৌ? কী লাভ হোলো তাতে?

দেখা যাক, কার জিত হয় শেষ পর্যন্ত,—বললো বনবীর।

॥ ষোলো ॥

হাতে সময় চেয়েছিলো মহারাণা সাঙ্গা, আশ্চর্য কৌশলে প্রতিপক্ষকে নিষ্ক্রিয় করে নিজে তৈরী হওয়ার সময় পেয়ে গেল। মহারাণার কূটনীতির কাছে হেরে গেল বনবীর আর কুমার মালদেব।

সে কথাই মীরাকে বলছিলো রানী কারমেতনবাঈ।

সে এসেছিলো মীরার সঙ্গে দেখা করতে।

মীরা বললো,—বনবীর সম্বন্ধে অতোখানি নিশ্চিন্ত বোধ করার কোনো কারণ নেই। আমার মনে হয় না ওরা চুপ করে বসে থাকবে। আপনার সাবধান হয়ে যাওয়া উচিত।

আমার ব্যবস্থাও রাণাজী করেছেন—কারমেতনবাঈ বললো।

বছর পাঁচ আগে মালবের স্থলতানের কাছ থেকে রণথম্ভোর দুর্গ কেড়ে নিয়েছিলো রাণা সাঙ্গা। সেটি রানী কারমেতনবাঈ আর ওর দুই ছেলে কুমার বিক্রমজিৎ ও কুমার উদয় সিংহের জায়গীর হিসেবে নির্দিষ্ট করেছে মহারাণা।

কারমেতনবাঈ বললো,—রাণাজী যখন যুদ্ধে যাবেন, আমরা সেখানে গিয়ে থাকবো। তাহলে এখানে কোনো গোলমাল হলে আমাদের কোনো অস্থবিধে হবে না। আমরা নিরাপদে থাকবো।

মীরা একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।

কারমেতনবাঈ বললো—এখানেও ভবিষ্যতে আর কোনো গণ্ডগোল হবে বলে মনে হয় না। বনবীর ও রানী ধনবাঈয়ের কোনো জোর আর রইলো না।

এসব কিছুই মীরার অজানা নয়। স্থরজমল ও কারমেতন বাঈয়ের ছোটো বোন স্থজাবাঈয়ের সঙ্গে কুমার রতন সিংহের বিয়ের ঠিক হয়েছে। রাণা সাঙ্গা যদি হঠাৎ মারা যান তাহলে ধনবাঈ আর রাজপ্রতিনিধি হতে পারবে না। নাবালক নতুন রাণার নামে রাজ্য শাসন করবে প্রধান মন্ত্রী স্থরজমল। এ ছাড়া, অম্বরের এক রাজকন্যার সঙ্গেও রতন সিংহের বিয়ের কথাবার্তা হচ্ছে। তাহলে স্থরজমলের সঙ্গে হাত মেলাবে অম্বরের পৃথ্বিরাজও। রাঠোরপক্ষের হাতে কোনো ক্ষমতা থাকবে না।

বিক্রমজিত কেমন আছে?—জিজ্ঞেস করলো মীরাবাঈ।

কারমেতনবাঈ একটু উদাস হয়ে গেল। গুজরাটের দরবার থেকে ওর

খবর আগে নিয়মিত। কিন্তু বিক্রমজিত এখনো খুব ছোটো। সবে মাত্র সাতে পড়লো। মায়ের মন বিচলিত থাকে তার জন্যে।

দু'বছরের ছেলে উদয় সিংহ ও তার কিছু বড়ো রাজকন্যা উদাবাঈকেও সঙ্গে করে এনেছিলো কারমেতনবাঈ। ওরা খেলা করছিলো একটু দূরে। সেদিকে তাকালো কারমেতনবাঈ। তারপর বললো,—রাণাজী চেষ্টা করেছেন যাতে বিক্রমজিতকে মেবারে ফিরিয়ে আনা যায়।

—সুলতান মুজফ্‌ফর শাহ ওকে ছাড়তে রাজী হবেন?

—সুলতানের সঙ্গে শাহজাদা বাহাদুর শা'র মনোমালিন্য চলছে। যদি রাণাজী শাহজাদাকে সাহায্য করেন তাহলে সুলতানের অসুবিধে হতে পারে। তেমন একটা ভয় সুলতান মুজফ্‌ফর শা'র আছে। তাই রাণাজীকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যে হয়তো শেষ পর্যন্ত পাঠিয়ে দেবেন বিক্রমজিতকে।

—হঁ্যা, ওর তাড়াতাড়ি ফিরে আসাই ভালো। শুনেছি কাবুলের শাহ বাবর হিন্দুস্থানে আসছেন। রাণাজী হয়তো বেশীদিন চিতোরে থাকতে পারবেন না নিশ্চিন্ত হয়ে।

কারমেতনবাঈকে একটু বিষণ্ণ দেখালো। বললো,—উনি বলেছেন, এবার যুদ্ধে গেলে উনি আর আমাকে সঙ্গে নেবেন না। আমি, বিক্রমজিত, উদয় আর আমার মেয়ে উদা, আমরা চারজন চলে যাবো রণথম্ভোর।

হঁ্যা, আপনাদের এখানে না থাকাই ভালো,—মীরা সায় দিলো,—রানী ধনবাঈ আর বনবীর আপনাকে সুনজরে দেখে না।

আপনিও কি এখানে নিরাপদে থাকতে পারবেন?—কারমেতনবাঈ জিজ্ঞেস করলো।

মীরা হেসে উত্তর দিলো,—আমার কোনো ক্ষতি করার চেষ্টা ওরা করবে কেন? কি লাভ ওদের? নিজের মতো একলা থাকি গিরধরজীকে নিয়ে।

—আপনার উপর ওদের একটা প্রবল আক্রোশ আছে।

—কেন?

—আপনি চিতোরগড়ের সমস্ত ঘটনা জানিয়ে খবর পাঠিয়েছিলেন রাণাজীর কাছে।

—ওরা জানে?

—সবাই জানে। অবশ্যি যদ্দিন রাণাজী বেঁচে আছেন, কেউ কিছুই বলার সাহস পাবে না।

আমার কোনো ক্ষতি ওরা করতে পারবে না,—মীরা উত্তর দিলো।

কারমেতনবাঈ একটু অবাক হয়ে তাকালো। কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না। কিছুক্ষণ পরে বললো,—আচ্ছা, রাণাজী তো একবারও আসেন নি আপনার মহলে।

—রাণাজীর কারো কাছে যাওয়া তো রেওয়াজ নয়।

—কিন্তু আপনার মহলে আগে তো দু-চারবার এসেছেন।

—গিরধরজীকে প্রণাম করতে এসেছিলেন।

—এবার তো আসেন নি।

—যখন প্রয়োজন হবে নিশ্চয়ই আসবেন।

—কিন্তু সময় অনেক বদলে গেছে মীরাজী।

—সে রাণাজী বুঝবেন। আমি তা নিয়ে ভাববো কেন?

কারমেতনবাঈ বললো—আপনার জন্যেও রাণাজীর ভাবনা কম নয়। আর সে জন্যেই তিনি এখানে আসছেন না।

কেন?—মীরা অবাক হোলা।

কারমেতনবাঈ গলার আওয়াজটা একটু খাটো করলো। বললো,—আপনি জানেন না? রাওলার রাজপুতানীদের মধ্যেও বনবীরের অনেক চর আছে। তাদের কড়া নজর আমার মহলের উপর, ঝালীরানীর মহলের উপর, আপনার মহলের উপর। রাণাজী যদি এখানে আসেন, তাহলে আবার নানারকম কথা উঠবে। অন্য পক্ষ মনে করতে পারে যে আপনার সঙ্গে পরামর্শ করছেন রাণাজী। আর আপনি যে আমারই পক্ষে, রানী ধনবাঈয়ের পক্ষে নন, এটাই তো সবার ধারণা। রাণাজী চান না যে, আপনি রাওলার এসব জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েন, আপনার কোনো শত্রু সৃষ্টি হয়।

মীরা হাসলো। বললো—নতুন করে আর শত্রু কি হবে। তা ছাড়া, আমি তো কাউকে আমার শত্রু বলে মনে করি না। আমার সঙ্গে তো কারো শত্রুতা নেই।

কারমেতনবাঈ চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর জিজ্ঞেস করলো—রতন সিংহ যখন রাণা হবে আপনার অসুবিধে হবে না?

—কিচ্ছু না।

কারমেতনবাঈ একটু অবাক হয়ে তাকালো। তারপর গলা নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—আচ্ছা, যদি রতন সিংহ রাণা না হয়ে বিক্রমজিত রাণা হয়?

মীরা হেসে বললো,—ও তো একেবারে ছেলেমানুষ। ও বড়ো হতে হতে আমি বুড়ো হয়ে যাবো।

যদি সে অল্প বয়সেই রাণা হয়?—কারমেতনবাঈ খুব মৃদু গলায় বললো, —তাহলে তো রাজপ্রতিনিধি হবেন আমার দাদা সুরজমল। তখন আপনি যা সম্মান পাবেন, রতন সিংহ রাণা হলে তো পাবেন না।

মীরা প্রথমটা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর আবার হেসে উত্তর দিলো,—যেই রাণা হোক, আমার কাছে সবাই সমান। মহারাণাজী যাকে টিকায়েত মনোনীত করেছেন, সেই রাণা হবে।

কারমেতনবাঈ একটু যেন ক্ষুব্ধ হোলো। বললো,—আপনি কিন্তু রতন সিংহের পক্ষ নেন নি। রাণাজীর কাছে গোপনে খবর পাঠিয়েছিলেন।

মীরা আবার গম্ভীর হোলো। তাকিয়ে দেখলো কারমেতনবাঈয়ের দিকে। তারপর উত্তর দিলো—আমি কারো পক্ষে বা বিপক্ষে নই। আমি দেখেছিলাম একটা অন্যায় হতে চলেছে। একটা হীন চক্রান্ত করে কতকগুলো লোক এ রাজ্য নিজেদের কব্জায় আনতে চাইছে। আমি সেদিন গভীর রাত্রে ধাত্রী পান্নার কান্না শুনেছিলাম। আমি রক্তের দাগ দেখেছিলাম বনবীরের তলোয়ারে। আমি মনে করেছিলাম, মহারাণাকে খবর দেওয়া আমার কর্তব্য। সেদিন রাত্রে আমি উদাবাঈকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এই মহলে। আমি হাতে তলোয়ার তুলে নিয়েছিলাম। আমি রাজপুতানী, প্রয়োজন হলে যে কোনোদিন আবার তলোয়ার ধরবো অন্যায়ের বিরুদ্ধে।

একটু থামলো মীরা। তারপর খুব মৃদু গলায় বললো,—তবে কে রাণা হবে না হবে, সে ব্যাপারে আমার বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই।

কারমেতনবাঈয়ের মুখ অন্ধকার হয়ে গেল।

তখন বিকেল পড়ে আসছে। ঝরোকা দিয়ে ঘরের ভিতর এসে পড়েছে পশ্চিমের রোদ্দুর। উদাবাঈ আর কুমার উদয় খেলতে খেলতে আঙিনার ওদিকে চলে গেছে।

কারমেতনবাঈ বললো,—আপনাকে আমাদের দিকে পেলে চিতোরের ইতিহাস অন্য রকম হয়ে যেতে পারতো।

মীরা হাসলো। তারপর উত্তর দিলো,—হিন্দুস্তানের সাধারণ মানুষের ইতিহাস নিয়ে আমার ভাবনা আরো অনেক বেশী। সে ইতিহাস নতুন মোড় নিচ্ছে।

॥ সতেরো ॥

দেখতে দেখতে কেটে গেল আরো দুটো বছর। পনেরো শ' চব্বিশ থেকে পনেরো শ' পঁচিশ পেরিয়ে পনেরো শ' ছাব্বিশ।

মীরা আর বেরোয় নি নিজের মহল থেকে। রানী ধনবাঈয়ের সঙ্গে তো কোনো যোগাযোগই ছিলো না। মীরাকে নিজের দলে পায় নি বলে রানী কারমেতনইবাঈও বিরূপ হয়ে উঠেছে ওর উপর। সেও আর আসে না।

আগে মাঝে মাঝে রাজমাতা ঝালীরানীর কাছে যাওয়া যেতো। কিন্তু কিছুকাল আগে তিনিও মারা গেছেন। রাওলায় আর কারো সঙ্গে মীরার অন্তরঙ্গতা নেই।

এই দু-বছর রাণা সাঙ্গার সঙ্গেও দেখা হয়নি। চিতোরগড়ে ফিরে আসার পর চার বছরের মধ্যে একদিনও না।

রাণার ফুরসত নেই একথা মীরা জানতো। সারা উত্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল। মেবার রাজ্যের ভেতরও তাই। সজাগ সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হচ্ছে বাইরের পরিস্থিতির উপর। যে কোনো মুহূর্তে আবার যুদ্ধের দামামা বেজে উঠতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি সম্বন্ধেও সজাগ থাকতে হচ্ছে। রাণার শত্রু অনেক, যারা রাণাকে সরিয়ে সিংহাসনে বসাতে চায় যুবরাজ রতন সিংহকে। আসলে তাকে সামনে রেখে ক্ষমতা অধিকার করতে চায় বনবীর সিংহ, রাণা সাঙ্গার বড়ো ভাই রাণা পৃথ্বিরাজের ঔরসজাত জারজ সন্তান।

কিন্তু যুবরাজ রতন সিংহের মামা কুমার মালদেবের উচ্চাভিলাষ আরো রঙীন। সে মারওয়াড়ের অধিপতির জ্যেষ্ঠপুত্র। এখন চিতোরগড়ে আছে, কিন্তু মারওয়াড়ের সিংহাসন একদিন সেই পাবে। রতনসিংহের সেই ব্যক্তিত্ব নেই রাণা সাঙ্গার মতো। মালদেব ভাবছে নিজের ভাগ্নে রতন সিংহকে মেবারের সিংহাসনে বসিয়ে তাকে নিজের মুঠোয় রাখতে পারলে রাজপুত রাজ্যগুলির মধ্যে সব চাইতে ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে মারওয়াড় রাজ্য।

উত্তর ভারতে অরাজক অবস্থা। লোদীদের শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে। কাবুলের বাদশাহ বাবর এর মধ্যে কয়েকবার এসে হানা দিয়ে গেছে।

যদি এখন রাণা সাঙ্গাকে সরিয়ে দেওয়া যায়, কে জানে হয়তো কুমার মালদেবের দখলেই চলে আসবে সারা উত্তর ভারত।

ওর মনের কথা বোধ হয় আঁচ করতে পেরেছিলো রাণা সাঙ্গা। তার নির্দেশে মালদেব আর বনবীরের মধ্যে একটা তিক্ততার সৃষ্টি করলো দরবারের কয়েকজন বিশ্বাসী সর্দার। দু'জনের মনে পরস্পরের উপর একটা সন্দেহ গড়ে উঠলো। এবং তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে রাণাজী নিজের ক্ষমতা সুরক্ষিত করার চেষ্টা করলো।

রাণাজীর ফুরসত নেই মীরার খোঁজখবর করার। কিন্তু মীরার জন্যে নির্দিষ্ট জায়গীরের খাজনাটা নিয়মিত পৌঁছে দেওয়া হয় তার কাছে। এ বিষয়ে মহারাণার স্পষ্ট নির্দেশ, মীরার যেন কোনো কিছুর অভাব না হয়। মীরার গিরধরজীর মন্দিরও তৈরী হয়ে এলো।

কখনো সখনো মীরার সঙ্গে দেখা করতে আসে তার জ্যাঠা বীরমদেবজী, তার বাবা রতন সিংজী।

রতন সিংজীও মেবার দরবারের একজন বিশিষ্ট সর্দার। একদিন তাকে খুব চিন্তিত দেখাচ্ছিলো। সে প্রায় বছর খানেক আগেকার কথা।

বাবর আবার আক্রমণ করেছে। দওলত খাঁ লোদীকে হারিয়ে আবার দখল করেছে পাঞ্জাব।

এর আগের বার ফিরে গিয়েছিলো। এবার আর ফিরে যাবে না,—রতন সিংজী বললো,—আমাদের কাছে যা খবর আছে, তাতে আমাদের ধারণা বাবর এবার দিল্লী ও আগ্রা দখল করার জন্যে তৈরি হয়ে এসেছে।

মহারাণাজী কি আবার যুদ্ধে যাবেন?—মীরা জিজ্ঞেস করলো।

—এখন নয়। আপাতত সুলতান ইব্রাহিম লোদী আর বাবরের মধ্যে ফয়সালা হোক।

—তাতে বড্ড দেরি হয়ে যাবে। বাবর একবার দিল্লী দখল করলে তাকে হিন্দুস্থান থেকে তাড়ানো সহজ হবে না।

—রাণাজীর ইচ্ছে, আগে লোদীদের পতন হোক।

—ওরা দুর্বল হয়ে গেছে। ওদের পতন আগে পরে হবেই। সুতরাং প্রবলতর শত্রুকে আরো ক্ষমতাশালী হতে না দিয়ে তাকেই আগে হারিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত।

—তাতে বিপদ আরো বেশী। বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ করে আমরা যখন ক্লান্ত হয়ে পড়বো, দিল্লী মালব ও গুজরাট একসঙ্গে রাজপুতানা আক্রমণ করতে পারে। ওরা রাণাজীকে বেশী ক্ষমতাশালী হতে দিতে চায় না। এবং এই পরিস্থিতির সুযোগ নেবে মারওয়াড়ের রাঠোরেরা।

—সে রকম বিপদ তো পরেও আসতে পারে।

—নাও আসতে পারে। লোদীদের পতন হলে গুজরাট ও মালব ভয় পেয়ে যাবে। তখন রাণাজী বাবরের সঙ্গে যুদ্ধ করবে। গুজরাট ও মালব মনে মনে খুশি হবে। ইব্রাহিম লোদী ও বাবর দু'জনকেই যদি শেষ করে দেওয়া যায়, গুজরাট ও মালবের পরোয়া মহারাণা করেন না।

কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো মীরা। তারপর বললো,—উনি কি চিরকাল যুদ্ধই করবেন?

এ ছাড়া তো উপায় নেই। দেশের যা অবস্থা, আমাদের শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে কে?

সাধারণ লোকের কি অবস্থা, একবার তাকিয়ে দেখেছে কেউ?—মীরা জিজ্ঞেস করলো।

করের বোঝা বেড়ে যাচ্ছে দিনের পর দিন। সবাই বলছে বড়ো রকমের একটা যুদ্ধ আসন্ন। ব্যাপারীরা খাদ্যশস্য বাজারে ছাড়ছে না, তুলে রাখছে নিজেদের গোলায়। জিনিসপত্রের দাম ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে।

মীরার কথা শুনে একটু বিরক্ত হোলো ওর বাবা রতন সিংজী। সে তলোয়ারের রাজনীতিই বোঝে। তার বেশী কিছু বোঝে না। ভুরু কুঁচকে বললো,—চুপচাপ বাড়ি বসে ভজন পূজন করলেই কি এ সমস্যার সুরাহা হবে?

মীরা উত্তর দিলো,—এ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। এই লড়াই, এই সব যুদ্ধ বিগ্রহ, রাজনীতি,—সব ভুল। এ সবের শেষ নেই। এতে সাধারণ মানুষের কোনো লাভ হয় না।

কিসে লাভ হয়?

মানুষের সঙ্গে মানুষের ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। আমরা নানা রকম শ্রেণীতে ভাগ করে রেখেছি মানুষকে। ধনী দরিদ্র, শক্তিমান দুর্বল, উঁচু নিচু, শাসক শাসিত, এতে শুধু সৃষ্টি হচ্ছে পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস, ঘৃণা, বিদ্বেষ।

রতন সিংজীর মুখ লাল হয়ে গেল। উত্তর দিলো,—তুমি গিরধরজীর সেবা আর পূজো আচ্চা নিয়ে আছো, এসব কথা বলা তোমার পক্ষে খুবই সোজা।

বাবার রাগ দেখে মীরার হাসি পেলো। বললো,—দুনিয়ার আসল রাজা আমার গিরধরজী। আমরা সবাই তাঁর প্রজা। তাঁর চোখে সবাই সমান। এ কথা মনে রাখলে অনেক সমস্যার খুব সহজ সমাধান হয়ে যায়।

সে কথা আগে বাবরকে বোঝানোর চেষ্টা করো,—বললো রতন সিংজী।

কে জানে হয়তো একদিন সে চেষ্টাই আমাকে করতে হবে।

তোমাকে? শোনো মীরা, এ ধরণের কথাবার্তা অন্য কারো সামনে বোলো না। রাওলায় তোমার শত্রু অনেক। ওরা তোমার সম্বন্ধে একটা ভুল ধারণা সৃষ্টি করার সুযোগ পাবে।

বাবার সঙ্গে আর তর্ক করলো না মীরা। শুধু বললো,—আপনি বাবরের খবর রাখেন, লোদীদের খবর রাখেন, যুদ্ধ-বিগ্রহের খবর রাখেন, দিগ্বিজয়ের খবর রাখেন। এটা এখনকার ইতিহাসের একটা খুব সামান্য দিক।

সামান্য?—রত্নসিংজী হাসলো—কেন, রাখবার মতো আরো খবর আছে নাকি, না আরেকটা দিক আছে ইতিহাসের, যার কোনো সন্ধান আমরা রাখি না, যাকে তুমি অসামান্য মনে করো।

গুরু নানকজীর নাম শুনেছেন? চৈতন্যদেবের? কবীরজীর? তুলসী-দাসজীর? এঁদের দিগ্বিজয়ের খবর রাখেন? একদিকে বাবর শাহ্, ইব্রাহিম লোদী, রাণা সাঙ্গাজী। তাঁদেরই পাশাপাশি আরেক দিকে গুরু নানকজী, কবীরজী, চৈতন্যজী। এ তো আপনাদের চোখে পড়ে নি।

গুরু নানকজীকে বাবর শা'র সৈন্যরা বন্দী করে কয়েদখানায় রেখেছিলো।

কিন্তু বাবর শাহ নিজে তাঁকে মুক্তি দিয়ে শ্রদ্ধা ও সৌজন্য দেখিয়েছেন।

তুমি কি করে জানলে?

কিছু খবর আমিও পাই।

নিজের জায়গীর থেকে যে টাকা মীরা পায়, মীরা তার সবটাই খরচা করে দানধ্যানে, অতিথিসেবায়। তার নিজের জীবন অত্যন্ত সাদাসিধে। এখন তো একেবারে সন্ন্যাসিনীর মতো জীবন, সন্ন্যাসিনীর মতো পোশাক।

মহলের বাইরে গিরধরজীর মন্দিরের কাজ এখনও শেষ হয়নি। তবু সেখানে নানাদেশ থেকে সাধু সন্ন্যাসীরা আসে। তাদের সেবাযত্ন করা হয় মীরার জায়গীরের আয় থেকে। মাঝে মাঝে তাদের নিয়ে ভজনের আসর বসে। গীতাপাঠ হয়, ভাগবত পাঠ হয়, ধর্ম আলোচনা হয়। তাতে আজকাল খোলাখুলি যোগ দিচ্ছে মীরাও।

এতে রাওলার অনেকেরই আপত্তি। মীরা সিসোদিয়া রাজবংশের বধু। সে কেন বেরোবে মহলের বাইরে, সে কেন বাইরের লোকের সঙ্গে এক জায়গায় বসে এসব আলোচনা করবে?

এই আপত্তি মীরাকে যারা ভালোবাসে তাদেরই। কিন্তু ধনবাঈ, যুবরাজ রত্ন সিংহ, বনবীর সিংহ, কুমার মালদেব, তারা আরো বেশী নজর রাখছে

মীরার উপর। তাদের সন্দেহ, এ শুধু ধর্মকর্মের ব্যাপার নয়, এর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক গোপন উদ্দেশ্য আছে। ওই সব সাধু সন্ন্যাসীর মারফত নানা জায়গায় খবর পায় মীরাবাঈ এবং যোগাযোগ রাখে বিভিন্ন দেশের নানা রকম লোকের সঙ্গে।

এই বৈষ্ণবদের বিশ্বাস কোরো না,—বনবীর বলে যুবরাজ রতন সিংহকে। বাংলার চৈতন্যদেবের আন্দোলন শুধু ধর্মের আন্দোলন নয়, বাংলার সুলতানের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের একটা বিদ্রোহের সূচনা। সুলতান হোসেন শাহ মারা গেছে কয়েক বছর হোলো, এখন সুলতান নসরত শাহ খুব জবরদস্ত, তাই বৈষ্ণবদের আন্দোলন এখন অন্য রাস্তা ধরেছে। পাঞ্জাবে গুরু নানকজীও একটা নতুন সম্প্রদায় গড়ে তোলার চেষ্টা করছেন, যারা রাজা বাদশার কাছে মাথা নোয়াবে না। এদের ওই এক কথা,—দুনিয়ার বাদশাহ হলেন ঈশ্বর। আমরা তাঁরই প্রজা। আমাদের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই। আমরা সবাই সমান। কবীরপন্থীদের সঙ্গে লোদী সুলতানের বিরোধ তো এখানেই।

এতে আমাদের বিচলিত হওয়ার কি আছে?—রতন সিংহ জিজ্ঞেস করলো।

বাদশাহ বাবরের চাইতে এরা আমাদের আরো বড়ো শত্রু। এরা আরো সাংঘাতিক। এরা প্রতিষ্ঠিত রাজশক্তিকে তুচ্ছ করতে চায়। একই আন্দোলন এদেশে করবার পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে মীরা। এবং আমার ধারণা মীরার পেছনে আছেন মহারাণা সাঙ্গা।

রাণাজী? কেন?—অবাক হোলো রানী ধনবাঈ।

বনবীর বললো,—তাঁর সমর্থন না থাকলে এসব কবে বন্ধ হয়ে যেতো। কে কবে শুনেছে যে, রাওলার একজন বিধবা বধূ তার নিজের জায়গীরের রোজগারে হপ্তায় তিন দিন, চার দিন গরীব চাষাভুষোদের খাওয়াচ্ছে। কে কবে শুনেছে যে, একজন সিসোদিয়া কুলবধূ লোক পাঠিয়ে গাঁয়ের লোকদের খোঁজখবর নিচ্ছে, তাদের সাহায্য পাঠাচ্ছে? রাজবংশের বৌ ঝিয়েরা মন্দির গড়ে দেয়, পূজো দেয়, গুরু পুরোহিতকে সিধে দেয়,—ব্যস এই পর্যন্ত। প্রজা সাধারণের মধ্যে দান-খয়রাত হয় শুধু দরবারের নামে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কেন? মীরাকে মানা করেন না কেন আমাদের রাণাজী?

কেন?—একই প্রশ্ন রানী ধনবাঈয়ের মনে, যুবরাজ রতন সিংহের মনে, কুমার মালদেবের মনে।

বনবীর হেসে উত্তর দিলো,—মহারাণা জানেন যে, তাঁর রাজত্ব আর

বেশীদিন নেই। রাণা হবে যুবরাজ রতন সিংহ। তখন প্রজাদের ক্ষেপিয়ে তুলতে হবে রাণার বিরুদ্ধে, দরবারের বিরুদ্ধে। তার জন্যে আমাদের শত্রুদের একটা প্রস্তুতি চলছে মীরাবাঈয়ের মারফতে।

॥ আঠারো ॥

এসব বছরখানেক আগেকার কথা।

মীরাকে নিয়ে নানা রকম আলোচনা হয় রাওলার মধ্যে। কানেও আসে সব কথা। কিন্তু মীরা পরোয়া করে না, কোনো ভাবনা নেই তার মনে।

আমার গিরধরজী আছেন,—মীরা ভাবে,—আর আছে আমার অনুগত সাধারণ মানুষেরা। আমার জীবনে কোনো দুঃখ নেই, আমার আছে অফুরান আনন্দ, তাই আমার কোনো অভিযোগও নেই কারো নামে।

এই সময়টা কাটে নিশ্চিত নির্ভাবনায়। এই কয়েক বছরের মধ্যে মীরা রচনা করেছে অনেক গান। সে সব গান আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে লোকের মুখে মুখে। এখন মীরার অপর্যাপ্ত অবসর। রাসগোবিন্দ, গীতগোবিন্দ কী টীকা, দুটোই লিখে ফেলেছে এরই মধ্যে। পণ্ডিত সাধুসজ্জনের প্রচুর সমাদর পেয়েছে এ দুটি রচনা। আর তৈরি হয়েছে একটি নতুন রাগিণী—।

একদিন খুব রিমঝিম বৃষ্টি।—সচরাচর হয় না। যখন হয়, একটা আশ্চর্য শ্যামলিমায় ভরে যায় চারদিক।

সেদিন অপরাহ্ণে নিজের মহলে গিরধরজীর বিগ্রহের সামনে একাই বসেছিলো মীরা। দুপুরে প্রবল বৃষ্টি হয়ে গেছে। এখনো ঝিরঝির করে পড়ছে অল্প অল্প বৃষ্টি। জলে ধুয়ে চারপাশের আতাগাছগুলোর হাল্কা সবুজ পাতা গাঢ় সবুজ হয়ে গেছে। ব্যাঙের ডাক ভেসে আসছে বাগানের ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে। আকাশ মেঘলা।

ঠিক গিরধরজীর গায়ের রঙ,—ভাবলো মীরা।

আস্তে আস্তে মনের মধ্যে সুরের বন্যা এলো। তানপুরো তুলে নিয়ে মল্লারের আলাপ ধরলো মীরা। মনে হোলো গানের সুর রূপ নিচ্ছে একটা নতুন ভঙ্গীতে।

এ আমার নিজস্ব মল্লার,—ভাবলো মীরা,—এ আমার গিরধরজীর জন্যে।

সুরের সঙ্গে সঙ্গে এলো গানের কলি,—

ঝুক আই বাদরিয়া সাওয়ন কী,
সাওয়ন কী মন ভাওয়ন কী।

শ্রাবণের আকাশ ঘিরে মেঘ ভেসে আসছে, যে শ্রাবণ মনকে মাতায়।

সাওয়ন মে উমগিয়ো মেরো মনওয়া,
ভনক স্থনী হরি আওয়ন কী।

এই শ্রাবণে আমার মন ভরে গেছে। ওই মেঘ দেখে আমার মনেও এসেছে আমার পরম প্রিয়র আসার খবর।

উমড় ঘুমড় চহুঁ দিসি সে আয়ো,
দামন দমক ঝড় লাওয়ন কী—।

চারদিকে ফুলে ফেঁপে আসছে বর্ষার মেঘ। ঘন ঘন বিদ্যুতের শিখা। আর ঝড় উঠছে থেকে থেকে।

নহ্নী নহ্নী বুঁদিয়া মেহা বরসই,
সীতল পওয়ন সোহাওয়ন কী।

ছোটো ছোটো বৃষ্টির ফোঁটা আর অল্প অল্প ঠাণ্ডা হাওয়া। আমার মন ভরে গেছে।

মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর,
আনন্দমঙ্গল গাওয়ন কী।…

আস্তে আস্তে এক সময় গান থেমে গেল।

চারদিকে ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে।

নতুন এক মল্লার,—তীব্র স্থরার মতো একটা মাদকতায় মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে। চোখ বুজে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইলো মীরাবাঈ। কানে আসছে চারদিকের আতাবনের পাতায় পাতায় বৃষ্টির শব্দ, গায়ে লাগছে চঞ্চল হাওয়া। আর মাঝে মাঝে মেঘের গুরু গম্ভীর গর্জন। একটা নতুন গান, চিরন্তন রসে মধুর, তার সঙ্গে যেন মৃদঙ্গের সঙ্গত।

মনে হোলো সন্ধ্যা হয়ে আসছে। মীরা চোখ খুললো আস্তে আস্তে। দেখতে পেলো সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মহারাণা সাঙ্গাজী।

রাণা সাঙ্গা ভেতরে এসে প্রণাম করলো গিরধরজীকে। তারপর মীরার সামনে এসে বসলো।

তোমার গান শুনছিলাম,—বললো সাঙ্গা,—খুব ভালো লাগছিলো। তাই তোমাকে আর ডাকি নি। ঝুক আয়ী বাদরিয়া সাওয়ন কী।—সত্যি মীরা, তোমার গান শুনলে মন উদাস হয়ে যায়। তখন ভাবি, যুদ্ধ বিগ্রহ রাজনীতি এসবের কী অর্থ।

মীরা একটু হাসলো। বললো,—গানের যা অর্থ তাই। এখনকার হিন্দুস্তানের এই আবহাওয়া।

একথা শুনে উদাস হয়ে গেল রাণা সাঙ্গা। বাইরের দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে বললো,—উমড় ঘুমড় চহুঁ দিসি সে আয়ো, দামন দমক ঝড় লাওয়ন কী·········।

খুব মৃদু কণ্ঠে মীরাও গাইলো গানের শেষ পংক্তি,—মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর, আনন্দ মঙ্গল গাওয়ন কী।

অনেকক্ষণ দু'জনেই চুপচাপ।

একসময় রাণা বললো,—মীরা, ইতিহাস হয়তো আমাদের ভুলে যাবে, —আমাকে, বাবরকে, ইব্রাহিম লোদীকে। কিন্তু তোমাকে ভুলবে না। তোমার গানের জন্যেই তোমাকে মনে রাখবে।

না, না,—ঈষৎ আর্ত শোনালো মীরার কণ্ঠস্বর,—শুধু গানের জন্যে আমাকে কেউ মনে রাখুক এ আমি চাই না।

—তাহলে ?

বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো মীরা। মৃদু গলায় উত্তর দিলো,—আমার একটা স্বপ্ন আছে। আমি চাই যে স্বপ্ন সত্যি হোক। আর আমি যে দেখেছিলাম এ স্বপ্ন, সেজন্যেই আমায় মনে রাখুক।

কি স্বপ্ন মীরা ?

সারা দেশ এক। সারা হিন্দুস্তান এক। এ রাজ্য আমার প্রভু সেই পরম ঈশ্বরের রাজ্য। যিনি শাসন করবেন তিনি তাঁর প্রতিনিধি। আমার এ দেশে হিন্দু মুসলমান বলে কিছু নেই, ধনী দরিদ্র বলে কিছু নেই, উঁচু জাত নিচু জাত বলে কিছু নেই। অত্যাচার নেই, উৎপীড়ন নেই। হিংসা নেই, বিদ্বেষ নেই, বিবাদ নেই, যুদ্ধ নেই। আছে শুধু ভালোবাসা।

আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো রাণা সাঙ্গা।

না মীরা। তোমার এ কথা কেউ বুঝবে না। মানুষের মন এখনো তৈরি হয় নি। আরো কয়েক শো বছর লাগবে। হয়তো আরো এক হাজার বছর।

না মীরা। তুমি যে এ স্বপ্ন দেখেছিলে, একথা কেউ মনে রাখবে না। কেউ শুনবে না একথা। যদি এখনকার এরা সবাই জানতে পারে, তোমাকে সুনজরে দেখবে না। এটা বিদ্রোহ, এটা বিপ্লব, এটা প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে একটা প্রচণ্ড প্রতিবাদ।

না মীরা। এরা জোর করে সবাইকে ভুলিয়ে দেবে যে, এ স্বপ্ন তুমি

দেখেছিলে। এরা তোমার সম্বন্ধে অন্য রকম কিংবদন্তী তৈরি করবে। যে ধরণের শান্ত সমাহিত সমাজনিস্পৃহ আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব এরা দেখতে চায়, সে-রকম ভাবেই গড়ে তুলবে একটা অন্যরকম ছবি।

আমি হার মানবো না। আমি সংগ্রাম করে যাবো শেষ পর্যন্ত।

পারবে না মীরা। হেরে যাবে। এত বছর রাজত্ব করার পর আমি এখন বুঝতে শিখছি একটু একটু করে। স্বপ্ন একটা আমারও ছিলো। কিন্তু কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে লড়াই করা বড় কঠিন।

আমি হার মানবো না রাণাজী, আমাকে জিততেই হবে। আজ না হোক কাল। কাল না হোক পরের বছর। কিংবা দশ বছর পরে। একশো বছর পরে। পাঁচশো বছর পরে। হাজার বছর পরে। একদিন না একদিন আমিই জিতে যাবো।

দু'জনেই চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর রাণা সাঙ্গা বললো,—আবার কবে দেখা হবে জানি না। তাই আজ এলাম।

মীরা চোখ তুলে তাকালো।

আবার যুদ্ধে যাচ্ছি—বললো রাণা সাঙ্গা।

বাবরের সঙ্গে ?

রাণাজী মাথা নাড়লো। আস্তে আস্তে বললো,—এটাই আমার জীবনের সব চেয়ে বড়ো যুদ্ধ। সারা দেশের ভবিষ্যত নির্ভর করেছে এ যুদ্ধের উপর।

সাঙ্গাকে যে যেতে হবে এটা মীরা জানতো। কিছুদিন আগে খবর এসেছে, পানিপথের যুদ্ধে বিজয়ী হয়েছে বাবর শাহ। সে যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে সুলতান ইব্রাহিম লোদী। এখন বাবর এগিয়ে যাচ্ছে দিল্লি ও আগ্রার উদ্দেশে।

এবার সৈন্য নিয়ে অভিযান করতেই হবে রাণা সাঙ্গাকে। আর চিতোর-গড়ে বসে থাকা চলবে না। এসময় আক্রমণ করে যদি বাবরকে হারিয়ে দেওয়া না যায়, তাকে আর কেউ ঠেকাতে পারবে না, সারা উত্তরভারত চলে যাবে তার দখলে।

আমার ধারণা যুদ্ধে আপনিই জিতবেন—বললো মীরা,—রাজপুত সেনাবাহিনীর সঙ্গে মোগলবাহিনীর কোনো তুলনাই হয় না।

সাঙ্গা হাসলো। উত্তর দিলো—হ্যাঁ, আয়তনে। কিন্তু আয়তনই সব নয়। ওদের কামান আছে। বন্দুক আছে। আমাদের নেই। আমার দলে অনেকে আছে যাঁরা হয়তো শেষ মুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস বেরোলো মীরার বুক ঠেলে।

রাণা সাঙ্গা বললো,—রানী কারমেতন বাঈ, বিক্রমজিত, উদয় আর উদাবাঈকে পাঠিয়ে দিচ্ছি রণথম্ভোর দুর্গে। আমি এখানে না থাকলে ওরা এখানে নিরাপদ নয়, তুমিও নিরাপদ নও। তুমি কোথায় যাবে বলো। কুম্ভলগড়ে যাবে?

না,—বললো মীরা।

তাহলে মেড়তায় গিয়ে থাকো তোমার জ্যাঠামশায়ের রাজ্যে। সেখানে তোমার জ্যাঠতুতো ভাই জয়মল তোমার দেখাশোনা করবে। সে তো খুব ভালোবাসে তোমায়।

না,—বললো মীরা,—সেখানেও যাবো না।

তাহলে?

আমি এখানে এই চিতোরগড়েই থাকবো।

থাকতে পারবে?

পারবো,—মীরা উত্তর দিলো।

আমার তো মনে হয় না তুমি পারবে,—একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে রাণা সাঙ্গা উত্তর দিলো—আমি যদি না ফিরি তুমি এখানে একেবারেই থাকতে পারবে না। ওরা তোমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করবে। যাই হোক, তোমার যা ইচ্ছে। তবে একটা কথা, খুব সাবধানে থেকো।

॥ উনিশ ॥

ফাল্গুন এসে গেল। তৈরী হয়ে গেছে মীরার মন্দির। গিরধরজীর বিগ্রহকে মহল থেকে বার করে এনে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। মীরা ভেবেছিলো খুব ঘটা করে করবে হোলির উৎসব।

হাওয়ায় নতুন বসন্তের হালকা আমেজ। কিন্তু ফাল্গুনের কয়েকটা দিন যেতে না যেতেই বিষন্নতার ছায়া নামলো। কোনো কিছুতেই মন লাগে না। পূজোয় নয়, গানে নয়, পড়াশুনোয় নয়। শুধু এমনি চুপচাপ বসে থাকতে ভালো লাগে বিগ্রহের সামনে। এবার যেন বড়ো একা মনে হচ্ছে নিজেকে। ছয় বছর হোলো কুমার ভোজরাজ এই পৃথিবীর সব বাঁধন কাটিয়ে চলে গেছে। রানী ঝালীও মারা গেছে বছর তিন হতে চললো। রাণা সাঙ্গাও এখানে নেই। চিতোরগড়ের রাওলায় আর তো কেউ তার আপন হতে পারলো না। বড়ো একা। বড্ড নিঃসঙ্গ।

মীরা তাকালো গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে। পাথরের বিগ্রহের চোখে শুষ্ক দৃষ্টি।

বিরাট বাহিনী নিয়ে যুদ্ধে গেছে মহারাণা সাঙ্গা। এবার মোকাবিলা হবে দিল্লীর নতুন বাদশাহ বাবর শা'র সঙ্গে। তবে শুধু দিল্লীর বাদশাহ, এখনও হিন্দুস্তানের বাদশাহ নয়।

দুবেলা হরকরা আসে খবর নিয়ে। চিতোরগড়ের পুরুষেরা তাদের মুখে খবর শোনে বাইরের দরবার ঘরের সামনে। সে সব খবর অন্য লোকের মুখে মুখে চলে আসে রাওলার ভিতর। যে খবর নিয়ে আসে তাকে ঘিরে ধরে অন্তঃপুরের রাজপুতানীরা। মীরা সেখানে যায় না। মেয়েদের কেউ না কেউ মীরার কাছে আসে, তাকেও খবর শুনিয়ে যায়।

সিক্রির কাছে কানোয়ার ময়দানে ফৌজ নিয়ে মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে বাবর ও সাঙ্গা।

এত বিশাল বাহিনী নিয়ে এ পর্যন্ত যুদ্ধ করেনি কোনো রাজপুত রাজা।

কিন্তু মোগলদের আছে কামান বন্দুক।

সারা রাজপুতানায় একটা অধীর প্রতীক্ষা, একটা বিপুল উৎকণ্ঠা।

চিতোরগড়ে রানী ধনবাঈয়ের মুখ শুকনো। দুবেলা পূজো দিচ্ছে কালীমন্দিরে।

বনবীর সিংহ, কুমার মালদেব, যুবরাজ রতন সিংহ, এদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যায়নি রাণা সাঙ্গা। এরা চিতোরগড়েই আছে। রাণাজী বলেছেন, এদেরই হাতে দেওয়া হোলো চিতোরগড়ের দায়িত্ব, এবং যুবরাজকে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূরে রাখা হয়েছে রাজনীতির প্রয়োজনে।

সবাই এটা লক্ষ করেছে। যুবরাজ ভোজরাজ যখন বেঁচে ছিলো, এমন কোনো যুদ্ধ নেই যেখানে সে যায় নি রাণাজীর সঙ্গে। অনেকে বলাবলি করছে মহারাণা এদের বিশ্বাস করেন না। তাই সঙ্গে নিয়ে যান নি।

বনবীর, মালদেব, রতন সিংহ এদের মুখ পাথরের মতো। মনের ভাব আঁচ করার উপায় নেই। কিন্তু ওদের চোখ উদবিগ্ন।

ওদের মনেও সংঘাত। রাণা যদি যুদ্ধে হেরে যায় কিংবা মারা যায়, মেবার রাজ্যের উপর ঘনিয়ে আসবে এক নিদারুণ সঙ্কট। মোগল বাহিনী যদি এগিয়ে আসে, সিসোদিয়া ফৌজের নেতৃত্ব করার যোগ্যতা যুবরাজ রতন সিংহের নেই। এখানে কারোই নেই।

যদি যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে রাণাজী ফিরে আসে, তাহলে এদের তিনজনের বিপদ কম নয়। মারওয়াড়ের রাঠোরদের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করার ইচ্ছে নেই বলে রাণা সাঙ্গা কুমার মালদেবকে এবার কিছু বলেনি। মেবারের ভিতর

কোনো গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত যাতে না হয়, এজন্যে কিছু বলেনি বনবীরকেও। কিন্তু বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে মোগলদের হিন্দুস্তান থেকে ঠেলে বের করে দিতে পারলে আরো শক্তিশালী হয়ে উঠবে রাণা সাঙ্গা। তখন রাঠোরদের পরোয়া করতে হবে না। শক্তিমানের পেছনে এসে দাঁড়াবে রাজপুতানার অন্যান্য রাজারা। চিতোরের বিরোধীপক্ষের সবাই সুবিধাবাদী। ওরাও রাণার দলে গিয়ে যোগ দেবে। সুতরাং মেবার রাজ্যে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়ার মতো ক্ষমতা বনবীরের থাকবে না।

সবাই জানে রাণা ফিরে এলে কুমার মালদেবকে জোধপুরে ফিরে যেতে হবে। বনবীরকেও দেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে। শোনা যাচ্ছে, মহারাণা নাকি প্রধান মন্ত্রী সুরজমল হাডাকে গোপনে জানিয়েছেন মনের এই বাসনা। কিন্তু কথাটা গোপন থাকেনি। কি করে যেন জানাজানি হয়ে গেছে।

মীরাও জানে।

এত বড়ো চিতোরগড়ে মীরা একেবারে একা। ছোটোরানী কারমেতনবাঈ এখানে নেই, চিতোরগড় ছেড়ে রণথম্ভোর দুর্গে গিয়ে আছে রাণা সাঙ্গা যুদ্ধে যাওয়ার সময় থেকেই। রানী ধনবাঈয়ের সঙ্গে মীরাবাঈয়ের সদ্ভাব নেই। মহারানী কুঁয়রবাঈও নিজেকে একেবারে আলাদা করে নিয়েছেন সবার কাছ থেকে।

কয়েক বছর ধরেই মীরা নিঃসঙ্গ। মহারাণা যুদ্ধে যাওয়ার পর থেকে নিজেকে এবার সত্যি একা বলে মনে হোলো। একেবারে একা, একেবারে আলাদা সবার থেকে। সময় কাটে হয় নিজের মহলে কিংবা গিরধরজীর নতুন মন্দিরে। তবু অনেক কিছুই মীরার চোখে পড়ে। গোপনে কারা যেন আসে বনবীর, রতন সিংহ আর মালদেবের কাছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে চুপি চুপি তাদের মধ্যে আলোচনা হয়।

এক একদিন গভীর রাতে শোনা যায় একজন কি দুজন অশ্বারোহীর ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। দুর্গ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে, অনেক দূরের অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে খট খট শব্দ।

নানারকম কথা বলে রাওলার রাজপুতানীরা। এবং বলে খুব নিচু গলায়, প্রায় ফিসফিস করে।

বনবীর নাকি গোপনে যোগাযোগ করছে বাবর শা'র সঙ্গে। তার কি মতলব বোঝা মুশকিল। হয়তো চিতোরগড় তুলে দিতে চায় বাবরের হাতে।

অতো সহজ নাকি? এখনও তো বেঁচে আছেন রাণা সাঙ্গা।

কিন্তু তিনি যদি যুদ্ধে হেরে যান? যদি ফিরে না আসেন?

রাজপুতানীদের কিসের ভয়? হাসতে হাসতে আগুনে ঝাঁপ দেবে। একি কোনো নতুন কথা নাকি?

মুখে বলছে বটে একথা, কিন্তু দেখা গেল অনেকেই এখন নিয়মিত হাজিরা দিচ্ছে রানী ধনবাঈয়ের কাছে। যাই হোক, মোগলেরা যে চিতোর অধিকার করতে চাইবে একথা কেউ বিশ্বাস করতে চাইছে না। তার অনেক ঝুঁকি। চুনারের কেল্লায় কে এক শের খাঁ আছে। বিহারে তার নাকি প্রচণ্ড প্রতাপ। তার দিক থেকে ভয় আছে বাবর শা'র। বাংলার সুলতান নসরত শা'র ক্ষমতাও কম নয়। মোগলদের কাবুল থেকে হিন্দুস্থানে নেমে আসা এরা কেউ ভালো চোখে দেখছে না। এরাও নাকি তৈরী হচ্ছে বাবরের সঙ্গে লড়াই করার জন্যে।

হয়তো বাবর চাইবে রতন সিংহ রাণা হয়ে বাবরকে কিছু টাকাকড়ি দিক। ওর তো অনেক টাকার দরকার। এবং এটুকু আশ্বাস দিক যে বাবর শাহ শের খাঁ নসরত শাহ এদের সঙ্গে লড়াই করতে গেলে রতন সিংহ মালদেব এরা দেখবে যাতে রাজপুতেরা পেছন থেকে আক্রমণ না করে। তাহলে এরা যদি রাণা সাঙ্গাকে সিংহাসন থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে, তাদের সব রকম ভাবে সাহায্য করবে বাবর শাহ।

এরকম একটা বোঝাপড়া যদি হয়ে যায়, তাহলে আসবে না কোনো মোগল ফৌজ, আগুনে ঝাঁপ দিতে হবে না কোনো রাজপুতানীকে। যুবরাজের মা মেজোরানী ধনবাঈয়ের কৃপাদৃষ্টি থাকলে চিতোরগড়ের রাওলার কোনো মহিলার কোনো অসুবিধে হবে না।

একজন এসে একদিন বললো—মীরাবাঈও যদি একবার দেখা করতে যায় রানী ধনবাঈয়ের সঙ্গে, উনি খুশী হবেন।

মীরা একটু হাসলো। কোনো উত্তর দিলো না।

আরেকজন এসে বললো,—মীরাবাঈ এ পর্যন্ত একবারও মেজোরানীর সঙ্গে দেখা করেনি বলে উনি একটু চটেছেন।

তখনও মীরা হাসলো। উত্তর দিলো না।

মহলের দু-চার পাঁচজন মাঝে মাঝে এখনও আসে মীরার কাছে। কিন্তু তাদের মনে বড়ো ভয়। বেশীক্ষণ থাকতে চায় না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে। বেরোবার সময় চকিত দৃষ্টিতে এদিক ওদিক তাকায়, কেউ লক্ষ করেছে কিনা যে ওরা এসেছে মীরার মহলে।

দু একজন বললো, মীরাবাঈ, আপনি মেড়তায় চলে যান আপনার ভায়ের কাছে।

কেন?

এখানে আপনি নিরাপদ নন।

মীরা সহজ ভাবে জিজ্ঞেস করে, এখানে আমার ভয়ই বা কিসের? আমার সঙ্গে তো কারো শত্রুতা নেই।

যুবরাজের ধারণা, আপনি ছোটোরানী কারমেতনবাঈয়ের পক্ষে। যদি কোনোদিন গদি নিয়ে গণ্ডগোল বাধে, যদি সিংহাসন দাবী করেন কুমার বিক্রমজিত, আপনি তার সঙ্গে যোগ দেবেন। তখন মেড়তার রাঠোরেরাও দাঁড়াবে তার পেছনে, এবং সঙ্গে থাকবে মেবাররাজ্যের সেই সব সর্দার যাঁরা ছিলেন কুমার ভোজরাজের অনুগত। মেবারের সাধারণ প্রজারা আপনাকে খুব শ্রদ্ধা করে, ভালোবাসে। যুবরাজ রতন সিংহের ধারণা, আপনি কুমার বিক্রমজিতের দলে যোগ দিলে মেবারের সাধারণ প্রজারাও তার পক্ষে যাবে।

কিন্তু এসব কথা শুনে মীরা শুধু অল্প অল্প হাসে। মীরা বলে,—গদি নিয়ে এসব ঝগড়া বিবাদে আমার কোনোরকম আগ্রহ নেই এবং চিতোরগড় ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।

না মীরাবাঈ, আপনি চলে যান। যুবরাজ মনে মনে আপনাকে ভয় পান। হাতে ক্ষমতা এলে তিনি নানারকম ভাবে আপনার অসুবিধে সৃষ্টি করবেন।

মীরা তাকালো গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে। ভাবলো,—না, আমার কোনো বিপদ হবে না, কোনো অসুবিধে হবে না, হতে পারে না।

এখানে গিরধরজীর মন্দির। এখানেই থাকতে হবে আমাকে। এখানে শেষ নিঃশ্বাস ফেলেছেন আমার স্বামী কুমার ভোজরাজ। শেষদিন পর্যন্ত আমাকে থাকতে হবে এখানেই।

কিন্তু এসব নানারকম কথা এখন উঠছে কেন?—গুমরে ওঠে মীরাবাঈয়ের মন।—সবই কি শেষ হয়ে গেছে নাকি? কেন সবার মনে এই হতাশা? কেন সবার মনে একটা পরাজয়ের মনোভাব?

রাণা সাঙ্গা আর বাবরের মধ্যে তো যুদ্ধ এখনও আরম্ভই হয় নি। কেন সবাই ধরে নিচ্ছে যে রাণাজী হেরে যাবেন এই যুদ্ধে? উনি তো আজ পর্যন্ত কোনো যুদ্ধে হেরে আসেন নি।

মীরা বুঝে নিয়েছে। এর পেছনে আছে বনবীর সিংহ। চিতোরগড়ের

আবহাওয়া সে বিষিয়ে দিয়েছে। তার দলের লোকেরা নানারকম গুজব সৃষ্টি করে হতাশার আবহাওয়া তৈরী করে নষ্ট করে দিয়েছে সবার মনের জোর। বনবীরের চর পুরুষ মেয়ে দুইই আছে, মংলের বাইরেও আছে, ভেতরেও আছে।

সবাই শুধু একটি কথাই বলছে। মোগলদের কামান আছে, বন্দুক আছে। দূর থেকে ওরা শত্রু ঘায়েল করতে পারে, শত্রুর কাছে এসে যুদ্ধ করতে হয় না। রাজপুতেরা যতোই সাহসী হোক, বেপরোয়া হোক, এই নতুন অস্ত্রের মোকাবিলা করার ক্ষমতা ওদের নেই। লড়াইয়ের ময়দানে রাজপুত মরবে ঝাঁকে ঝাঁকে, মোগল মরবে দু-চার জন।

রাজপুত বাহিনী এক বিরাট বাহিনী। মোগলদের থেকে ওরা সংখ্যায় অনেক বেশী, অনেক অনেক বেশী। কিন্তু তাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ দলাদলি। অম্বর রাজ্যের সঙ্গে বুঁদী রাজ্যের ভাব, সিসোদিয়াদের অনেকের সেটা পছন্দ নয়। রাঠোররা মন থেকে চায় না মেবারের সাফল্য। কারণ, রাণা সাঙ্গা যুদ্ধে জিতলে রাজপুতানায় ওর প্রভাব প্রতিপত্তি অনেক বেড়ে যাবে। রাণাজী জোধপুরের রাঠোরদের একেবারে বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করে শুধু মেড়তিয়া রাঠোরদের। বেশ, তাদেরই নিয়ে যুদ্ধ করুক রাণাজী। দেখা যাক, কিভাবে যুদ্ধে জেতে।

চিতোরগড়ে শোনা যাচ্ছে, রাজপুত সর্দারদের কাউকে কাউকে নাকি ঘুস দিয়ে কিনে নিয়েছে বাবর শাহ। ওরা রাণার পক্ষে থাকলেও শেষ পর্যন্ত হয়তো লড়বে না।

এসব কথা চিতোরগড়ে সবার মুখে মুখে ফিরছে। মেবার রাজ্যে সাধারণ প্রজারাও আলোচনা করে এসব কথা।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার আগেই যে আমরা যুদ্ধে হেরে যাচ্ছি,—মীরা ভাবলো। চারশো বছর আগেও কি এরকমই পরিস্থিতি হয়েছিলো, যখন পৃথ্বিরাজ চৌহান হেরে গিয়েছিলো মহম্মদ ঘোরীর কাছে?—মীরা জিজ্ঞেস করলো নিজেকে।

গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে তাকালো। বিগ্রহের শান্ত দৃষ্টি। হাতে বাঁশি।

তুমি না বলেছিলে, সম্ভবামি যুগে যুগে? তুমি এখন কোথায়?

নিশ্চল নিস্তব্ধ বিগ্রহ। মীরার মনের মধ্যেও কোনো উত্তর নেই।

এভাবেই কেটে যাচ্ছে দিনের পর দিন। মনে কি রকম একটা শূন্যতা, শুধু একটা বিষাদ।

আমরা হেরে গেছি,—মীরা ভাবলো,—আমরা বার বার হেরে যাচ্ছি। তলোয়ার হাতে নিলেই কেন হেরে যায় আমাদের যোদ্ধারা ?

কিন্তু হার মানলে তো চলবে না। জিততেই হবে, যে করেই হোক।

ওরা পারবে না,—মীরা ভাবলো,—কিন্তু আমি পারবো। শুধু তলোয়ার নয়, শুধু রাজনীতি নয়, অন্য রাস্তা খুঁজে বার করতে হবে।

যুদ্ধ তো রাজায় রাজায়। সাধারণ প্রজাদের কি ? ওরা সাধারণ ভাবে একটু সুখ একটু শান্তি নিয়ে দুবেলা খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে চায়। তাদেরই জন্যে চাই শান্তির রাজত্ব। কিন্তু কি ভাবে, গিরধরজী, কি ভাবে ?

দিনরাত মীরা শুধু ভাবছে। মীরা আনমনা। মীরা বিষণ্ন। যারা আসে, শুধু ওরাই কথা বলে। মীরা চুপ করে থাকে।

যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেছে মীরাবাঈ।

সাংঘাতিক যুদ্ধ।

যুদ্ধে আমরা হেরে গেছি।

রাইসিনের রাও সিলহাদি বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, নাম শোনা যাচ্ছে আরো অনেকের।

আমি জানি,—ভাবলো মীরা।

রাণাজী খুব জখম হয়েছেন। তাঁকে অচেতন অবস্থায় তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

মীরা ঠোঁট কামড়ে চোখের জল সামলে নিলো কোনো রকমে।

হাজারে হাজারে মারা পড়েছে রাজপুত সৈন্য।

আমি জানি।

রাজপুতেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে।

আমি জানি আমি জানি আমি জানি।

পালিয়ে গেছেন আপনার জ্যাঠামশাই মেড়তার রাও বীরমদেবজীও।

কোথায় গেছেন তিনি ?

রাণাজীর সঙ্গে আশ্রয় নিয়েছেন রণথম্ভোর দুর্গে।

মীরা একটু নিশ্চিন্ত বোধ করলো,—শুধু বীরমদেবের জন্যে নয়, রাণা সাঙ্গার জন্যেও। রণথম্ভোর দুর্গে আছেন ছোটোরানী কারমেতনবাঈ, কুমার বিক্রমজিত, কুমারী উদাবাঈ, এবং ছোটোকুমার উদয়। আছে সব বিশ্বস্ত সর্দারেরা। ওখানে রাণার কোনো ভয় নেই। রণথম্ভোর দুর্গে রাণা নিরাপদ। সে দুর্গ দখল করা অসম্ভব। বাবর শাহ সেদিকে যাবে না।

আরো একটা খবর আছে বাঈ-সা'।

মীরাবাঈ ফিরে তাকালো ওদের দিকে।—বলো।

কিন্তু ওরা ইতস্তত করেছিলো। মুখ ফুটে বলতে পারছিলো না। তবু বলতে তো হবেই। শেষ পর্যন্ত বললো। খুব মৃদু গলায় জল ভরা চোখে মাথা নিচু করে বললো।

বীরমদেবের ছোটো ভাই রতন সিংজী,—মীরার বাবা,—উনিও বাবর শা'র মোগল সৈন্যদের হাতে মারা গেছেন কানোয়ার যুদ্ধে।

রতন সিংজী। মেড়তা রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রাও দুদাজীর ছোটো ছেলে। নিজের বিশাল জায়গীর নিয়ে জীবনটা সুখে কাটিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু সারাটা জীবন ছায়ার মতো রইলো রাণা সাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে এবং প্রত্যেকটা যুদ্ধে। রাণার মতো তারও স্বপ্ন ছিলো, সারা উত্তর ভারত এক শক্তিশালী রাজ্য হবে। বিদেশ থেকে কেউ এসে সেটা আর দখল করতে পারবে না। প্রাণ দিলো সেই আদর্শের জন্যে, তার প্রিয়তম নেতা ও বন্ধু রাণা সাঙ্গার জন্যে।

মীরা বাবার সঙ্গ বিশেষ পায়নি। সেই ছেলেবেলায় মা বীরকুমারী মারা যাওয়ার পর থেকে সে ওর দাদু রাও দুদাজীর কাছেই মানুষ। তবু এক আদর্শের সূত্রে তাদের সবার জীবন বাঁধা—কুমার ভোজরাজ, রাণা সাঙ্গা, রতনসিংজী, বীরমদেব, মীরা নিজে।

মীরার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো।

॥ কুড়ি ॥

তারপর এক সময় চোখের জল মুছে নিজের গোমস্তাকে ডাকিয়ে এনে বললো,—মেড়তায় আমার ভাই জয়মলকে খবর পাঠাও। ওকে অনেকদিন দেখিনি। বড্ড দেখতে ইচ্ছে করছে।

না, মীরাবাঈ, না,—বললো মহলের অন্তরঙ্গ রাজপুতানীরা,—জয়মলকে এখানে আসতে বলবেন না। যুবরাজ রতন সিংহ, বনবীর সিংহ, কুমার মালদেবজী, এরা কেউ পছন্দ করে না মেড়তিয়া রাঠোরদের। ওদের সঙ্গে ভীষণ শত্রুতা। জয়মল এখানে এলে বিপদে পড়তে পারে।

মীরাবাঈয়ের চোখে বিদ্যুৎ খেলে গেল। বললো,—আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি, আমার ভায়ের কোনো বিপদ হতে পারে না চিতোরগড়ে।

কে যেন যুবরাজ রতন সিংহকে গিয়ে বললো। রতনসিংহ, বনবীর, মালদেব, এরা খুব জমিয়ে গল্প করছিলো। আজকাল শুধু ওদেরই মুখে হাসি।

কে আসবে?—গর্জে উঠলো যুবরাজ রতন সিংহ,—জয়মল? মেড়তার রাজা বীরমদেবের ছেলে জয়মল? না, না, কিছুতেই না।

আ হা, তুমি ক্ষেপে উঠছো কেন?—বনবীর বললো,—আসতে দাও না। সে আসবে ওই মেড়তানীকে নিয়ে যেতে।

কোথায় নিয়ে যাবে?

রণথম্ভোর দুর্গে, রাণাজীর কাছে, ছোটোরানী কারমেতনবাঈয়ের কাছে।

তার আগেই সব শেষ হয়ে যাবে,—চোখ টিপে বললো বনবীর।

মালদেব বললো,—মীরাবাঈ এখনই সরে যাবেন বলে মনে হয় না।

কেন?

ওপক্ষের অন্য মতলব আছে। মীরাবাঈ চিতোরগড়ে থাকলেই ওদের সুবিধে। ওদের ধারণা এই মেড়তানীর মারফতেই এখানকার প্রজাদের ওরা দলে টানতে পারবে।

মালদেব হেসে উঠলো। রতন সিংহ হাসলো না। দাঁতে দাঁত ঘসে বললো—বেশী বাড়াবাড়ি করলে ওই মেড়তানীকে তলোয়ার দিয়ে টুকরো টুকরো করে নদীর জলে ভাসিয়ে দেব।

বনবীর রতন সিংহের কাঁধে হাত রাখলো। বললো,—অতো ভাবনা কিসের? আমি তো মরে যাইনি।

রতন সিংহ শান্ত হোলো। উত্তর দিলো,—বেশ, আসতে দাও জয়মলকে।

মীরার কাছ থেকে খবর পেতেই জয়মল চলে এলো চিতোরগড়ে। দুর্গের দরজায় কুমার মালদেব তাকে আটকালো। বললো,—মীরাবাঈয়ের কাছে যাওয়ার আগে যুবরাজ রতন সিংহের কাছে গিয়ে অভিবাদন জানাতে হবে।

কেন?

তাই তো রেওয়াজ।

আমিও তো একটি রাজ্যের যুবরাজ। রতন সিংহ আমায় স্বাগত জানাতে এখানে এলেন না কেন? সেটাও তো রেওয়াজ।

মালদেবের মুখে বাঁকা হাসি দেখা দিলো।—মেড়তা আবার একটা রাজ্য। মেবারের সঙ্গে তার তুলনা?

আমার সঙ্গে কথা বলবে মুখ সামলে,—জয়মল ঝনঝন করে তলোয়ার বার করলো।

সেদিন চিতোরগড়ে এমনিতে খুব হইচই। বাবর শাহ চান্দেরী দখল

করেছে। তার সঙ্গে আবার যুদ্ধ করার জন্যে রণথম্ভোর থেকে রওনা হয়েছে রাণা সাঙ্গা।

চারদিকে বেশ ভিড়। ইতিমধ্যে রটে গেছে যে মেড়তার টিকায়েত কুমার জয়মল এসেছে চিতোরগড়ে। সবাই একটু দূরে দূরে থমকে দাঁড়িয়ে দেখলো মারওয়াড়ের যুবরাজ মালদেব আর মেড়তার যুবরাজ জয়মল দুজন চোখ লাল করে দুজনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। দুজনেরই হাতে খোলা তলোয়ার।

কে যেন ফিসফিস করে বললো,—কী আশ্চর্য। দুজনের গায়ে একই রক্ত। জয়মলের ঠাকুর্দা রাও দুদাজীর বাবা মারওয়াড়ের রাও জোধা। সেই রাও জোধার আরেক ছেলে রাও সুজার নাতি রাও গাঙ্গার ছেলে মালদেব।

কী হোলো রাজপুতদের,—আরেকজন বললো নিচু গলায়,—নিজেরা নিজেদের মধ্যে লড়াই করেই শেষ হয়ে যাবে যদুবংশের মতো।

খবর চলে গেছে যুবরাজ রতন সিংহের কাছে।

বেশ তো,—রতন সিংহ হাত কচলিয়ে বললো,—খেলাটা জমেছে ভালো।

বনবীর বললো,—ঠিকই করেছে মালদেব। জয়মল আগে এসে অভিবাদন জানাবে তোমাকে। তারপর দেখা করতে পারবে মীরাবাঈয়ের সঙ্গে।

কি হে মেড়তিয়া রাঠোর,—মালদেব বললো,—চিতোরগড়ে ঢুকতে চাও লড়াই করে?

শান্ত উত্তর দিলো জয়মল,—তুমি তো দেখছি এখানে দুর্গতোরণের পাহারাদারের চাকরি নিয়েছো। তোমার সঙ্গে কি লড়বো? লড়াই হয় সমানে সমানে। তোমার মালিক যুবরাজ রতন সিংহকে পাঠিয়ে দাও।

—খবরদার, মুখ সামলে।

তলোয়ার উঁচিয়ে এগিয়ে এলো কুমার মালদেব। জয়মলও এগিয়ে গেল এক পা।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে দেখা গেল আশপাশের লোকজনের মধ্যে একটা চাপা চাঞ্চল্য। ওরা সসম্ভ্রমে সরে পথ করে দিচ্ছে।

—জয়মল! মালদেব!

দুজনেই অবাক হয়ে ফিরে তাকিয়ে দেখলো পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মীরাবাঈ।

তলোয়ার নামাও,—মীরা বললো গম্ভীর গলায়,—দুজনেই।

জয়মল আর মালদেব আস্তে আস্তে তলোয়ার খাপে পুরলো।

মীরা মালদেবকে বললো,—কি রেওয়াজ মানতে হবে না-হবে সেটা ওকে জানানোর অধিকার শুধু আমার। আর কারো নয়।

তারপর জয়মলের দিকে ফিরে বললো,—এসো আমার সঙ্গে মহারানী কুঁয়রবাঈয়ের কাছে। কুমার রতন সিংহকে খবর দেওয়া হয়েছে। সেও সেখানে আসবে। তারপর তার সঙ্গে আমরা যাবো রানী ধনবাঈয়ের কাছে।

আবার তাকালো মালদেবের দিকে,—এটাই রেওয়াজ। তবে যদি রাণাজী এখানে থাকতেন, আগে তাঁর কাছেই যেতে হোতো। মেড়তা রাজ্য খুব ছোটো হতে পারে, কিন্তু মেড়তার যুবরাজ আর মেবারের যুবরাজ দুজনের মর্যাদা সমান সমান, এটা মনে রেখো। এসো জয়মল।

দেখাশোনার পাট শেষ হতে মীরা জয়মলকে নিয়ে এলো নিজের মহলে। জয়মল ওর জ্যাঠতুতো ভাই হলেও আপন ভায়ের চেয়েও বেশী। দুজনে এক সঙ্গে বড়ো হয়েছে ছেলেবেলা থেকে।

মীরার চোখ জলে টলটল করছে। কিন্তু হেসে বললো,—আমি বেশ ভালো আছি।

ওরা যখন মহলের ভিতর বসে কথা বলছিলো, ঠিক সে সময় খবর এলো।

বাইরে হই চই আরো প্রবল হয়ে উঠলো। হঠাৎ কান্নাকাটি শোনা গেল অন্দরমহলে। আবার তূর্যধ্বনিও শোনা গেল।

কি ব্যাপার? কি হয়েছে?

ছুটে এলো একজন। খুব খারাপ খবর। মারা গেছেন মহারাণা সাঙ্গা।

রাণাজী?—মারা গেছেন?—মীরা পাথর হয়ে গেল।

মহারাণা সাঙ্গা যুদ্ধে যাচ্ছিলেন বাবর শা'র কাছ থেকে চান্দেরী উদ্ধার করার জন্যে। ইরিচের কাছে এসে ছাউনি ফেলেছিলেন। সেখানে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলা হয়েছে।

আমি জানি এর মধ্যে আছে জোধপুরী রাঠোরেরা,—জয়মল বললো ঠোঁট কামড়ে।

শুধু রাঠোরদের দোষ দিয়ে কি লাভ ভাই,—মীরা বললো,—আমাদের মধ্যে অনেকে আছে এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে।

বাবরের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে রাণা সাঙ্গা রণথম্ভোর দুর্গে ফিরে আসার পর থেকেই ষড়মন্ত্রটা ভালো ভাবে পাকিয়ে উঠেছিলো। উনি জানতে পেরেছিলেন যে বনবীর যোগাযোগ করেছিলো বাবর শা'র সঙ্গে।

মীরার কাছ থেকে খবর যেতো রাণার কাছে এবং খবর আসতো। মীরা

বলে পাঠিয়েছিলো,—আপনি এখন আবার নতুন করে যুদ্ধ শুরু করবেন না। আগে একবার চিতোরগড়ে আসুন।

ভাবনার কথা,—রাণা বলেছিলো প্রধানমন্ত্রী সুরজমল হাডাকে,—আমাকে সরিয়ে রতন সিংহকে রাণা করার জন্যে ওরা উঠে পড়ে লেগেছে। এখন উপায়?

উপায় বলে দিয়েছিলো সুরজমল। ছোটোরানী কারমেতনবাঈয়ের ছেলে কুমার বিক্রমজিতকে মেবার রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী বলে ঘোষণা করা দরকার। দেরি নয়, এখনই করা দরকার।

মীরার কাছে খবর এসেছিলো যে রাণা রাজী হয়েছেন এবং সেকথা জানাজানিও হয়ে গেছে চিতোরগড়ে। বনবীরের লোক আছে রণথম্ভোর দুর্গেও।

রতন সিংহ ভীষণ রেগে গিয়েছিলো। ছোটোরানী কারমেতনবাঈ সুরজমল হাডার বোন। রতন সিংহ বললো,—আমার বৌ সুজাবাঈও তো তারই বোন। কারমেতনবাঈয়ের ছেলের জন্যে সুরজমল হাডার এই পক্ষপাতিত্ব কেন?

বনবীর হাসতে হাসতে বললো,—বাপ ছেলে দুজনে দুই বোনকে বিয়ে করলে এই হয়। একে বলে রাজনীতি।

—এটা আবার কিসের রাজনীতি?

—তুমি রাণা হলে সুরজমল হাডার কর্তৃত্ব চলবে না। তোমার মা রানী ধনবাঈ ওকে হটিয়ে দেবেন। আমিও তাকে তোমার কাছে ঘেঁষতে দেব না। কিন্তু কুমার বিক্রমজিত রাণা হলে সব ক্ষমতা সুরজমলের হাতেই থাকবে। কারণ বিক্রমজিতের বয়েস এখনও কম, আর রানী কারমেতনবাঈ সুরজমলের কথায় ওঠেন বসেন।

রাণা সাঙ্গা সুরজমলকে বলেছিলো,—চিতোরগড়ে ফিরে বনবীরের বিচার করবো। ও যে বাবরের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার চেষ্টা করছে তার প্রমাণ আমার হাতে আছে।

আর দেরি নয়,—বনবীর বললো মালদেবকে,—বাবর শাহকে খবর পাঠাও চান্দেরীর দিকে এগিয়ে আসার জন্যে। রাণাজী যেন চিতোরগড়ে ফিরে আসার সুযোগ না পান।

মীরা জয়মলকে বললো,—আমি রাণাজীকে বলে পাঠিয়েছিলাম, এখন যুদ্ধে যাবেন না। আগে চিতোরগড়ে ফিরে আসুন। রাণাজী জানালেন, ফেরার

উপায় নেই। আগে বাবর শাহকে রুখতে হবে, তাকে হটিয়ে দিতে হবে চান্দেরী থেকে, তা নইলে সে মেবারের দিকে এগিয়ে আসবে। তাতে আমাদের বিভীষণদের জোর বেড়ে যাবে। সে সুযোগ আমি তাদের দেব না। তবে ভাবনা কোরো না। মোগলদের হটিয়ে দিয়েই আমি ফিরে আসবো।

মীরার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়লো।

বাইরে তূর্যধ্বনি হোলো। জয়মল জিজ্ঞেস করলো,—এ আবার কেন?

আরেকজন এলো খবর নিয়ে। রাণা সাঙ্গার মৃত্যুসংবাদ শুনে বনবীরের আর তর সয়নি। দরবার ডাকিয়ে যুবরাজ রতন সিংহকে নতুন রাণা বলে ঘোষণা করেছে।

মীরা বললো,—তুমি মেড়তায় ফিরে যাও জয়মল।—এক্ষুনি।—দেরি কোরো না।

এতদিন পরে ভায়ের সঙ্গে দেখা। কিন্তু ভালো করে দুটো কথাও হোলো না।

মীরার স্বামী কুমার ভোজরাজ চলে গেছে। মীরার বাবা মেড়তার রতন সিংজীও আর নেই। এখন চলে গেলেন মহারাণা সাঙ্গা।

মীরা মহলের বাইরে তার নতুন মন্দিরে গিয়ে বসে রইলো চুপ করে।

আমার আর কে রইলো এই দুনিয়ায়,—মীরা ভাবলো গিরধরজীর বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে।

চোখের জলের আড়ালে মনের মধ্যে গুনগুন করে উঠলো গানের কলি,—মেরে তো গিরধর গোপাল, দুসরো না কোঈ……

॥ একুশ ॥

রতন সিংহ মেবারের নতুন রাণা। বনবীর আর মালদেব তার সঙ্গে সঙ্গে থাকে ছায়ার মতো।

চিতোরগড়ের রাওলায় রাজমাতা ধনবাঈয়ের এখন দোর্দণ্ড প্রতাপ। সব রাজপুতানীই ভয় করে ধনবাঈকে। দুবেলা হাজিরা দেয় ধনবাঈয়ের জেনানা দরবারে। এমন কি, বড়োরানী কুঁয়রবাঈকেও নাকি আসতে হয় মাঝে মাঝে। ধনবাঈকে ঘিরে থাকে তার সহেলীরা। তাদের দাপটে চিতোরগড় থমথম করে।

শুধু মীরা আসেনি। ধনবাঈয়ের সহেলীরা বললো,—ওই মেড়তানীকে এখানে আসতেই হবে। রাজমাতার আমন্ত্রণ নিয়ে থালাভর্তি লাড্ডু, শুকনো

নারকোল ও মেওয়া নিয়ে এলো চারজন সহেলী। তখন মীরা তার মন্দিরে। আজকাল সেখানেই পড়ে থাকে বেশির ভাগ সময়। থালা নিয়ে সহেলীরা সেখানেই এলো। মীরাবাঈ মিষ্টি ও মেওয়ার থালা নিবেদন করে দিলো বিগ্রহের সামনে। হেসে বললো,—আজকাল তো আমার একটুও চোখের আড়াল করতে ইচ্ছে করে না গিরধরজীকে। তার চেয়ে রানী-সা'ই আসুন আমার প্রভুজীর দরবারে। উনি খুশি হবেন।

সে আসবে না?—জ্বলে উঠলো রানী ধনবতীবাঈ,—আমাকেই যেতে হবে?

এত স্পর্ধা?—বললো রাজমাতার সহেলীরা।

ধনবতী গুম হয়ে বসে রইলো।

একজন বললো,—খবর দিন বনবীরকে। মীরা যাতে আসতে বাধ্য হয় সে রকম কোনো ব্যবস্থা করবে।

আরেকজন বলে উঠলো,—না, না, অতো বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না। রক্তারক্তি হয়ে যাবে চিতোরগড়ে। রক্ষীরা সবাই শ্রদ্ধা করে মীরাবাঈকে।

—তাহলে কি করে ওকে আনা যায়?

—দরকারটাই বা কি? থাক না নিজের মন্দিরে। তাকে নিয়ে আমাদের এত ভাবনা কিসের?

—ভাবনা আছে বই কি। ভেতরের ব্যাপার তো জানো না। তোমাদের ধারণা মীরা শুধু নিজের ভজনপুজন নিয়েই মশগুল। আসলে তা তো নয়। ওসব ঢং, ওসব লোক দেখানো। রতন সিংহ রাণা হওয়াতে সে খুশি হয়নি। দরবারের যে সব সর্দার রাণাজীকে পছন্দ করে না, ওরা কিছু একটা মতলব করছে। ওদের পেছনে যে মীরাজী নেই, একথা কেউ বলতে পারে না।

—কেন? মীরাজীর কি স্বার্থ?

—কুমার ভোজরাজ বেঁচে থাকলে সেই হোতো রাণা। তখন মীরা হোতো রাজরানী। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে তা তো হোলো না। এখন মীরাজীর ইচ্ছে এমন কেউ গদিতে বসুক যে মীরার কথামতো চলবে।

—কে সেই এমন কেউ?

—রানী কারমেতনবাঈয়ের ছেলে বিক্রমজিত। কারমেতনবাঈয়ের সঙ্গে মীরার কতোখানি অন্তরঙ্গতা ছিলো মনে নেই?

—ওরে বাবা, ওর মতো লোককে মীরাবাঈ সামলাতে পারবে?

ওর মতো লোককেই পারবে। অত্যন্ত জঘন্য চরিত্র, অত্যন্ত নোংরা মন,

অত্যন্ত বিকৃত রুচি। ও হবে শুধু সাক্ষীগোপাল। আসল ক্ষমতা চলে যাবে ওর মামা রাও সুরজমলের হাতে। তখন অন্দরমহলের কর্ত্রী হবে রানী কারমেতনবাঈ। এদের ক্ষমতা টিকে থাকবে যদি এদের পেছনে থাকে মেড়তিয়া রাঠোরেরা। সেটা সম্ভব হবে যদি ওরা মীরাকে খুশি করে রাখতে পারে।

এসব কথা আলোচনা হচ্ছে রাণার অন্তরঙ্গ মহলেও। বনবীর নাকি সেদিন কাকে যেন বলছিলো।

—কিন্তু মীরাজীর এতে কি লাভ?

—শুনেছি মীরাজী হতে চান জগৎ গোসায়িন। অর্থাৎ, যেখানে যতো বৈষ্ণব আছে সবাই মানবে। ওঁর নামে মন্দির হবে, ওঁর নামে পুজো হবে, ওঁর নামে অতিথিসেবা হবে। উনি হবেন সারা হিন্দুস্তানের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বপ্রধান। তাঁর সম্মান হবে রাণাজীরও উপরে। হিন্দুস্তান তাঁর নামে এক হবে।

তলোয়ার হাতে নিয়ে রাণা সাঙ্গা যে কাজ পেরে ওঠেন নি, শুধু হরিনাম করেই মীরাবাঈ সেটা করতে চান?

হাসির ঝিলিক খেলে গেল সবার মুখে।

রাজমাতা ধনবতী বললো,—সে জন্যেই মীরাকে আমার দরবারে আনতে হবে, আমার সামনে মাথা নোয়াতে বাধ্য করতে হবে। তাহলে যারা রতন সিংহের বিপক্ষে ওরা আমাদের ক্ষমতার একটা নমুনা দেখতে পাবে, আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার সাহস পাবে না।

কথা হচ্ছিলো রাণার খাস দরবারেও।

মাড়ওয়ারের রাজকুমার মালদেব বললো,—এ তো পরিষ্কার বুঝতে পারছি, মীরার উদ্দেশ্য হোলো মেড়তিয়া রাঠোরেরা শক্তিশালী হয়ে উঠুক। মাড়ওয়ার দুর্বল হোক। অম্বর আর বুঁদীর ক্ষমতা বেড়ে যাক। মেবার দুর্বল হোক।

এরা প্রত্যেকেই রাণা রতনসিংহের প্রতিপক্ষ। অম্বরের কছওয়াদের সঙ্গে চিতোরের সিসোদিয়াদের শত্রুতা অনেকদিনের। বুঁদীর সঙ্গেও সম্পর্ক ভালো যাচ্ছে না। মালদেবের কথা শুনে রতন সিংহের মুখ আরাবল্লীর পাহাড় হয়ে গেল।

বনবীরও সায় দিলো মালদেবের কথায়। বললো,—ওরা আবার শক্তিশালী হওয়ার আগেই ওদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়া দরকার। আমাদের ক্ষমতার একটা নমুনা দেখিয়ে দেওয়া দরকার। চিতোরগড়ের ভিতর ওদের বন্ধু

যারা আছে আগে তাদের শেষ করতে হবে। মীরাবাঈকে দিয়েই শুরু করা যাক।

রতন সিংহ বললো,—মীরাজীকে মহলের ভিতর আটক করো।

—না, না। পাগল হলে নাকি রাণাজী? মীরাবাঈকে ঠিক এখনই কিছু বলা চলবে না। সব কিছুর একটা প্রস্তুতি চাই। এটা রাজনীতি, পারিবারিক ঝগড়া নয়।

—তা হলে বলুন কি করা যায়।

—শোনো। তোমার বাবা রাণা সাঙ্গা তোমার বিয়ের ঠিক করে গিয়েছিলেন অম্বরের রাজকন্যার সঙ্গে। বাগদান হয়ে গিয়েছিলো। এ বিয়ে ভেঙে দিতে হবে। কিন্তু আমার কাছে খবর আছে, আমাদের শত্রুরা আঁচ করতে পেরেছে আমার এই মতলব। তাই রাও সুরজমল নিজেই অম্বরের রাজকন্যাকে বিয়ে করার জন্যে গোপনে আলাপ আলোচনা শুরু করেছেন।

এতে আমাদের কি আসে যায়?—বললো রাণা রতন সিংহ।

বনবীর আস্তে আস্তে উত্তর দিলো,—সুরজমল যদি অম্বরের রাজকন্যাকে বিয়ে করে, বুঁদীর সঙ্গে অম্বরের একটা গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠবে। ওদের কূটনীতি হোলো আস্তে আস্তে চিতোরকে একটা শত্রুজোট দিয়ে ঘিরে ফেলা।

ওরা যদি বাবর শা'র সাহায্য নেয়, তাহলে আমি একটুও অবাক হবো না,—বললো কুমার মালদেব।

সাহায্য নিচ্ছে কিন্তু সত্যি সত্যি,—বনবীর গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলো,—কারমেতনবাঈ বাবরের সঙ্গে যোগাযোগ করছেন জানো?

তাই নাকি?—রতন সিংহের তলোয়ার ঝনঝন করে উঠলো,—বাবরের সাহায্য নিয়ে চিতোর জয় করবে? মেবারের গদিতে বসাবে বিক্রমজিতকে?

—না, অতো সাহস এখনও হয়নি। বাবর শাহও এতদূর এগোতে সাহস করবেন না। ওঁর সামনে এখন অনেক ঝঞ্ঝাট। হিন্দুস্থানের নতুন মোগল রাজত্ব। আগে নিজের অধিকারের ভিত শক্ত করতে হবে। তারপর তো মন দেবে এদিকে।

তোমাদের কি ধারণা,—মালদেব বললো,—বাবর শাহ চিতোরে হানা দেবে কারমেতনবাঈয়ের এক অপদার্থ ছেলের হাতে এদেশ তুলে দেওয়ার জন্যে?

—না, অতো সাধুপুরুষ বাবর শাহ নয়। ওর নজর আছে রাজপুতানার উপর। রাজপুতদের দুর্বল করতে না পারলে মোগল রাজ্য নিরাপদ নয়। সুতরাং সে আগে মেবারকে শেষ করে দিতে চাইবে।

—অতো সহজ নয়। তার আগে অম্বর আলোয়ার বিকানীর বুঁদী ভরতপুর এসব দখল করতে হবে না ?

—কিছু দখল করবে, কিছু তাঁবেদার হবে।

তাঁবেদার যে হবে হোক,—রতন সিংহ গর্জে উঠলো,—কিন্তু বাবর শাহ মেবারের দিকে নজর দিলে রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।

বনবীর শান্তভাবে বললো,—ব্যাপারটা ভালো করে বুঝবার আগে আমরা অনেক কিছু অনুমান করে নিচ্ছি। আমি কয়েকদিন আগে একটা খবর পেয়েছিলাম গুপ্তচরদের মারফত। তখন কথাটাকে আমল দিই নি। এখন মনে হচ্ছে ব্যাপারটা সত্যি।

সবাই তাকিয়ে রইলো বনবীরের দিকে।

বনবীর বলে গেল,—রানী কারমেতনবাঈ রণথম্ভোর দুর্গ দিয়ে দিতে চান বাবর শাহকে। তার বদলে চান এটাওয়ায় একটা জায়গীর। তাঁর ধারণা সেখানে তিনি অনেক নিরাপদে থাকতে পারবেন। বিক্রমজিত একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। তবু তার এখনও অল্পবয়েস। কারমেতনবাঈয়ের ধারণা, হয়তো সে বদলে যেতে পারে অন্য পরিবেশে।

বেশ তো,—রতন সিংহ বললো,—যতো দূরে সরে যায়, ততোই ভালো।

কিন্তু তা তো হবে না,—বললো মালদেব,—বাবর শাহ যদি বিক্রমজিতকে নিজের আশ্রয়ে নিয়ে রাখে, তাহলে বুঝতে হবে নিজের কোনো মতলব হাসিল করতে চায় তাকে দিয়ে।

বনবীর মালদেবের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো।

॥ বাইশ ॥

প্রতিপক্ষ খুব তৎপর হয়ে উঠেছে। প্রত্যেকদিন নতুন নতুন খবর নিয়ে আসে বনবীরের গুপ্তচরেরা।

মেড়তার রাও বীরমদেবকে নির্দেশ পাঠানো হোলো,—তুমি মেবারের অন্যতম বিশ্বস্ত ও অনুগত সামন্ত। সুতরাং রাণাজীর দরবারে হাজির হয়ে নিজের আনুগত্য জানাও।

এটা তো দূতের মারফত সোজাসুজি নির্দেশ। অন্য এক সর্দারের মারফত পরোক্ষে একথাও জানিয়ে দেওয়া হোলো যে, বীরমদেবের মতিগতির উপরই নির্ভর করবে তাঁর ভাইঝি মীরাবাঈয়ের প্রতি রাণার ব্যবহার ও সদিচ্ছা।

বীরমদেব কোনো উত্তর দিলো না। এলোও না। মহলের গুপ্তচরের

কাছে শোনা গেল মীরাবাঈ বীরমদেবকে খবর পাঠিয়েছে, তার জন্যে বীরমদেব যেন একটুও চিন্তা না করেন। বীরমদেব যেন রতন সিংহের কাছে মাথা না নোয়ায়। নিজের নিরাপত্তার ব্যবস্থা মীরাবাঈ নিজেই করবে।

রাণা রতন সিংহ উত্তেজিত হয়ে উঠলো। বললো,—এখনই মীরাবাঈকে নজরবন্দী করো মহলে ভিতর।

না, না, এখন নয়,—বনবীর বললো শান্তভাবে,—তুমি চুপচাপ বসে দেখ আমরা কি করি।

খবর এলো রণথম্ভোর দুর্গে রানী কারমেতনবাঈয়ের সঙ্গে যোগ দেওয়ার জন্যে রওনা হয়েছে বীরমদেবজী।

এবার সৈন্য পাঠানো যাক,—একটু হেসে বললো বনবীর,—সে যেন কিছুতেই কারমেতনবাঈয়ের সঙ্গে যোগ দিতে না পারে। এবং,—একটু থামলো বনবীর, তারপর গম্ভীর হয়ে বললো,—সে যেন মেড়তায়ও ফিরে যেতে না পারে।

মেড়তায়ও সৈন্য পাঠানো দরকার,—বললো রাণা রতন সিংহ।

—তাও ভেবে রেখেছি। একদল সৈন্য গিয়ে চড়াও হবে মেড়তার উপর।

কুমার মালদেব বললো,—কিন্তু সিসোদিয়ারা মেড়তা দখল করবে, এটা সহ্য করবে না জোধপুরের রাঠোরেরা।

দখল করছে কে ?—বনবীর হেসে বললো,—শুধু মেড়তা থেকে বেরোনোর পথ আটকে বসে থাকবে যাতে মেড়তা থেকে সাহায্য পাঠাতে না পারে কুমার জয়মল, এবং যাতে মেড়তায় ফিরে যেতে না পারে বীরমদেবজী।

মেবারের সৈন্যরা পথে আটকে ফেললো বীরমদেবজীকে। মেড়তায় ফেরার উপায় নেই। রণথম্ভোরের দিকে এগিয়ে যাওয়ার পথ নেই। শুধু একটি মাত্র রাস্তা খোলা,—দেশ ছেড়ে একেবারে চলে যেতে হবে।

মেড়তার বাইরে এসে ছাউনি ফেললো আরেক দল সিসোদিয়া সৈন্য। তাদের নেতা কুমার মালদেব। নগরপ্রাকারের তোরণ বন্ধ করে ভেতরে চুপচাপ বসে রইলো বীরমদেবজীর ছেলে জয়মল।

মীরাবাঈ সব খবরই পেলো। কিন্তু একটি কথাও বললো না মুখ ফুটে। কোনো লোক পাঠানোর চেষ্টা করলো না বীরমদেব বা জয়মলের কাছে। নিজের দৈনন্দিন রীতি অনুযায়ী সাধুসেবা, বৈষ্ণবসঙ্গ ও গিরধরজীর পূজো নিয়েই মেতে রইলো।

বোধ হয় সংসার থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন,—বললো রাণা রতন সিংহ।

বনবীর হেসে উত্তর দিলো,—সময় গুনছেন। খুব বুদ্ধিমতী। ঠিক জানেন উনি মেড়তায় লোক পাঠালে ধরা পড়ে যাবে আমাদের হাতে।

বীরমদেবের ব্যবস্থা হোলো। এবার সুরজমলের পালা।

রাও সুরজমল মেবারের রাণার প্রতিপক্ষ দলের আসল নেতা। সে রানী কারমেতনবাঈয়ের বড়ো ভাই, রাণা সাঙ্গার প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী। এখন বুঁদী রাজ্যের অধিপতি। তাই এখন খুব প্রভাব ও প্রতিপত্তি।

ওর গদির জন্যে দাবিদার দাঁড় করিয়ে দেওয়া যাক,—বললো বনবীর,—তাহলে সুরজমল আর অন্যদিকে মন দেওয়ার সময় পাবে না।

গোলমাল বেধে গেল বুঁদী রাজ্যের ভিতরে। গদির দাবিদার হয়ে মাথা তুললো আরেকটি পক্ষ। মেবারের সমর্থন পেয়ে তারা রীতিমতো শক্তিশালী হয়ে উঠলো।

এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্যে সুরজমল হাত মেলালো অম্বর রাজ্যের সঙ্গে। বিয়ে করলো অম্বরের রাজকন্যাকে যার সঙ্গে বিয়ের সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছিলো রাণা রতনসিংহ। মেবারের সঙ্গে অম্বরের সাপে নেউলে সম্পর্ক অনেক দিন থেকেই। রাও সুরজমল মেবারের উত্তর দিকে একটি শক্তিমান জোট সৃষ্টি করার চেষ্টা করলো।

মারওয়াড়ের অধিপতি রাও গাঙ্গা এতদিন রাজধানী জোধপুরে বসে চুপচাপ লক্ষ করছিলো চারপাশের পরিস্থিতি। এবার একটু চঞ্চল হয়ে উঠলো।

রাণা রতনসিংহের মা রানী ধনবাঈ রাও গাঙ্গার বোন। রাণার অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সঙ্গী কুমার মালদেব রাও গাঙ্গার ছেলে। তাই এতদিন রাও গাঙ্গা কোনো পক্ষে যোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেনি। তার ধারণা ছিলো রাণার উপর জোধপুরের প্রভাবই বজায় থাকবে মালদেব ও ধনবাঈয়ের মারফত।

কিন্তু সাম্প্রতিক পরিস্থিতি দেখে রাও গাঙ্গা আর চুপচাপ থাকতে পারলো না। যখন শুনলো তারই ছেলে কুমার মালদেব সিসোদিয়া সৈন্যদের অধিনায়ক হয়ে মেড়তা অবরোধ করেছে, তখনই চঞ্চল হয়ে উঠলো। পরামর্শ করলো দরবারের অন্যান্য সর্দারদের সঙ্গে।

সবাই বললো, বড্ড বাড়াবাড়ি করছে বনবীর। ওর হাতে এতখানি ক্ষমতা থাকা ঠিক নয়। রাণা রতন সিংহের উপর আসল প্রভাব বনবীরের। মালদেবের কোনো প্রভাব নেই বলেই শোনা যাচ্ছে।

এবং হয়তো মালদেবের উপরও বনবীরের প্রভাব ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে বনবীরের পরামর্শে মালদেব আর চিতোরে ফিরে যাবেনা

মেড়তার সঙ্গে একটা ফয়সালা হয়ে যাওয়ার পর। সে নাকি জোধপুরে এসে ওর বাবা রাও গাঙ্গাকে রাজকার্যে সহায়তা করতে চায়।

এটা তো ভালো কথা নয়,—বললো জোধপুরের সর্দারেরা,—মালদেব মারওয়াড়ের টিকায়েত, সিংহাসনের উত্তরাধিকারী, সে রাজধানীতে ফিরে আসবে নিশ্চয়ই, কিন্তু বনবীরের পরামর্শে কেন? নিশ্চয়ই বনবীর মালদেবকে দিয়ে জোধপুরেও একটা গণ্ডগোল বাধানোর পরিকল্পনা করছে। হয়তো রাও গাঙ্গাকে সরিয়ে মাওয়াড়ের সিংহাসনে বসাতে চায় মালদেবকে। এ যদি হয়, তাহলে রাজপুতানার রাজনীতিতে বনবীরের প্রভাব খুবই বেড়ে যাবে।

ওর মতলবটা কি?—বলাবলি করলো জোধপুরের সর্দারেরা,—বনবীর কি শেষ পর্যন্ত রতন সিংহকে সরিয়ে নিজেই রাণা হতে চায়?

ওদিকে মোগল সম্রাট বাবর শাহও লক্ষ করছে রাজপুতানার পরিস্থিতি। জোধপুরে জোর গুজব বনবীর নাকি গোপনে যোগাযোগ করছে বাবরের সঙ্গে। বনবীর যদি মারওয়াড়, মেড়তা, মেবার আর বুঁদী, এই চারটি রাজ্য নিজের আওতায় আনতে পারে তাহলে বাবর শা'র সঙ্গে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবে না। আর ওদিকে বাবরও যদি অম্বর নিজের তাঁবে আনতে চায়, তাহলে বনবীর কোনো আপত্তি করবে না।

বাবর শাহ এ পর্যন্ত কোনো অভিমত প্রকাশ করেনি। শুধু চুপচাপ পরিস্থিতি লক্ষ করছে। তবে বনবীরের প্রস্তাব যে একেবারে অবহেলা করছে না সেটা বোঝা যায় রানী কারমেতনবাঈ সম্বন্ধে তার সাম্প্রতিক নিস্পৃহ ভাব দেখে।

সব দেখেশুনে মারওয়াড়ের অধিপতি রাও গাঙ্গা আর চুপ করে থাকা নিরাপদ মনে করলো না। নিজের ছেলে মালদেবের কাছে লোক পাঠিয়ে জানিয়ে দিলো, মেড়তার রাজবংশ জোধপুর রাজবংশেরই একটা শাখা। মেড়তার সম্বন্ধে মেবারের আগ্রহ মারওয়াড়ের নিরাপত্তার দিক থেকে অবাঞ্ছনীয়। এজন্যে মেবারের সৈন্য যে মেড়তা অবরোধ করেছে এতে তাঁর প্রবল আপত্তি। এবং জোধপুরেরই যুবরাজ যে এই বাহিনীর নেতৃত্ব করছে এটা তাঁর একটুও পছন্দ নয়।

কুমার মালদেব কোনো উত্তর দিলো না। গায়েই মাখলো না এই প্রতিবাদ।

তখন রাও গাঙ্গা সোজাসুজি জানিয়ে দিলো যে দিন পনেরোর মধ্যেই যদি তুলে নেওয়া না হয় মেড়তার অবরোধ, তাহলে জোধপুর থেকে রাঠোর বাহিনী এগিয়ে যাবে মেড়তাকে সাহায্য করতে।

রাণা রতন সিংহ অবাক। বলে উঠলো,—ব্যাপার কি? আমার তো ধারণা ছিলো মেড়তিয়া রাঠোর আর জোধপুরের রাঠোরদের মধ্যে মুখ দেখা-দেখি নেই। আজ মেড়তার জন্যে ওদের এত দরদ?

বনবীর মুখ টিপে হাসলো। উত্তর দিলো,—রাজনীতিতে চিরকালের শত্রু বলে কিছু নেই রাণাজী, চিরকালের বন্ধু বলেও কিছু নেই। আজ যে বন্ধু, কাল সে শত্রু। আজ যে শত্রু, কাল সে বন্ধু।

চটে গেল রাণা রাণা রতন সিংহ। বললো,—ওসব দার্শনিক তত্ত্ব শোনার ধৈর্য আমার নেই। এখন মারওয়াড় যদি মেড়তাকে সাহায্য করার জন্যে এগিয়ে আসে, আমরা কি করবো? অবরোধ তুলে নিয়ে মানইজ্জত খুইয়ে ফিরে আসবো? না, মারওয়াড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করবো?

বনবীর হাসতে হাসতে বললো,—তোমার কি ইচ্ছে?

—ওদের সঙ্গে যুদ্ধে নামলে আমাদের শত্রুদের অনেক সুবিধে। ওরা দলে ভারী হবে। যদি যুদ্ধ না করে সরে আসি, তাহলে কোনোদিন আর মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবো না। ভেবে পাচ্ছি না কি করা যায়।

বনবীর নিশ্চিন্ত গলায় বললো,—একটা উপায় আছে। আমিই তদবির করে কাজটা এগিয়ে দিলাম।

তার দিকে চোখ তুলে তাকালো রাণা রতন সিংহ।

বনবীর বলে গেল,—রাও গাঙ্গার কাকা কুমার সেখাজী মারওয়াড়ের গদি দখল করার জন্যে সৈন্য নিয়ে আক্রমণ করতে আসছে কয়েকদিনের মধ্যেই। তাকে সাহায্য করছে নাগপুরের আমীর খাঁ আর বিকানীরের রাও জেটসি।

রাণার চোখে অবাক চাউনি।

বনবীর হাসতে হাসতে বললো,—রাও গাঙ্গা আর মেড়তার ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামানোর ফুরসত পাবে না।

এবার রতন সিংহও হাসতে শুরু করলো। কিন্তু বনবীর গম্ভীর হয়ে গেল। বললো,—কিন্তু একটা বিশেষ খবর আছে।

রতন সিংহ হাসি বন্ধ করে তাকালো।

বনবীর বললো,—মোগল সম্রাট বাবর শাহ খুব গোপনে মীরার কাছে হীরের হার পাঠিয়েছে। অনেক দাম।

রতন সিংহের মুখ রাগে সাদা হয়ে গেল।

॥ তেইশ ॥

মোগল বাদশাহ বাবর শাহ মীরাবাঈয়ের কাছে হীরের হার পাঠিয়েছে অতি গোপনে। এখান থেকেই মীরার জীবনের ঝড়ঝাপটা শুরু।

আজ আমি বসে ভাবছি সেদিনের কথা। খবরটা চিতোরগড়ের রাওলায় ছড়িয়ে পড়েছে। বাবর শাহ হীরের হার পাঠিয়েছে মীরাবাঈয়ের কাছে। চিতোরগড়ে লোকজন পরস্পরকে বলছে একথা,—বাবর শাহ হীরের হার পাঠিয়েছে মীরাজীর কাছে। কথাটা বনবীরের লোকেরা অতিরঞ্জিত করে ছড়াচ্ছে চারদিকে,—বাবর শাহ হীরের হার পাঠিয়েছে মীরাজীর কাছে।

কেন?—জিজ্ঞেস করছে রাওলার রাজপুতানীরা।

আর জিজ্ঞেস করছে সাধারণ লোকেরা,—কেন? কেন? কেন?

আমি মনে মনে তৈরী করার চেষ্টা করছি সেদিনকার ছবি। গিরধরজীর মন্দিরে মীরা একা। একেবারে একা। চারদিকে পাহারা। মীরা কোথাও যেতে পারে না। বাইরের কেউ আসতে পারে না গিরধরজীর মন্দিরে।

রাণা রতন সিংহের কড়া হুকুম। মীরা নজরবন্দী। মহলের কেউ ওর সঙ্গে কথা বলতে পারবে না। বনবীর নিজে যাচাই করে দুজন পরিচারিকা নিয়োগ করেছে। চম্পা আর চামেলী। ওরা সব সময় মীরাকে চোখে চোখে রাখবে।

নানা রকম কথা আসছে মীরার কানে। তার চরিত্র নিয়ে নানা রকম কথা। এসব রটাচ্ছে বনবীরের লোকেরা। মীরা বিধবা। মীরা সুন্দরী। মীরা তরুণী। গিরধরজীর পূজো ভজন এসব ফাঁকি। ভেতরের ব্যাপার খুব জটিল।—তাকে এসব শোনাচ্ছে চম্পা আর চামেলী।

ভুলে যাওয়া ইতিহাসের কুয়াশার আড়ালে মীরার মুখখানি আমি দেখবার চেষ্টা করছি। কিন্তু বার বার ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে। বার বার মুছে যাচ্ছে ইতিহাস। চাপা পড়ে যাচ্ছে কিংবদন্তীর তলায়।

সেই কিংবদন্তী বলছে,—তানসেনের কাছে মীরার গানের প্রশংসা শুনে বাদশাহ আকবর ছদ্মবেশে এসেছে মীরার সঙ্গে দেখা করতে। মীরার গান শুনে মুগ্ধ হয়ে নিজের গলা থেকে হীরের না মুক্তোর হার খুলে উপহার দিতে গেল মীরাকে।

এর পর মনের মধ্যে ভেসে এলো গ্রামোফোনে শোনা মীরাবাঈ পালার সংলাপ। বোধ হয় সিনেমাতেও ছিলো ওরকম একটা কিছু।

মীরা!—

ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। রুক্ষ। গম্ভীর।

কে? ও, মহারাণা, আপনি?

গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে সেখানে এসে পড়েছে কিংবদন্তীর মীরার কিংবদন্তীর স্বামী,—রাণা কুম্ভ।

—হ্যাঁ মীরা, আমি। আজ তোমার ব্যবহারে লজ্জায় ঘৃণায় আমার মাথা নিচু হয়ে যাচ্ছে।

—কেন মহারাণা?

—কেন? এখনও বুঝতে পারো নি মীরাবাঈ? সিসোদিয়া রাজবংশের কুলবধূ হয়ে তুমি প্রকাশ্যে গান শুনিয়েছো একজন ম্লেচ্ছকে, তার কাছ থেকে হীরের হার উপহার নিতে একটুও কুণ্ঠা বোধ করছো না। মীরা, মীরা, তুমি সিসোদিয়াকুলের কলঙ্ক—।

মহারাণা!—মীরার আর্ত কণ্ঠস্বর।—প্রভু, গিরিধারী গোপাল, তোমার সামনে এমন কথাও শুনতে হোলো আমায়।

ছদ্মবেশী আকবরের কণ্ঠস্বর,—মহারাণা, আপনি অকারণ উত্তেজিত হচ্ছেন। আমার একটা কথা শুনুন—।

না, না, না,—গর্জে উঠলো মহারাণা কুম্ভ,—আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। আমি জানি আপনি কে। আপনার পরিচয় জানাজানি হয়ে গেলে এখনই হাজার হাজার রাজপুত উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে ছুটে আসবে। আপনি যান, এক্ষুনি চিতোরগড় ছেড়ে চলে যান। আমি রাজপুত, পরম শত্রুকে একলা পেয়ে তার জীবননাশ করা আমার কাছে অধর্ম। তাই আপনাকে অনুরোধ করছি, এই মুহূর্তে চলে যান—।

খট খট খট খট।···—ঘোড়ার পায়ের শব্দ দূরে অপসৃয়মান।

মীরা!—

বলুন মহারাণা!—

তুমি স্বৈরিণী।

এ মিথ্যে অপবাদ মহারাণা।

তুমি তোমার স্বামীর প্রতি বিশ্বাসঘাতিনী।

না, মহারাণা, আমার স্বামী গিরিধারী গোপাল। তিনি জানেন, আমি তাঁকে ছাড়া আর কাউকে জানি না।

না, না, না মীরাবাঈ, তোমার স্বামী আমি,—আমি মহারাণা কুম্ভ··· ···

নাটকের সংলাপ ফিরে আসে আমার কানে। কিংবদন্তীর কাহিনী মনে পড়ে। আর আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলি। কোথায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের পরমবৈষ্ণব রাণা কুম্ভ, কোথায় আরো একশো বছর পরের বাদশাহ্ আকবর। কার সঙ্গে কাকে জুড়ে আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছে কাহিনীকারেরা।

হ্যাঁ, বাদশাহ আকবরের সঙ্গেও মীরার দেখা হয়েছিলো। কিন্তু সে অনেক বছর পরে। আকবর তখন তরুণ, মীরা প্রায় বৃদ্ধা। তখন মীরা আর চিতোরে নেই, তখন নিজের পরিচয় গোপন করে উত্তর ভারতের প্রধান বৈষ্ণব তীর্থগুলো পরিক্রমার পর এসে আশ্রয় নিয়েছে বন্ধোগড়ের বাঘেলা রাজা রামচন্দ্রের রাজ-প্রাসাদে,—সে আরো সাতাশ আটাশ বছর পরের কথা।

বনবীরের কাছে নিয়মিত খবর দিতে আসে চম্পা কিংবা চামেলী। একজন আসে, অন্যজন থাকে পাহারায়। সব কিছুর উপর নজর রাখে।

বনবীর হাসিমুখে চামেলীকে জিজ্ঞেস করলো খুব সহজ গলায়,—মীরার যে চরিত্র ভালো নয়, ও যে অন্য কোনো পুরুষের প্রতি গোপনে আসক্ত, সবাই যে এরকম বলাবলি করছে, এসব মীরাকে বার বার ঘুরে ফিরে জানানো হচ্ছে তো?

চামেলী তাকালো বনবীরের দিকে। একটা হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে। কোনো উত্তর না দিয়ে শুধু মাথা নাড়লো।

—কি বলছে মীরা?

—কিছু না। শুধু নিজের মনে গান গাইছে।

কি গান?—মুখে হাসি চোখে ছুরির ধার নিয়ে বনবীর তাকালো।

অনেক গান,—চামেলী উত্তর দিলো,—সব গানের সব কথা তো মনে থাকে না সব সময়।

যেটা মনে আছে সেটাই বলো।

—রাণাজী ম্যয় তো·· ······

না, না, গেয়ে শোনাও। তুমি তো গাইতেও পারো।

গেয়ে শোনালো চামেলী।

> রাণাজী ম্যয় তো সাঁওয়লকে রঙ্গ রাতী।
> জিনকে পিয়া পরদেস বসত হ্যায়
> লিখ লিখ ভেজৈঁ পাতী॥

নিজের মনে একটু মাথা নাড়লো বনবীর। আস্তে আস্তে বললো,—রাণাজী, ম্যয় তো সাঁওয়লকে রঙ্গ রাতী। রাণাজী, আমি তো শ্যামলের

প্রেমে ডুবে আছি। খুব ভালো কথা। জিনকে পিয়া পরদেস বসত হ্যাঁয়, যাদের প্রিয়তম থাকে বিদেশে, লিখ লিখ ভেজৈঁ পাতী, তারা চিঠি লিখে লিখে পাঠায়। কে চিঠি লিখে লিখে পাঠায়? কাকে পাঠায়? কি বলতে চাইছে মীরাবাঈ?—একটু ভাবলো বনবীর।—আচ্ছা, তারপর?

মেরে পিয়া মেরে হৃদয় বসত হ্যাঁয়,
বাত করুঁ দিন রাতী।

আমার প্রিয়র বসতি আমার হৃদয়ে,—বনবীর নিজের মনে বললো,—দিন-রাত তার সঙ্গে কথা বলছি। এ আবার কি কথা? চিঠি লিখে পাঠায় আর আমি কথা বলি? এর মানে?

বনবীর মাথা নাড়লো।—না, আমার খটকা লাগছে। গানের কথা-গুলোর মাধ্যমে কাউকে কিছু জানানোর চেষ্টা করছে মীরাবাঈ। এসব গুপ্ত সংকেত। নিশ্চয়ই অন্য কেউ দূর থেকে শোনে। তোমরা ভালো করে নজর রাখো। যদি দেখ কেউ কান পেতে শুনছে, আমাকে জানিয়ো।

বনবীর গিয়ে বললো রাণা রতন সিংহকে,—নিশ্চয়ই গানগুলোর অন্য কোনো মানে আছে যা আমরা ধরতে পারছি না।

ওর গান বন্ধ করে দাও,—বললো রতন সিংহ।

—না, সে হয় না। বরং ওকে গাইতে দাও ওর যা খুশি। নিশ্চয়ই ওর সংকেত ধরে ফেলবো খুব শিগগিরই।

রতন সিংহের মুখ বেজার হলো। বনবীরকে কোনো হুকুম দেওয়া যায় না। নিজের মর্জিতেই চলে। জিজ্ঞেস করলো,—বাবর শাহ মীরাবাঈয়ের কাছে হীরের হার কেন পাঠিয়েছেন সেকথা কি জানা গেছে?

বনবীর নিজের মনে একটু হাসলো, তাকিয়ে দেখলো রতন সিংহের দিকে। রতন সিংহ মনে মনে সে চাউনির অনুবাদ করলো। তার মনে হোলো বনবীরের চোখ যেন বলছে,—সব কথা জানার কি দরকার? সিংহাসনে বসে আছিস, চুপ করে বসে থাক। সব কিছু আমার উপর ছেড়ে দিয়ে দ্যাখ আমি কি করি।—রতন সিংহের মুখ আরো বেজার হোলো।

কিন্তু বনবীর নরম গলায় বললো,—পরিষ্কার জানা যায় নি তবে সবটা মোটামুটি অনুমান করতে পারছি। মীরাবাঈয়ের জ্যাঠামশাই বীরমদেবজী বাবর শা'র কাছে গিয়ে আশ্রয় লাভ করেছেন। রানী কারমেতনবাঈও লোক পাঠিয়ে যোগাযোগ করেছেন বাবর শা'র সঙ্গে। এদিকে মেড়তায় খুব অর্থাভাব। রাজকোষে কিছুই নেই। বীরমদেবজীর পক্ষে সেখানে কিছু পাঠানো

অসম্ভব। তাই তার হয়ে কয়েক লক্ষ টাকা পাঠাচ্ছেন বাবর শাহ। এমনি টাকা পাঠানো অসম্ভব। তাই হীরের হার। সোজাসুজি মেড়তায় পাঠানো অসম্ভব। তাই মীরাবাঈয়ের মারফতে, কারণ মেড়তায় কুমার জয়মলের সঙ্গে মীরাবাঈয়ের যোগাযোগ আছে। আমরা মেড়তার সঙ্গে বাইরের সমস্ত যোগাযোগ বন্ধ করে দিয়েছি, তবে মীরাবাঈ যে মাঝে মাঝে জয়মলের কাছে চিঠিপত্র লেখে সে ব্যাপারে তেমন কড়াকড়ি করি নি।

—কেন?

বনবীর বাঁকা হাসি হেসে উত্তর দিলো,—যারা ষড়যন্ত্র করছে, ওদের মনে হোক যে আমরা অন্ধ। কিন্তু তুমি তো জানো, আমার চোখ ঠিকই খোলা আছে।

রতন সিংহ জিজ্ঞেস করলো,—কিন্তু এ হার মীরার হাতে এলোই বা কি ভাবে? আর জয়মলের কাছে ওটা পাঠানোই বা হবে কি ভাবে?

—প্রতিপক্ষের অনেক গুপ্তচর বৈষ্ণব সাধু সেজে মীরাবাঈয়ের কাছে যাওয়া আসা করে এটা নিশ্চয়ই জানো।

রতন সিংহ একটু উসখুস করলো। বললো,—অনেকে বলাবলি করছে আমি শাক্ত আর মীরাবাঈ বৈষ্ণব বলেই ওঁর উপর আমার খুব রাগ। গুপ্তচর ভেবে বৈষ্ণব সাধু সন্ন্যাসীদের হেনস্তা করলে আমার বদনাম হবে।

—এসব কথা রটাচ্ছে আমাদের শত্রুরা, যাঁরা বৈষ্ণব সেজে থাকে তাদের গায়ে আমরা যাতে হাত না দিই। মীরাবাঈ কৃষ্ণের সাধনা করুন আর আর শিবের সাধনা করুন আমাদের কিছু আসে যায় না। কিন্তু যারা আমাদের বিপক্ষে, তিনি তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখলে আমরা কি চুপচাপ চোখ বুজে মালা জপ করবো?

এবার বনবীরের কথা একটু ঝাঁঝালো। রতন সিংহ এ নিয়ে আর কিছু বললো না। জিজ্ঞেস করলো,—আমরা কি ঠিক জানি যে হীরেব হার মীরাবাঈ জয়মলের কাছে এখনও পাঠান নি?

বনবীর ঠাণ্ডা গলায় উত্তর দিলো,—আমি জানি যে হীরের হাব এখনও মীরাবাঈয়েয় কাছেই আছে।

—সিসোদিয়া রাজবংশের কোন কুলবধূর অলঙ্কার রাণারই সম্পত্তি।

—যদি জানা যায় সেটা কোথায় আছে।

আমরা এখনও জানি না কেন?—রতন সিংহ আবার গরম হয়ে উঠলো।

বনবীর হাসলো রাণার দিকে তাকিয়ে। বললো,—চম্পা আর চামেলী গোপনে খোঁজ করছে।

চুপ করে গেল রাণা রতন সিংহ। আর কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

মহলের ভিতর মীরা নজরবন্দী। মীরা একা। সঙ্গে থাকে শুধু চম্পা আর চামেলী। চারদিকে ঘুরঘুর করে। কি যেন খুঁজে বেড়ায় তাদের চোখ।

মীরা নির্বিকার। নিজের মনে গান বাঁধে, গানে সুর দেয়, গান গায়।

এসব গান রাণাজীকে,—রাণা রতন সিংহকে উদ্দেশ করে তৈরী। সব নিপীড়নের উত্তর এসব গানের মধ্যে।

··রাণাজী থে ক্যাঁনে রাখো ম্হাসু বৈর।

ওগো রাণা, আমার সঙ্গে কেন তোমার শত্রুতা?

···রাণাজী ম্হাঁনে ইয়ে বদনামী লাগে মীঠী?

ওগো রাণা, আমার এই বদনাম খুব মধুর মনে হচ্ছে।

···রাণাজী ম্হাঁ তো গোবিন্দ কা গুণ গাসিয়াঁ।

ওগো রাণা, আমি তো শুধু গোবিন্দেরই গুণ গাইবো।

··রাণাজী হুঁ অব ন রহুঁগী তোরী হটকী।

ওগো রাণা, আমি তো থাকবো না, মানবো না আমাকে তোমার এই আটক করে রাখা।

গানের পর গান। নতুন নতুন গান। প্রত্যেক গানে রাণাজী রাণাজী রাণাজী····।

একদিন রাণা রতন সিংহ বনবীরের সামনে ফেটে পড়লো,—আমি আর পারছি না, আর সহ্য করতে পারছি না। রাণাজী রাণাজী রাণাজী। সবাই গাইছে। সর্বত্র গাইছে। আমি কি শেষ পর্যন্ত সবার হাসি ঠাট্টার খোরাক হয়ে উঠবো নাকি?

কি করতে চাও?—বনবীরের নির্বিকার প্রশ্ন।

—মীরাবাঈ মরে যাক। কেউ ওকে মেরে ফেলুক।

—রাণাজী, তার আগে চাই ওই হীরের হার। বিদেশী শত্রুর পাঠানো হীরে যদি কারো কাছে থাকে সেটা ঘোর অপরাধ, দেশদ্রোহিতা। তার জন্যে কঠিন শাস্তি দেওয়া যায়। শুধু সন্দেহ বা অনুমানের উপর কিছু করা চলে না, বিশেষ করে মীরাবাঈয়ের ক্ষেত্রে, যিনি রাণা সাঙ্গার পুত্রবধূ।

—হার কোথায়?

—এখনও জানি না। শিগগিরই জানবো।

—একথা তো সব সময় শুনছি। আর কদ্দিন শুনবো?

—শোনো রাণাজী। গিরধরজীর আশীর্বাদী ফুল নিয়ে মীরাবাঈয়ের লোক যাচ্ছিলো মেড়তায় জয়মলের কাছে। তাকে আটক করেছি। তাকে কথা বলানোর চেষ্টা করা হয়েছে নানারকম ভাবে। ভালো মন্দ সব রকম। সে আজ তিনদিন কয়েদখানায় বেহুঁশ হয়ে পড়ে আছে। একটু একটু জ্ঞান হচ্ছে মাঝে মাঝে। বলছে, আমি জানি না, আমি কিছু জানি না।

রাণা জানতে চাইলো লোকটি কে।

পোশাক সন্ন্যাসীর,—বনবীর বললো,—নাম ধাম কিছু জানা যায় নি এখনও।

পাহারা আরও জোরদার করে দিন,—রাণা হুকুম দিলো,—কেউ যেন দেখা করতে না পারে মীরাবাঈয়ের সঙ্গে।

একদিন অনেক রাত। বনবীর এসে রাণার ঘুম ভাঙিয়ে দিলো।

পাহারাদারদের কাছ থেকে খবর এসেছে।—মন্দিরের দরজা বন্ধ। ভেতরে চাপা গলায় কথাবার্তা শোনা যাচ্ছে।

তলোয়ার হাতে নিয়ে একলাই রওনা হোলো রাণা রতন সিংহ।

গিরধরজীর মন্দিরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। রাণা জোরে করাঘাত করলো। একবার দুবার তিনবার।

আস্তে আস্তে দরজা খুলে গেল। রাণা দেখলো সামনে দাঁড়িয়ে আছে মীরাবাঈ। চোখ দুটি শুকতারা।

কে আছে ভেতরে?—রাণা কড়া গলায় জিজ্ঞেস করলো,—কার সঙ্গে কথা বলছিলেন আপনি?

মীরা দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়ালো।

ভেতরে ঢুকলো রাণা রতন সিংহ। হাতে খোলা তলোয়ার। চারদিকে ঘুরে ঘুরে দেখলো। কেউ নেই। কাউকে দেখা গেল না। রাণা এসে দাঁড়ালো গিরধরজীর বিগ্রহের সামনে।

হঠাৎ রাণার বুক কেঁপে উঠলো। তার এ কি অশোভন আচরণ। খোলা তলোয়ার হাতে দাঁড়িয়ে আছে বিগ্রহের সামনে?

এক পা এক পা করে পেছন দিকে সরে এলো। তারপর মীরাকে কিছু না বলেই বেরিয়ে চলে গেল। দূরে মিলিয়ে গেল রাণার পায়ের শব্দ।

মীরা আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিলো। তারপর অন্যদিকে ফিরে বললো,—বেরিয়ে এসো। রাণাজী চলে গেছে।

এক কোণে ফুল পাতা আর ভোগের ফলের স্তূপ। তার পেছন থেকে বেরিয়ে এলো চম্পা চামেলী আর একজন পূজারী ব্রাহ্মণ।

আমাদের হাতে বেশী সময় নেই,—বললো মীরাবাঈ,—মিশ্রজী, আপনি এখনই বেরিয়ে পড়ুন। জয়মলকে জানাবেন, এরপর অনেকদিন হয়তো ওর সঙ্গে আমার আর যোগাযোগ করার সুযোগ হবে না। হীরের হারটা সাবধানে নিয়েছেন তো ?

পূজারী ব্রাহ্মণ অনন্ত মিশ্র পেটের কাছে কাপড়ের খাঁজটা একবার অনুভব করলো। তারপর দরজা খুলে সন্তর্পণে বেরিয়ে এলো। চারদিক ভালো করে দেখে নিয়ে এগিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে।

মীরা চামেলীকে ডেকে বললো,—পেছন পেছন তুমিও যাও। যদি কেউ লক্ষ রাখছে বলে সন্দেহ হয় মিশ্রজীকে সাবধান করে দিয়ো।

চামেলীও মিলিয়ে গেল অন্ধকারের মধ্যে। চম্পা দরজা বন্ধ করে দিলো। মীরা তানপুরো তুলে নিয়ে গিরধরজীর বিগ্রহের সামনে গিয়ে বসলো।

চম্পা একটু দূরে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসেছিলো। সে ভাবছিলো, গত কয়েকদিনের মধ্যে কতো পরিবর্তন এসে গেছে তাদের জীবনে।

চামেলী আর চম্পার অতীত খুব পরিষ্কার নয়। রাজমহলে অনেক মেয়ে আছে যাদের যৌবন আছে কিন্তু পরিচয় নেই। যে যার মুরুব্বি খুঁজে নেয়। চম্পা আর চামেলীর ধ্রুবতারা ছিলো বনবীর।

আগে ওরা মীরাকে দেখেছে দূর থেকে। চিতোরগড়ের রাওলার অভিজাত পরিবেশে রাণা সাঙ্গার পুত্রবধূ হিসেবে মীরার যা মর্যাদা, তাতে ওর ধারে কাছে আসা ওদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না। ওরা জানতো মীরাবাঈ মানে উপরমহলের মেয়েদের মধ্যে ক্ষমতার অন্তর্দ্বন্দ্বে একটা অপ্রীতিকর নাম। ওরা জানতো মীরাবাঈ মানে একটা অস্বাভাবিক ব্যক্তিত্ব যার নজির নেই। ওরা জানতো মীরাবাঈ মানে একটা উপরমহলের রহস্য,—সাধন ভজন ইত্যাদির আড়ালে অন্য কোনো একটা কিছু যার হদিশ পাওয়া যায় না।

তাই মীরার উপর খবরদারি করার দায়িত্ব পেয়ে ওরা খুশি হোলো।

—জানেন বাঈ'সা, বাইরে লোকে কি বলছে আপনার নামে ?

মীরা শুনলো চুপচাপ তাকিয়ে। তারপর একসময় গান ধরলো নিজের মনে।

কোঈ কহিয়ো রে প্রভু আওয়নকী,
আওয়ন কী মন ভাওয়ন কী।......

কেউ এসে আমায় বোলো আমার প্রভুর আসার খবর, যে খবর পেলে আমার মন ভরে যায়।

চামেলী শুনতে শুনতে নিথর হয়ে গেল।

আপ ন আওয়ে

লিখ নহিঁ ভেজই……

তুমি তো আসছো না, কিছু তো লিখেও পাঠাচ্ছো না।

চম্পাও শুনতে লাগলো নিস্পন্দ হয়ে।

বাঁণ পড়ী ললচাওয়ন কী……

তোমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে আমায় লোভে লোভে বসিয়ে রাখা।

চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম। ঝরোকা দিয়ে দূর আকাশে ভেসে গেল মীরার গান—

এ দোঈ নয়ন কাঁহিও নহিঁ মানই

নদিয়াঁ বহই জ্যায়সে সাওয়ন কা।……

আমার এ চোখ দুটো কোনো প্রবোধ মানছে না, চোখের জল বয়ে যাচ্ছে যেন শ্রাবণের নদী।

গান শেষ করে মীরাবাঈ কখন উঠে চলে গেছে। চম্পা দেখলো চামেলী বুঁদ হয়ে বসে আছে। চামেলী দেখলো চম্পাও স্তিমিত হয়ে বসে আছে।

পরে বনবীরের সঙ্গে যখন কথা বলতে গেল, তখন দেখলো তাদের মন গানের সুরে মেঘলা হয়ে আছে।

এখানে মীরার মহলে জীবন খুব শান্ত। জীবন ঘিরে শুধু ধূপের গন্ধ। চম্পা ও চামেলীর মন ক্রমে জমাট হয়ে এলো।

মীরার গান ওরা সেদিন শুনলো, পরে আরো শুনলো। কয়েকদিন পরে চামেলী চম্পাকে বললো,—শুধু গানই তো গায়।

আর কী গান,—বললো চম্পা,—এরকম তো কোনোদিন শুনি নি। পিয়া বিন রহিয়ো ন জায়। প্রিয়কে ছেড়ে তো আর থাকা যায় না। আমার মনও তো এমনি গুমরে ওঠে মাঝে মাঝে।

আমারও,—বললো চামেলী,—রমইয়া বিন নীঁদ ন আওয়ে। প্রিয় নেই, চোখে ঘুম নেই। নীঁদ ন আওয়ে বিরহ সতাওয়ে। ঘুম আসে না, শুধু বিরহ বেদনা। প্রেম কী আঁচ দুলাওয়ে। ভালোবাসার আঁচ লাগছে থেকে থেকে। পিয়া কব রে ঘর আওয়ে।

চম্পা কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর হঠাৎ বললো,—আচ্ছা চামেলী, জীবনে কোনোদিন কাউকে ভালোবেসেছো?

চামেলীর চোখ হঠাৎ জলে ভরে এলো। একটা পুরোনো কথা সে আর

মনে করতে চায় না। আস্তে আস্তে ধরা গলায় বললো,—ভালোবেসে কী লাভ? এই তো বেশ আছি।

চম্পা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো তার দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো,—সত্যিই কি আমরা বেশ আছি?

চামেলী চম্পার ঠোঁটের উপর নিজের আঙুল চেপে ধরলো। চাপা গলায় বললো,—চুপ, বনবীর সিংহ শুনতে পাবে।

নতুন কোনো খবর আছে?—জিজ্ঞেস করলো বনবীর।

কোনো খবর নেই। মীরাবাঈ তো মহল থেকে বেরোয় না। গান গায়, পূজো করে। কারো সঙ্গে দেখা করে না।

—লুকিয়ে দেখা করে কেউ?

—কাউকে তো দেখিনি এ পর্যন্ত।

—চোখ খোলা রাখবে।

চামেলী চম্পাকে নিরিবিলিতে বললো,—ভাবছি মাঝে মাঝে চোখ বন্ধই করে রাখবো।

চম্পা তার কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো,—চুপ, বনবীর সিংহ শুনতে পাবে।

সন্ধ্যায় আরতির পর মীরা ওদের বললো,—এখানে এসে বোসো। আমি এখন গান গাইবো। তোমরাও গাইবে আমার সঙ্গে।

সেদিন সন্ধ্যায় একটানা রিমঝিম বৃষ্টি। মীরা বর্ষার গান গেয়ে গেল একটার পর একটা।

দেখী বরসা কী সরসাঈ,
পিয়াজী কী মন মেঁ আঈ।
নন্হীঁ নন্হীঁ বুন্দন বরসন লাগিয়ো,
দামিনী দমকে ঝরলাঈ···

দেখলাম বর্ষার সরসতা। প্রিয়র কথা মনে পড়লো। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এলো। বিদ্যুতে বিদ্যুতে জলের ঝাপটা।

সাওন দে রহিয়ো জোরা রে
ঘর আয়ো জী স্যাম মোরা।
উমড় ঘুমড় চহুঁ দিস সে আয়া
গরজত হ্যায় ঘন ঘোরা।
দাদুর মোর পপীহা বোলে······

শ্রাবণের প্রচণ্ড দাপট। ঘরে এলো আমার শ্যাম। ফুলে ফেঁপে মেঘ ঘিরে এলো চারদিক থেকে, ঘনঘোর সেই মেঘের গর্জন। দাদুরী ময়ূর আর পাপিয়ার ডাক—।

ভীজই ম্বারী দাঁওয়ন চীর।
সাওয়ণি য়ো লুম রহিয়ো রে···

শাড়ির আঁচল ভিজে যাচ্ছে। দুলে দুলে বইছে শ্রাবণের দমকা হাওয়া—।

বাদর দেখী ডরী হো স্যাম
ম্যঁয় বাদর দেখী ডরী।
কারী পীরী ঘটা উমড়ী,
বরসী এক ধড়ী···

মেঘ দেখে ভয় পেলাম শ্যাম, আমি মেঘ দেখে-ভয় পেলাম। হলদে কালো মেঘ ঘিরে এলো। আর একটানা বর্ষা—।

মেহা বরসিও করে রে
আজ তো রমিয়ো মেরে ঘরে রে।
নান্হীঁ নান্হীঁ বুদ
মেঘ ঘন বরসে···।

মেঘ আর মেঘ আর বৃষ্টি। আজ আমার ঘরে পরম প্রিয়। ছোটো ছোটো বৃষ্টির ফোঁটা। মেঘ আর ঘন বর্ষা—

চম্পা আর চামেলীর চোখ মেঘলা আকাশ।

মীরা বললো—আমার এখানে ভয় বলে কিছু নেই, ভাবনা বলে কিছু নেই। শুধু ভালোবাসা আছে। ভালোবাসতে শেখো। দেখবে ভয় চলে গেছে।

চম্পা আর চামেলীর মন নিবিড় শ্রাবণ।

কিসের ভয়?—বললো মীরা,—কাকে ভয়?

চিতোরগড়ের রাওলার মেয়েদের মুখ দেখে মন বোঝা যায় না। ওরা ছেলেবেলা থেকে সে ভাবেই তৈরী। বনবীরের মতো ধূর্ত লোকও ধরতে পারলো না যে, চম্পা আর চামেলীর মন সমুদ্র হয়ে গেছে।

সে সব কথাই চম্পা ভাবছিলো।

॥ চব্বিশ ॥

কী আশ্চর্য,—বললো রতন সিংহ,—আমি তো কাউকে দেখতে পাই নি।

বনবীর উত্তর দিলো,—আমি জানতাম তুমি কাউকে দেখতে পাবে না।

সেজন্যেই আমি সঙ্গে যাই নি। আড়ালে লুকিয়ে ছিলাম। তাই দেখতে পেলাম। আমি জানতাম আমি দেখতে পাবো। সেভাবে সব ব্যবস্থা করে রাখা ছিলো। অন্ধকারে আমার লোক ওর পিছু নিলো এবং একটু পরে ধরে ফেললো।

ওর কাছে হার পাওয়া গেছে?—রতন সিংহ জিজ্ঞেস করলো।

—না।

—কিছু কবুল করেছে?

এখনও করেনি,—বনবীর হাসলো,—তবে না করে যাবে কোথায়? এর জন্যে নানা রকম ব্যবস্থা আছে আমাদের কয়েদখানায়।

হীরের হার কোথায় গেল?—বললো রতন সিংহ।

বনবীর উত্তর দিলো,—ওটা কি ঝট করে এমনিই পাঠিয়ে দেবে? মীরাবাঈ খুব চালাক। আগে আমাদের পাহারার ব্যবস্থা ভালো করে পরখ করবে মীরাবাঈ। দুজন তিনজন চারজন পাহারাদারদের চোখে যদি ধুলো দিয়ে চিতোরগড় থেকে বেরোতে পারে, তাহলে তারপর একদিন সাহস করে হীরের হারও পাঠিয়ে দেবে।

—তাহলে আপনার ধারণা হীরের হার এখনও মহলেই আছে?

—হ্যাঁ। এবং কোনোদিনই সেটা আর মহল থেকে বেরোবে না। আমাদের পাহারা আরো জোরদার হবে। চম্পা আর চামেলীও মীরাবাঈকে চোখে চোখে রাখবে সব সময়।

শুধু তাতে কী লাভ?—রতন সিংহ বললো,—হার আমার হাতে আসবে কি করে? ওঁর কাছ থেকে তো কেড়ে নেওয়া যাবে না। আর যাই হোক, উনি সিসোদিয়াদের কুলবধূ। তাঁর উপর হামলা করা চলবে না।

বনবীর হাসলো। বললো,—উনি নিঃসন্তান। উনি মারা যাওয়ার পর ওঁর সব কিছু তো মহারাণারই সম্পত্তি।

—তদ্দিন অপেক্ষা করতে হবে?

বেশীদিন নয়,—বনবীর উত্তর দিলো।

রাণা অবাক হয়ে তার দিকে তাকালো।

বনবীর অন্যদিকে তাকিয়ে হাসিমুখে উত্তর দিলো,—প্রতিপক্ষের যে কোনো চাল নিজের সুবিধে মতো ব্যবহার করার নামই রাজনীতি। এই যে লোকটা ধরা পড়লো, সেটা জানাজানি হয়ে গেছে। যারা আমাদের পক্ষে ওরা মীরাবাঈয়ের উপর ক্ষেপে উঠেছে। যারা আমাদের বিপক্ষে, ওরা

বিশ্বাস করছে না। বলছে, ঘটনাটা আমাদের সাজানো, মীরাবাঈয়ের পক্ষে কিছুতেই গভীর রাতে নির্জন মন্দিরে পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হওয়া সম্ভব নয়। এরকম একটা বিতর্ক সৃষ্টি হওয়া ভালো। তাতে আমাদেরই সুবিধে।

রাণা কোনো প্রশ্ন করলো না। শুধু অবাক চোখে তাকিয়ে রইলো।

বনবীর বলে গেল,—সিসোদিয়াদের একটা পুরোনো রীতি আছে। কুলবধূর সম্বন্ধে কোনো অপবাদ শোনা গেলে তাকে মা কালীর চরণামৃত খেতে দেওয়া হয়। সে যদি দোষী হয়, তাহলে নাকি তক্ষুনি মারা যায়। যদি নির্দোষ হয়, তাহলে নাকি কিছু হয় না।

—সত্যি সত্যি ওরকম হয়?

হতে পারে,—বনবীর উত্তর দিলো,—হওয়া দরকার। সেই জলে সবার অজান্তে একটু বিষ মিশিয়ে দিলেই হোলো।

না, না,—একটু শিউরে উঠলো রতন সিংহ।

—কেন?

একটু ইতস্তত করে রতন সিংহ বললো,—দরবারের সর্দারেরা বোকা নয়। ওরা সন্দেহ করতে পারে যে, মা কালীর চরণামৃতে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ওরা বোকা নয়,—বনবীর আস্তে আস্তে বললো,—তবে আমার বুদ্ধি ওদের চাইতে অনেক বেশী। সেই জল দরবারে সবার সামনে তুমি একটু খাবে। তোমার কিছু হবে না। তারপর সেটি এমন একজনের মারফত পাঠানো হবে যার সততা সম্বন্ধে কারো মনে কোনো প্রশ্ন আসবে না। যেমন ধরো, দয়ারাম পাণ্ডে।

—তাহলে বিষ মেশানো হবে কি করে?

—তুমি জল একটুখানি খাবে। তারপর সবার অলক্ষ্যে তুমিই বিষ মিশিয়ে দেবে।

আমি?—আঁতকে উঠলো রাণা রতন সিংহ।

রাণাজী!—বনবীর গম্ভীর হোলো,—তোমার মন বড় দুর্বল।

—না, না, আমি পারবো না।

—রাণাজী!

রতন সিংহ বনবীরের দিকে তাকালো। বনবীরের চোখে সাপের মতো চাউনি।

আচ্ছা, আচ্ছা, তাই হবে,—রতন সিংহ চোখ নামিয়ে বললো।

বনবীর আবার সহজ হোলো। হালকা গলায় বললো,—তবে এমনও হতে পারে যে, মায়ের চরণামৃত পান করার আগেই মীরাবাঈ মারা গেছেন বিষাক্ত সাপের কামড়ে।

রতন সিংহ অবাক।—বিষাক্ত সাপ? কি করে?

—গিরধরজীর পূজোয় ফল লাগে প্রত্যেকদিন। কয়েক ঝুড়ি ফল যায় মন্দিরে। মনে করো তারই একটিতে ছিলো বিষাক্ত সাপ। কি করে ফলের ঝুড়িতে সাপ এলো সে আমরা বুঝবো। কিন্তু লোকে এটাই জানবে যে রাণার নির্দেশে মায়ের চরণামৃত পান করার সাহস মীরাবাঈয়ের ছিলো না। তাই তিনি বিষাক্ত সাপ আনিয়ে আত্মহত্যা করলেন।

রতন সিংহের মুখে চিন্তার ছায়া নামলো। অন্যদিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—ওদিকের কি খবর?

সবই পরিকল্পনা মতোই হতে শুরু করেছে। রাও সেখাজী ফৌজ নিয়ে জোধপুর আক্রমণ করেছে। রাও গাঙ্গা এখন নিজের রাজধানী রক্ষা করতে ব্যস্ত। সে সাহায্য করতে পারবে না মেড়তা রাজ্যকে। কুমার মালদেব মেড়তা অবরোধ করে বসে আছে। বীরমদেবের মেড়তায় ফেরার পথ নেই। কুমার জয়মল একাই যতোটা সম্ভব মেড়তা শহর রক্ষা করার চেষ্টা করছে যদ্দিন পারে। কিন্তু মেড়তার রাজকোষ প্রায় শূন্য।

সেদিন সকালবেলা স্নান ও পূজো সেবে নেওয়ার পর মীরা বসে গীতগোবিন্দ পড়ছিলো। চামেলী সেখানে ছিলো না। শুধু চম্পা একলাই বসে ছিলো মীরার কাছে। চামেলী একটু পরে ফিরে এলো।

বনবীর সিংহ ডেকে পাঠিয়েছে,—বললো চম্পা।

চম্পা চলে গেল। মীরা পুঁথি থেকে মুখ তুলে চামেলীকে বললো,—বোসো। ভট্টোজীর সঙ্গে দেখা হয়েছে?

হ্যাঁ,—উত্তর দিলো চামেলী,—উনি জানালেন, অনন্ত মিশ্র মেবার রাজ্যের সীমানা পার হয়ে চলে যেতে পেরেছেন। কিন্তু হরিরামজী ধরা পড়েছেন বনবীরের লোকের হাতে।

ধরা পড়েছে?—মীরাকে একটু চিন্তিত দেখালো।—আমারই জন্যে।—একটু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

—উপায় ছিলো না বাঈসা। বনবীর সিংহ মিশ্রজীর পিছু নিয়েছিলেন। অন্ধকারে হরিরামজীকে লুকিয়ে রাখার ব্যবস্থা আগের থেকে করে না রাখলে বনবীরজী অনন্ত মিশ্রকেই ধরে ফেলতো। আমার ইশারা পেয়ে মিশ্রজী

অন্ধকারে লুকিয়ে পড়লো আর হরিরামজীই তার জায়গায় পথ ধরে এগিয়ে গেল। অন্ধকারে এই লোক বদল বনবীর সিংহ ধরতে পারলো না। সে চলে গেল হরিরামজীর পেছন পেছন। বনবীরকে এভাবে ধোঁকা দিতে না পারলে হীরের হার চিতোরের বাইরে পাচার করে দেওয়া যেতো না।

—হারটা বিক্রির ব্যবস্থা হয়েছে?

—জোহরী বাজারের শেঠ ওঙ্কারমল হারটা নিয়ে একটা হুণ্ডি দিয়েছেন মিশ্রজীকে। আর দামের খানিকটা নগদ দিয়েছেন আমাদের তেজ সিংহকে।

মীরা বললো,—তেজ সিংহকে জানাও, আমার হুকুম, কয়েদখানার দারোগাকে কিছু টাকা দেবে। হরিরামজীকে যেন উৎপীড়ন করা না হয়। তারপর আমি দেখছি ওকে কি করে ছাড়িয়ে আনা যায়।

মেড়তার ওদিক থেকে কোনো খবর এসেছে?—চামেলী জিজ্ঞেস করলো।

মীরা হাসলো,—হ্যাঁ, মালদেব শম্ভু সিংহের মারফত আমাদের কাছ থেকে টাকা নিতে রাজী হয়েছে। সে মেড়তা এমন ভাবে ঘিরে রাখবে যে, এখানে রাণাজী আর বনবীর ভাববে মেড়তা আমাদের হাতের মুঠোয় এসে গেল বলে। অথচ মালদেব কিছু করবে না, একটু পথ খোলা রাখবে যাতে রসদ যেতে পারে মেড়তার ভিতর। অনন্ত মিশ্রও মেড়তায় ঢুকবে সেই পথ দিয়ে।

আমায় বিশ্বাস করে এত কথা বলছেন?—একটু কেঁপে গেল চামেলীর গলা।

মীরার মুখ সকাল বেলার মল্লিকা। একটু হেসে বললো,—তোমাদের বিশ্বাস না করলে তোমাদের আপন করে নিলাম কেন?

চামেলী ভেজা চাউনিতে মীরার দিকে তাকালো। তারপর বললো,—আশ্চর্য ব্যাপার! কুমার মালদেবজী তো রাণাজী আর বনবীর সিংহের বন্ধু। উনি টাকা নিতে রাজী হলেন?

—এসব রাজনীতি চামেলী। ওরা নিজেদের স্বার্থে বন্ধু হয়, নিজেদের স্বার্থে একজন আরেকজনের বিরুদ্ধে দাবার চাল দেয়। মালদেবের এখন টাকার দরকার। তার নজর মারওয়াড়ের সিংহাসনের দিকে।

সে কি!—চামেলী অবাক হোলো,—কুমার মালদেব মারওয়াড়েরই যুবরাজ। রাও গাঙ্গার মৃত্যুর পর সিংহাসন তো উনিই পাবেন।

—ওর তো অপেক্ষা করার ধৈর্য নেই চামেলী।

—কিন্তু বনবীর তো ওঁকে সাহায্য করতে পারতেন এ ব্যাপারে।

—না, বনবীরের সাহায্য সে পাবে না। মালদেব ঠিক এসময় মারওয়াড়ের রাজা হোক এটা সে চায় না।

—কেন ?

—মালদেব রাজা হলে খুব শক্তিশালী হয়ে পড়বে। বনবীর তাকে নিজের কবজায় রাখতে পারবে না। তাতে রতন সিংহের অসুবিধে।

—মালদেব জানে একথা ?

—নিশ্চয়ই জানে। সে জন্যেই আমাদের কাছ থেকে টাকা নিতে রাজী হয়েছে।

চম্পা যখন ফিরে এলো চামেলী একা চুপচাপ বসে আছে দরজার পাশে। মীরাবাঈ সুর করে গীতগোবিন্দ পাঠ করছে।

চামেলী মুখ ফিরিয়ে দেখলো চম্পার পেছনে আরেকটি লোক। তার মাথায় একটি ঝুড়ি।

চোখ তুলে তাকালো মীরাবাঈ।

গিরধরজীর সেবার জন্যে কিছু ফল,—বললো, চম্পা।

কে পাঠিয়েছেন ?—চামেলী জিজ্ঞেস করলো।

পেছনের লোকটি উত্তর দিলো,—মহারাণাজী।

—রেখে যাও।

আপনি একবার দেখবেন না ?—লোকটি জিজ্ঞেস করলো।

মীরা তাকিয়ে দেখলো চম্পার মুখের দিকে। ওর মুখ গম্ভীর, কোনো রকম অভিব্যক্তি নেই।

দেখবো ?—জিজ্ঞেস করলো মীরা,—আচ্ছা, এখানেই নামিয়ে রাখো।

চামেলী একবার তাকালো চম্পার দিকে, তারপর সেই লোকটির দিকে। তার একটু সন্দেহ হোলো। সে নিজেই খুলতে গেল ফলের ঝুড়ির ঢাকনা।

না,—মীরা বলে উঠলো,—আমিই খুলবো।

চামেলী লোকটির মুখের দিকে তাকালো। লোকটির সারা মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে। চামেলীর হঠাৎ ভয় ভয় করতে লাগলো। সে তাকালো চম্পার দিকে। চম্পার মুখ এখন একটি মুখোশ। চামেলী তাকালো মীরার দিকে, মীরার মুখ গীতগোবিন্দের পাঠিকার মতো। সে খুব নিশ্চিন্ত মনে, খুব সহজভাবে ফলের ঝুড়ির ঢাকনা তুলে নিলো।

আর সঙ্গে সঙ্গে চম্পা চামেলী আর অন্য লোকটি আঁতকে উঠে পেছনে সরে গেল।

ঝুড়ির ভেতর থেকে একটি সাপ ফণা উঁচু করে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

মীরাও চোখ বুজলো। তবে শুধু একটি মুহূর্ত। আবার যখন চোখ খুললো, সে চোখ শরতের দীঘি। মীরা নড়লো না, সরলো না একটুও। নিশ্চিন্ত চাউনি মেলে তাকিয়ে রইলো।

কয়েক মুহূর্ত সাপটি তেমনি রইলো ফণা উঁচিয়ে। তারপর আস্তে আস্তে ফণা গুটিয়ে মুখ নামিয়ে নিলো। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এলো ফলের ঝুড়ি থেকে। মন্থর গতিতে মন্দির থেকে বেরিয়ে গেল। তারপর হারিয়ে গেল আতাবনের ভিতর।

চামেলী তখন এগিয়ে এসে দেখলো ঝুড়ির ফলগুলির উপর একটি শালগ্রাম শিলা। সেটি তুলে দিলো মীরার হাতে। মীরা সেটি নিয়ে নামিয়ে রাখলো গিরধরজীর বিগ্রহের সামনে। তারপর আবার মন দিলো গীতগোবিন্দের পুঁথিতে।

চম্পা আর চামেলীর চোখ জলে টলটল করছে। যে লোকটি ফলের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে এসেছিলো তার মুখ শাদা হয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি চলে গেল সেখান থেকে।

মীরা গীতগোবিন্দ পাঠ করছে নিজের মনে। চম্পা চামেলীকে নিয়ে মন্দিরের বাইরে এসে বসলো।

চম্পা নিচু গলায় বললো,—এ সাপের বিষদাঁত ছিলো না।

—কে পাঠিয়েছে? রাণাজী নিজের থেকে নিশ্চয়ই পাঠান নি।

বনবীর,—বললো চম্পা। আস্তে আস্তে শোনালো পুরো ব্যাপারটা।

ফলের ঝুড়িতে বিষাক্ত সাপই ভরে দেওয়া হয়েছিলো। তার আগে একটি কুকুর ছানার উপর পরখ করে দেখা হয়েছে চম্পার সামনেই। যে লোকটিকে ফলের ঝুড়ি বয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ডাকা হোলো সেও বনবীরের খুব বিশ্বস্ত। চম্পাকে যখন বলা হোলো ওকে সঙ্গে করে মীরার কাছে নিয়ে যেতে হবে, চম্পার তো হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

কিন্তু উপায় নেই। বনবীরের হুকুম। চম্পা চললো লোকটার পেছন পেছন।

রাণার মহলের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে বিরাট ফলের বাগান। দুজনে এগিয়ে চললো গাছের ছায়ায় ছায়ায়। এক জায়গায় বেশ ঝোপঝাড়। চম্পা লক্ষ করলো সেখানে একজন লোক নিচে ঝুঁকে কি যেন খুঁজছে।

চম্পার সঙ্গের লোকটি দাঁড়িয়ে পড়লো। ওই লোকটি এর চেনা। জিজ্ঞেস করলো,—কি খুঁজছো দিগম্বর?

সে খুব বিচলিত। বললো—পোড়া কপাল আমার। এখানে হঠাৎ হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলাম। হাতে ছিলো চারটে সোনার মোহর। সেগুলি ছিটকে পড়ে গেল এই ঝোপের মধ্যে।

সোনার মোহর?—এ লোকটি বলে উঠলো,—কোথায় পেলে?

—তেজ সিংহের একটা কাজ করে দিয়েছিলাম। খুশী হয়ে মোহর বকশিশ করেছিলেন। আমি একলা তো খুঁজে পাচ্ছি না। তুমিও আমার সঙ্গে একটু খোঁজো না ভাই।

কিন্তু এ লোকটির হাতে সময় নেই। তাকে ফলের ঝুড়ি নিয়ে যেতে হচ্ছে মীরাবাঈয়ের মহলে।

—মোহর চারটে যদি খুঁজে পাই, একটি তোমার।

লোকটি রাজী হয়ে গেল। ফলের ঝুড়ি নামিয়ে চম্পার সামনে রেখে সেও মোহর খুঁজতে লেগে গেল। খুঁজতে খুঁজতে দুজনে অদৃশ্য হোলো ঝোপঝাড়ের আড়ালে।

তখন এদিকের গাছগুলোর আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো দুজন লোক। তাদের হাতে আরেকটি ফলের ঝুড়ি। অবিকল এই ঝুড়িটার মতো।

চম্পা বুঝলো। একটু হাসি ফুটে উঠলো তার মুখে।

ওদের একজন রুমালে বাঁধা কিছু একটা তাকে দিতে চাইলো।

—কি এটা?

কয়েকটা মোহর,—সে বললো,—আপনাকে দিতে বলা হয়েছে।

আমাকে কিছু দিতে হবে না,—চম্পা বললো।

নিঃশব্দে ঝুড়ি বদল হয়ে গেল। ওরা আবার সরে গেল চোখের আড়ালে।

দিগম্বরের মোহর চারটি খুঁজে পাওয়া গেল। চম্পার সঙ্গের লোকটি তার পাওনা মোহরটি হাতে নিয়ে হাসিমুখে ফিরে এলো। চম্পার সামনে সেই একই রকম ফলের ঝুড়ি। লোকটি কিছুই জানলো না। সেটি মাথায় তুলে নিয়ে এগিয়ে চললো। হালকা মনে পেছন পেছন এলো চম্পা।

চম্পা বললো,—জানি না ঝুড়িটা বদলে দিলো কারা। জানবার চেষ্টাও কোনোদিন করবো না। তবে মীরাজীকে ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন এমন তো অনেকেই আছেন রাণাজীর মহলে।

॥ পঁচিশ ॥

না, না, এটা কোনো অলৌকিক ব্যাপার নয়,—বনবীর দাঁতে দাঁত ঘষে বললো,—এর মধ্যে কোনো কারচুপি আছে। যে লোকটা ঝুড়ি বয়ে নিয়ে গিয়েছিলো তাকে কয়েদখানায় পুরে একটু ধোলাই দিলেই রহস্যটা জানা যাবে। শোনো, এবার তাহলে মা কালীর চরণামৃত পাঠাতে হবে মীরাবাঈয়ের কাছে। এবং তার মধ্যে বিষ মিশিয়ে দিতে হবে সবার অলক্ষ্যে।

কে মেশাবে?—জিজ্ঞেস করলো রাণা রতন সিংহ।

—কে আবার। বিষ মেশাবে তুমি নিজে।

রতন সিংহ বিষণ্ণ হয়ে চুপ করে রইলো। বনবীর আধবোজা চোখে তার দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর খুব গাঢ় নরম গলায় বললো,—রাণাজী, স্ত্রীলোকের প্রাণ নিতে কি আমার খুব ভালো লাগছে? আমিও তো রাজপুত। মীরাজী আমাদের কুলবধূ। কুমার ভোজরাজ বেঁচে থাকলে তিনিই হতেন রাণা, মীরাবাঈ হতেন মেবারের মহারানী। তি'ন সাধিকা, তিনি অসাধারণ কবি। তাঁকে তো আমাদের মাথায় তুলে রাখা উচিত।

কিন্তু রতন সিংহ,—দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো বনবীর,—আমাদের উপায় নেই। রাজনীতি বড়ো নির্মম। মীরাবাঈ শুধু নিজের সাধন ভজন নিয়ে পড়ে থাকলে আমাদের কিছু বলার থাকতো না। কিন্তু তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছেন। মোগল বাদশাহ বাবরের সঙ্গে তিনি যোগাযোগ করেছেন। বাবর সাহায্য করছেন আমাদের শত্রুদের। আমার কাছে খবর আছে যে, বাদশাহ বাবর মীরাজীর মারফতে মেবারের অনেক সর্দারকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে। তুমি বলো রাণাজী, আমরা কি চোখ বুজে বসে থাকবো?

রতন সিংহ আস্তে আস্তে বললো,—বনবীরজী, আমি চিরকাল মীরাবাঈকে শ্রদ্ধা করে এসেছি, ওঁকে ভক্তি করে এসেছি, ওঁর কোলে পিঠে চড়েছি। তিনি কি আমার পর? কুমার ভোজরাজ অকালে মারা গেলেন বলে রাণা হলাম আমি, তাই বলে কি আমি তাঁর পর? আজ তিনি চান আমাকে রাণার গদি থেকে সরিয়ে বিক্রমজিত রাণা হোক? কেন? আমি কি তাঁর এতই পর?

রতন সিংহ বলে গেল,—উনি যদি আমাকে এতই পর মনে করেন, আমি তাঁর সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রাখতে পারি, তাঁকে কয়েদ করে রাখতে পারি,

তাঁকে নির্বাসিত করতে পারি। কিন্তু বিষের পেয়ালা পাঠাবো তাঁর কাছে? চরণামৃতে বিষ মেশাবো আমি? মেশাবো নিজের হাতে?

বেশ, তোমাকে মেশাতে হবে না,—বনবীর গম্ভীর গলায় বললো,—আমিই মেশাবো।

আপনি?—রতন সিংহ অবাক চোখে তাকালো। তারপর চোখ দুটো ফিরিয়ে নিলো। তার মনে হোলো বনবীর স্থির দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। তার অস্বস্তি লাগলো। কিছুক্ষণ পায়চারি করলো এদিক ওদিক। তারপর বনবীরের সামনে এসে দাঁড়ালো।

বেশ, আপনি যা চান তাই হবে,—রতন সিংহ হতাশ গলায় বললো,—আমি নিজের হাতেই বিষ মেশাবো মায়ের চরণামৃতে।

রাতটা কখন কেটে গেল রতন সিংহ বুঝতেই পারলো না। মনে হোলো যেন বনবীরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চোখটা বুজেছিলো, আবার চোখটা খুলতেই সামনে দিনের আলো আর বনবীর আর খাস দরবার আর সর্দারদের সারি।

পেয়ালায় ঢেলে দেওয়া হয়েছে কালীমন্দির থেকে আনানো চরণামৃত। রাণা সেটি মাথায় ঠেকালো তারপর নিজে চুমুক দিলো পেয়ালায়।

সামনে ঝুঁকে পড়লো বনবীর। সবার অলক্ষ্যে তার হাত নেমে এলো রতন সিংহের হাতের উপর। একটি পুরিয়া গুঁজে দিলো সেই হাতে।

মেশাও,—বনবীর ফিসফিস করে বললো।

রাণার চারদিকে সব কিছু যেন দুলছে। তার কানে এলো বনবীরের কথাগুলো।

—আপনারা সবাই দেখলেন, রাণাজী নিজে চরণামৃত পান করলেন। এই চরণামৃত এখন পাঠানো হবে মীরাবাঈয়ের কাছে। তিনি যদি নির্দোষ হন, তাহলে তাঁর কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু তিনি যদি দোষী হন…

চামেলী দাঁড়িয়ে আছে একটু দূরে। বনবীরের কথাগুলো শুনতে শুনতে তার মুখ ফেকাশে হয়ে গেল।

দয়ারাম পাণ্ডেয়,—বনবীর ডাকলো।

দয়ারাম পাণ্ডেয় বয়স্ক লোক, দরবারের সব সর্দারদেরই অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন। অত্যন্ত শ্রদ্ধার পাত্র। সে এগিয়ে এলো। তার হাতে একটি সোনার থালা। বনবীর থালার উপর পেয়ালাটা রাখলো। রাণা রতন সিংহ রেশমী রুমাল দিয়ে ঢেকে দিলো সেই পেয়ালা।

সোনার থালা হাতে দয়ারাম পাণ্ডেয় বেরিয়ে গেল দরবার থেকে। তার পেছন পেছন গেল চামেলী।

সারা দরবার স্তব্ধ। সবাই এক এক টুকরো পাথর।

অনেকক্ষণ কেটে গেল। তারপর এক সময় পরিষ্কার শোনা গেল পায়ের শব্দ। দয়ারাম ফিরে আসছে। এখন একা। চামেলী ফেরেনি তার সঙ্গে।

বনবীরের মুখ খুশিখুশি। রাণাজী বিষ মিশিয়ে দিয়েছে নিজের হাতে। যা হবার তা তো হবেই।

রাণা রতন সিংহ পুতুল হয়ে আছে।

সামনে এসে দাঁড়ালো দয়ারাম পাণ্ডেয়। প্রশ্ন করার অধিকার রাণার। কিন্তু দরবারের আদবকায়দা তুচ্ছ করে বনবীরই জিজ্ঞেস করলো।

কি খবর দয়ারামজী?

মীরাবাঈ খুব শ্রদ্ধা এবং ভক্তির সঙ্গেই পান করেছেন মায়ের চরণামৃত।

তারপর?

পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গিরধরজীর বিগ্রহের সামনে নাচতে নাচতে গান গাইতে লাগলেন।

কি?—বনবীরের চোখ থেকে আগুন ঠিকরে বেরোলো।

বনবীর দ্রুত পায়ে বেরিয়ে চলে গেল। আস্তে আস্তে খালি হয়ে গেল দরবার কক্ষ। রতন সিংহ ক্লান্ত পায়ে মহলে ফিরে গেল।

অনেকক্ষণ ঝরোকায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো। মনে হোলো কেউ যেন নিচে গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে। শুধু একটি কলি ভেসে এলো,—

মীরা নাচী রে···।

আর কোনো কথা বোঝা গেল না। গানের সুর দূরে চলে গেল।

রতন সিংহ পায়চারি করছিলো ঘরের ভিতর। বাইরে কে যেন গান গাইতে গাইতে চলে যাচ্ছে।

পগ বাঁধ ঘুঁঘরুয়া নাচী রে···

আবার গানের সুর দূরে মিলিয়ে গেল। রাণার মনে হোলো সারা চিতোরগড়েই যেন ছড়িয়ে পড়েছে মীরার গান। সবাই গাইছে গুনগুন করে।

আস্তে আস্তে অন্ধকার হয়ে আসছে। একটা মৃদু পায়ের শব্দ ঘরে ঢুকলো।

—রাণাজী, আমি চম্পা। খুব জরুরী দরকার আপনার সঙ্গে।

রতন সিংহ চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললো,—এসো, এখানে

এসো। এখানে এই ঝরোকার পাশে এসে দাঁড়াও। দেখছো, কী অন্ধকার আকাশ? শোনো চম্পা, জরুরী কথা এখন থাক, আগে আমায় গানটি শোনাও, যে গান মীরাবাঈ আজ গেয়েছে গিরধরজীর মন্দিরে। সারাদিন আমার মন ছটফট করেছে গানটি শোনার জন্যে। সবাই শুনেছে ওই গান। শুধু আমি শুনি নি। এখন তোমায় পেয়েছি। তুমিই শোনাও।

চম্পা বুঝলো। তারপর গান ধরলো নরম গলায়।—

পগ ঘুঁঘরু বাঁধ মীরা নাচী রে।
লোগ কহে মীরা ভঈ রে বাবরী
সাস কহে কুলনাশী রে॥

মীরার পায়ে ঘুঙুর, মীরার পায়ে নাচের ছন্দ। মীরা নাকি পাগল হয়ে গেছে,—তাইতো বলছে লোকে। শুধু শাশুড়ি বলছে কুলনাশিনী।

বিষরো পিয়ালো রাণা ভেজিয়ো
পীওয়ত মীরা হাঁসী রে।

বিষের পেয়ালা পাঠিয়ে দিলো রাণাজী। মীরা হাসিমুখে সেটা খেয়ে নিলো সবটাই—।

মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর
বেগ মিলো অবিনাশী রে……

রাণা রুমাল দিয়ে চোখ মুছলো। তারপর বললো,—চম্পা, কেউ কোনোদিন জানবে না, আমি পেয়ালার জলে বিষ মেশাইনি মোটেও।

চম্পা অবাক হয়ে তাকালো।

রাণা বলে গেল,—আমার একটা অনুরোধ চম্পা, মীরাবাঈকে কোনোদিন একথা জানতে দিয়ো না। বনবীর বিষের পুরিয়া আমার হাতে দিয়েছিলো, কিন্তু ও যেই মুখ ফিরিয়ে দয়ারাম পাণ্ডেয়র দিকে তাকালো, আমি অমনি নিজের জামার ভাঁজের মধ্যে ফেলে দিলাম সেই বিষ।

কিছুক্ষণ দুজনেই চুপচাপ। তারপর রাণা রতন সিংহ বললো,—হ্যাঁ, এবার বলো আমার সঙ্গে তোমার জরুরী দরকারটা কি।

—রাণাজী, মীরাবাঈ আমায় পাঠিয়েছেন আপনার কাছে। একটা কথা খুব গোপনে জানাতে বললেন আপনাকে।

—বলো।

—আপনার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র হচ্ছে।

—ষড়যন্ত্র? আমার বিরুদ্ধে?

—হ্যাঁ। এবং এর পেছনে আছেন বনবীর সিংহ।

রতন সিংহ অবাক হোলো। বললো,—আমি মীরাবাঈকে বিষের পেয়ালা পাঠিয়েছিলাম। আর উনি আমায় ষড়যন্ত্রের খবর দিয়ে সাবধান করে দিচ্ছেন? কিন্তু কেন?

—সে অনেক কথা। আপাতত এটুকু বলতে পারি, বনবীরের হাতে কোনো রকম ক্ষমতা আসুক এটা মীরাবাঈ চান না, কারণ তাতে দেশের সাধারণ মানুষের কোনো উপকার হবে না। বরং ক্ষতি হবে। কে রাণা, তাতে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই। দেশের লোক সুখে শান্তিতে থাকলেই তিনি খুশী।

হ্যাঁ, এসব এখন আমি বুঝতে পারছি একটু একটু করে,—রতন সিংহ বললো,—এবার আহেরিয়ার উৎসবে আমি যাচ্ছি বুঁদী। রাও সুরজমলের আমন্ত্রণ। যেতে তো হবেই। সাবধানেই থাকবো। ফিরে আসি। তারপর একবার দেখে নেবো বনবীরকে!

রাণা রতন সিংহ আহেরিয়া উৎসবের আমন্ত্রণে চলে গেল বুঁদী। খবর শুনে মীরা বিষণ্ণ হয়ে রইলো। চম্পা ও চামেলীকে বললো,—না গেলেই পারতো। আমি সব খবর বড্ড দেরিতে পেলাম। যাই হোক, ও ফিরে আসার পর একবার চেষ্টা করে দেখবো বনবীরের হাত থেকে ওকে রক্ষা করতে পারি কিনা।

কিন্তু রতন সিংহ আর ফিরে এলো না।

আহেরিয়ার উৎসবে শিকারের সময় রাও সুরজমল হঠাৎ তলোয়ার বসিয়ে দিলো রতন সিংহের বুকে। রতন সিংহও বদলা নিলো সঙ্গে সঙ্গেই, সুরজমলের পেটে ঢুকিয়ে দিলো নিজের বর্শা।

দুজনেই মারা গেল।—চৈত্র মাস। পনেরো শো একত্রিশ খ্রীষ্টাব্দ।

॥ ছাব্বিশ ॥

নতুন রাণা হোলো বিক্রমজিত, রাণা সাঙ্গার ছোটোরানী কারমেতন বাঈয়ের বড়ো ছেলে। মোটে চোদ্দো বছর বয়েস।

কিন্তু কারমেতন বাঈয়ের মনে সুখ নেই। এখনও আসল ক্ষমতা বনবীরের হাতেই। এখনও চিতোরগড়ে ভয়ের পরিবেশ আগেরই মতো। কেউ মুখ খোলে না।

কারমেতন বাঈ মাঝে মাঝে আসে শুধু মীরার কাছে। শুধু ওরই সঙ্গে মন খুলে কথা বলা যায়।

কি লাভ হোলো ?—বললো কারমেতন বাঈ,—বিক্রমজিত নাবালক, ওর হয়ে রাজ্যশাসন করার কথা আমারই। কিন্তু বনবীর সবাইকে হাত করেছে, আমার দাদা স্থরজমলজী বেঁচে থাকলে এরকম হতে পারতো না।

উনি রতন সিংহকে খুন করতে গেলেন কেন ?—মীরা বললো,—রতন সিংহ তো ওঁর সঙ্গে একটা আপোস মীমাংসা করার জন্যেই গিয়েছিলো। সেটা হলে চিতোরে ফিরে এসে বনবীরকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা রাণাজীর পক্ষে সহজ হোতো।

কারমেতন বাঈ মুখ কালো করে উত্তর দিলো,—খুন করার কোনো ষড়যন্ত্র স্থরজমলজী করেন নি। রতন সিংহের সঙ্গে একটা রফা করে নেওয়ার ইচ্ছে তাঁরও ছিলো। কিন্তু তিনি খবর পেলেন যে রতন সিংহ শিকার করার সময় ওঁকে খুন করার মতলব করেছে। তাই তিনি ভয় পেলেন। রতন সিংহ কিছু করার আগেই তাঁকে জঙ্গলের মধ্যে একলা পেয়ে বুকে তলোয়ার বসিয়ে দিলেন।

মীরা বললো,—আমি অবাক হবো না যদি স্থরজমলজীকে রতন সিংহের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ওরকম একটা সাজানো খবর দিয়ে থাকে বনবীরেরই কোনো লোক।

যা দিনকাল, কোনো কিছুতেই আমি আর অবাক হই না,—কারমেতন বাঈ আস্তে আস্তে বললো,—ভেবেছিলাম কোনো বড়ো রাজবংশের মেয়ের সঙ্গে বিক্রমজিতের বিয়ে দিয়ে তার হাত শক্ত করবো, কিন্তু তাও তো হওয়ার নয়। বনবীর হতে দেবে না। এবং বিক্রমজিতকে মেয়ে দেবে না কোনো রাজপুত রাজবংশ।

কথাটা কারো অজানা নয়। কিন্তু কেউ মুখ ফুটে বলতে চায় না।

কোনো স্ত্রীলোক সহ্য করতে পারে না বিক্রমজিত। মেয়েদের জন্যে তার কোনো আসক্তি নেই। সবাই বলাবলি করে, এমন কি করে হোলো রাণা সাঙ্গার ছেলে ? রতন সিংহের মধ্যেও একটা পৌরুষ ছিলো। মন যতোই দুর্বল হোক, চলন বলনে মনে হোতো, হ্যাঁ, সিসোদিয়া বংশেরই ছেলে।

কিন্তু বিক্রমজিত একেবারে অন্যরকম। একেবারে মেয়েলী।—ভাবভঙ্গী কথাবার্তা সব কিছু। তাকে দেখলে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নেয় দরবারের সর্দারেরা। তার একমাত্র সঙ্গী শুধু বনবীর দলের কয়েকজন বাছাই করা শক্তিমান তরুণ।

ওর উপর আমি আর কোনো আশা রাখি না,—বলতে বলতে কেঁদে ফেললো কারমেতন বাঈ,—আমার এখন ভাবনা উদয়কে নিয়ে।

কারমেতন বাঈয়ের ছোটো ছেলে উদয়সিংহ, রাণা বিক্রমজিতের ছোটো ভাই। এখন মোটে দশ বছর বয়েস। কিন্তু এরই মধ্যে তার ভাবভঙ্গীতে মাঝে মাঝে ফুটে ওঠে রাণা সাঙ্গার ব্যক্তিত্বের কিছুটা আভাস। বিক্রমজিতকে যারা পছন্দ করে না, তারা এরই মধ্যে উদয় সিংহের দিকে তাকাতে শুরু করেছে একটা অর্থপূর্ণ সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে।

চন্দ্রসিংহের কাছে সবে তলোয়ার শিখতে শুরু করেছিলো উদয় সিংহ। বনবীর হুকুম দিলো, উদয় এখনও ছোটো। এখনই ওকে তলোয়ার শিখতে হবে না। ওসব বন্ধ করো। পরে দেখা যাবে।

আমার তো ভয় করছে,—কারমেতন বাঈ বললো,—উদয়কে আমি আগলে আগলে রাখছি।

মেবারের বড়ো দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে,—বললো মীরা,—সমস্যা শুধু রাণাজীর বা আপনার নয়, সমস্যা সারা দেশের।

বছরখানেক আগে মারা গেছে বাবর শাহ। এখন নতুন বাদশাহ হুমায়ুন। মোগলদের নজর আছে এদিকে। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শা'র মতলবও ভালো নয়। রাইসিনের রাও সিলহদীকে মেরে দখল করেছে সেই রাজ্য। কিন্তু বনবীরের হুকুম, মেবারের সৈন্য রাইসিনের জন্যে লড়তে যাবে বাহাদুর শা'র সঙ্গে। গুজরাটের ফৌজ এবার খুব দূরে নয়। তবু বনবীর চুপ করে আছে।

আমাদের বন্ধু কেউ নেই,—কারমেতন বাঈ বললো,—রতন সিংহ মারা যাওয়ার পর মারওয়াড়ের কোনো সহানুভূতি নেই মেবারের জন্যে। বুঁদীর ভেতর নানা গণ্ডগোল, রাও সুরতানকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে গদি থেকে। বুঁদী আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে গেছে। বীরমদেবজী মেড়তায় ফিরে এখন ঘর সামলাতেই ব্যস্ত। কে আছে যে আমাদের রক্ষা করবে? এদিকে তো বনবীরের নজর নেই। সে চায় শুধু ক্ষমতা, শুধু ক্ষমতা, শুধু ক্ষমতা।

কেন চায় জানেন?—মীরা জিজ্ঞেস করলো।

—কেন? বনবীর কি গুজরাটের হাতে কিংবা মোগলদের হাতে মেবারকে তুলে দিতে চায়?

না, তা চায় না,—মীরা হাসলো,—সে চায় মেবার খুব বিপদে পড়ুক। বিক্রমজিত তো আর দেশকে বাঁচাতে পারবে না। তখন তাকে সরিয়ে বনবীর নিজে রাণা হয়ে বসলে কেউ হয়তো আর আপত্তি করবে না, তাকে ঠেকাতেও পারবে না।

কী সাংঘাতিক,—বলে উঠলো কারমেতনবাঈ।

আপনি ভয় পাচ্ছেন, কিন্তু আমি ভয় পাচ্ছি না,—মীরা উত্তর দিলো,—আমি জানি কুটিল লোকের অঙ্ক কষে ছক কাটা পথে ইতিহাস চলে না। আমার কাছে গিরধরজীই ইতিহাস, ইতিহাসই গিরধরজী। উনি পথ চলেন নিজের হিসেবে।

কাছেই ঘুরঘুর করছিলো কারমেতনবাঈয়ের কিশোরী মেয়ে উদাবাঈ, বছর বারো কি তেরো বয়েস।

মীরা তাকে ডাকলো, আদর করে কাছে বসালো, তারপর হেসে বললো,—হ্যাঁ ভাই ননদজী, খুব মন দিয়ে আমাদের কথা শুনছো। শুনতে ভালো লাগছে বুঝি?

উদাবাঈ খুব পাকা পাকা কথা বলতে শিখেছে এ বয়সেই। মুখ লাল করে বললো,—আমার কি গরজ পড়েছে আপনাদের কথা শোনার? আমায় কী মনে করেন মীরাবাঈ? রাণাজীর চর?

উদাবাঈ গাল ফুলিয়ে দুমদাম করে চলে গেল সেখান থেকে।

তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছিলো উদাবাঈ। হঠাৎ শুনলো কে যেন ডাকছে থামের আড়াল থেকে।

—উদাবাঈ!

সে ফিরে তাকালো। থামের পাশে বনবীর। মুখে মিষ্টি হাসি।

উদাবাঈ খুশী হোলো। ওর ধারণা চিতোরগড়ে শুধু তাকেই খুব সমীহ করে কথা বলে বনবীর, আর কাউকে না। রানী কারমেতনবাঈকে না, স্বয়ং মহারাণাকেও না। ওর মনে হয় পুরুষ মানুষ বনবীরের মতোই হওয়া উচিত। লম্বা চওড়া চেহারা, গম্ভীর মুখ। গমগম করে গলার আওয়াজ। হুকুম করতে জানে। এর সঙ্গে রাণা বিক্রমজিতকে মনে পড়লে রীতিমতো খারাপ লাগে। বছর কয়েক আগেও তার সঙ্গে পুতুল খেলতো বিক্রমজিত। মাঝে মাঝে পুতুলকে বুকের কাছে ধরে দুধ খাওয়ানোর ভঙ্গী করতো। উদাবাঈয়ের রাগ হোতো, অবাক লাগতো। তার চাইতে অন্য ভাই উদয় সিংহ অনেক ভালো। সেই বাচ্চা বয়েসেই সে কাঠের তলোয়ার দিয়ে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলতো।

এতক্ষণ কোথায় ছিলে উদাবাঈ?—বনবীর জিজ্ঞেস করলো।

—মায়ের সঙ্গে মীরাবাঈয়ের মহলে।

—একা ফিরে আসছো যে?

উদাবাঈয়ের মুখ ভার। ভারী গলায় বললো,—মা আর মীরাবাঈ

গোপনে কথা বলছেন। আমি কথা শুনছিলাম বলে আমাকে বকুনি দেওয়া হোলো। তাই চলে এলাম।

বকুনি দেওয়া হোলো?—বনবীর ভুরু তুলে বললো,—তোমায়? তুমি এত ভালো মেয়ে, তোমায় বকতে পারে কেউ? এসো আমার সঙ্গে।

—কোথায়?

—তোমায় যারা ভালোবাসে, তাদের কাছে।

—আমায় কেউ ভালোবাসে না।

—সে কি কথা? আমরা সবাই ভালোবাসি তোমায়। রাণাজী, আমি, সব্বাই। তুমি মহারাণার এত আদরের বোন। তোমার কতো ইজ্জত। এসো।

প্রহরীরা চারদিকে সরে দাঁড়াচ্ছে। সামনে ঝুঁকে অভিবাদন করছে। গর্বে ফুলে উঠলো উদাবাঈয়ের বুক। সে ভাবলো, মীরাবাঈ এসে দেখে যাক চিতোরগড়ে তার কতো সম্মান।

রাণা বিক্রমজিতের খাস কামরায় তিন চারজন তরুণ যোদ্ধা। প্রত্যেকেরই খুব বলিষ্ঠ পেশীসংবদ্ধ পৌরুষদীপ্ত চেহারা। তাদেরই একজনের কাঁধে এলিয়ে হাসতে হাসতে কি যেন বলছিলো বিক্রমজিত। বনবীরকে দেখে থেমে গেল। বিরক্ত হোলো উদাবাঈকে দেখে।

বনবীর উদাবাঈকে নিয়ে বিক্রমজিতের কাছে এসে বসলো। বললো,—আমাদের খুব আদরের বোন উদাবাঈ। ওকে আমরা খুব ভালোবাসি।

ইঙ্গিতটা বুঝলো বিক্রমজিত। বিরক্তিকে হাসির আড়ালে রেখে বলে উঠলো,—তা তো বটেই, ও যে আমার একমাত্র বোন। কে আছো? মিষ্টি আর ফল নিয়ে এসো আমার বোনের জন্যে, আর এগারোটা মোহর।

রুপোর থালায় মিষ্টি এলো, ফল এলো, মোহর এলো। ফোয়ারা হোলো উদাবাঈয়ের মন।

ওরা কি বলছিলো?—বনবীর খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করলো।

॥ সাতাশ ॥

উদাবাঈ চলে যাওয়ার পর সবাই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

তারপর এক সময় বনবীর একটু হাসলো। বললো,—তাহলে রাণাজী, তোমায় গদি থেকে সরিয়ে আমিই রাণা হচ্ছি। এখন একথাটাই রটাতে চাইছে মীরাবাঈ।

স্পর্ধার সীমা নেই,—বিক্রমজিত বলে উঠলো,—সাধন ভজন করছেন, তাই নিয়ে পড়ে থাকুন। আবার কূটনীতি কেন? ষড়যন্ত্র কেন?

—রক্তে আছে। মীরাবাঈকে সে ভাবেই তৈরী করেছেন রাও দুদাজী, প্রশ্রয় দিয়েছেন রাণা সাঙ্গা,—বললো বনবীর। তারপর জিজ্ঞেস করলো,—অন্দরমহলের এসব সামান্য ব্যাপার নিয়েও কি আমায় মাথা ঘামাতে হবে?

আমার উপর ছেড়ে দিন,—বললো বিক্রমজিত,—আমি দেখছি। ভেবে দেখা যাক কি করা যায়। আঃ, গলাটা শুকিয়ে গেছে। এই, কে আছো?

মদের ঝারি এলো। পেয়ালা এলো। পেয়ালায় মদ ঢেলে চুমুক দিলো সবাই। বিক্রমজিতের নেশা ধরে আসছে একটু একটু করে।

বনবীর হঠাৎ হাত রাখলো তলোয়ারের হাতলে। তলোয়ার ঝনঝন করে উঠলো।

মীরা,—আস্তে আস্তে বললো বনবীর। ঠিক সাপের আওয়াজের মতো মৃদু শব্দ বেরোলো তার মুখ থেকে।

বিক্রমজিত উঠে বসলো। সেও হাত রাখলো তলোয়ারের হাতলে। বলে উঠলো,—হ্যাঁ, মীরা।

—তুমি কী ভাবছো সে আমার জানা দরকার।

বিক্রমজিতের চোখ তখন নেশায় লাল হয়ে উঠেছে। বললো,—ষড়যন্ত্রের শাস্তি মৃত্যু। রাজদ্রোহের শাস্তি প্রাণদণ্ড। সুতরাং মীরাবাঈকে মরতে হবে।

আমি কিন্তু এ ব্যাপারের কিছু জানি না,—বনবীর অন্যদিকে তাকিয়ে বললো।

না, আপনি কিছুই জানেন না,—সায় দিলো বিক্রমজিত,—যা হবে আমার হুকুমেই হবে।

বলতে বলতে বিক্রমজিত উঠে দাঁড়ালো। তলোয়ার বার করলো কোমর থেকে।

—কোথায় যাচ্ছো?

মহারাণাকে কোনো প্রশ্ন করতে নেই বনবীর সিংহ,—বলে বিক্রমজিত ছুরির ফলার মতো হাসলো। তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। তার পা দুটো একটু একটু টলছে।

কেটে গেল কয়েক মুহূর্ত। তারপর বনবীর একজনের দিকে ফিরে বললো,—অজিত সিংহ, মেড়তা রওনা হও এক্ষুনি। এই নাও কারমেতন বাঈয়ের আঙটি। বীরমদেবজীকে বলবে রানী কারমেতনবাঈ পাঠিয়েছেন।

মীরাবাঈয়ের খুব বিপদ। উনি এক্ষুনি চলে না এলে মীরাবাঈকে বাঁচানো যাবে না।

—উনি কি তিন চারদিনের আগে এখানে এসে পৌঁছাতে পারবেন? তার আগেই হয়তো সব শেষ হয়ে যাবে।

বনবীর শান্ত গলায় বললো,—আমি তো চাইছি না যে তিন চারদিনের আগে উনি এখানে এসে পৌঁছান।

—এসে যদি দেখেন মীরাবাঈ বেঁচে নেই, তাহলে ভীষণ ক্ষেপে যাবেন।

—খুবই স্বাভাবিক।

—হয়তো রাণাজীকেই আক্রমণ করে বসতে পারেন।

—ওসব খবর আমাদের জানার কথা নয়। কারণ আমরা সে সময় শিকার করতে গেছি কয়েকদিনের জন্যে। অবশ্যি খবর পেয়ে আমরা তাড়াতাড়ি ছুটে আসবো। বীরমদেবজী কি পালাতে পারবেন? অসম্ভব। আমরা ঠিক বদলা নেব। তবে তখন আর বিক্রমজিত বেঁচে নেই। হ্যাঁ, বেশ জাঁকজমক হবে মেবারের মহারাণার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায়।

তারপর কে রাণা হবে?—হাসিমুখে জিজ্ঞেস করলো অজিত সিংহ,—উদয় সিংহ?

বনবীর তার দিকে দার্শনিক দৃষ্টি মেলে দিয়ে বললো,—সে কথা কেউ বলতে পারে না। এই অনিত্য সংসারে মানুষের পরমায়ু সব চেয়ে বেশী অনিশ্চিত। যাও অজিত সিংহ। দেরি কোরো না।

তখন সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে। চিতোরগড়ের ভিতর সরু সরু পথে একটু দূরে দূরে জ্বলছে মশালের আলো। চারদিকে সব দরজা বন্ধ। একটা থমথমে স্তব্ধতা।

সবাই খবর পেয়ে গেছে তাহলে,—ভাবলো বনবীর। আস্তে আস্তে এগিয়ে চললো মীরার মহলের দিকে। কাছাকাছি এসে একটা থামের আড়ালে ছায়ায় মিশে দাঁড়িয়ে রইলো। একটা আওয়াজ কানে এলো।

মীরার মহলের দরজায় তলোয়ারের বাঁট দিয়ে খটখট করছে রাণা বিক্রমজিত।

মীরা! মীরা!!

গমগম করে উঠলো চিতোরগড়ের অন্দরমহল। আর কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। সবাই যে যার নিজের ঘরের দরজার আগল তুলে দিয়েছে। কারো বেরিয়ে আসার সাহস নেই।

মীরা! মীরা!! দরজা খোলো।

চম্পা চামেলীর মুখ শুকিয়ে গেছে। কি জানি কি হবে। বিক্রমজিত আজ মাতাল। সে মেয়েদের সাংঘাতিক ঘৃণা করে। সংসারের প্রত্যেক সুন্দরী নারীকেই সে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে।

মীরা! মীরা!! আমি মহারাণা বিক্রমজিত হুকুম করছি। দরজা খুলে বেরিয়ে এসো।

বনবীরের মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো। সবাই দেখছে রাণাজী মাতাল হয়ে তলোয়ার হাতে মীরার ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চিৎকার চেঁচামেচি করছে। মীরাকে শ্রদ্ধা করে সবাই। তাই রাণাকে সবাই নিন্দে করতে শুরু করবে। দাঁড়াও, দেখার বাকী আছে অনেক কিছু। মীরাকে খুন করবে বিক্রমজিত। সবাই স্তম্ভিত হয়ে তাও দেখবে। সবাই ঘৃণা করবে রাণাকে। তারপর যখন একদিন বিক্রমজিতও তলোয়ারের আঘাতে রক্তাক্ত দেহে মাটিতে লুটিয়ে পড়বে তখন তার জন্যে আর কারও সহানুভূতি থাকবে না, কেউ এক ফোঁটা চোখের জল ফেলবে না তার জন্যে।

মীরা! মীরা!! বলছি দরজা খোলো।

হঠাৎ দরজা খুলে গেল। বনবীরের নাকে ভেসে এলো ধূপের গন্ধ। চারদিক নিসাড় নিস্তব্ধ। দরজার সামনে মীরাবাঈ। মুখের উপর প্রদীপের স্নিগ্ধ আলো।

আর সামনে বিক্রমজিত। হা[illegible] খোলা তলোয়ার।

কি চাই বিক্রমজিত?—মীরা জিজ্ঞেস করলো।

বিক্রমজিত কোনো উত্তর দিতে পারলো না। তলোয়ার শুদ্ধ হাতখানি আস্তে আস্তে নেমে এলো।

আহাম্মক,—ভাবলো বনবীর।

কি চাই বলো,—মীরা আবার বললো।

এবার বিক্রমজিত একটু রুক্ষ হবার চেষ্টা করলো। ফিরে পেতে চাইলো তার খোয়ানো আত্মমর্যাদা।

—মীরা, আমি জানতে চাই……

মীরা তাকে কথার মাঝখানে থামিয়ে দিলো। বললো,—আমি তোমার মায়ের বয়েসী। তুমি আমায় সমীহ করে কথা বলবে বিক্রমজিত।

বিক্রমজিত পাথর হয়ে গেল। মহারাণাকে কেউ নাম ধরে সম্বোধন করেনা। মেবারের মহারাণা সবার কাছে রাণাজী।

বনবীর ভাবলো,—নাঃ, সত্যিই ব্যক্তিত্ব আছে এই মহিলার।

বিক্রমজিতের মাথা নিচু হয়ে আছে। মীরা আবার জিজ্ঞেস করলো,—বলো কি চাই।

বিক্রমজিত কোনো উত্তর দিলো না। কেটে গেল কয়েকটি স্তব্ধ মুহূর্ত।

মীরাবাঈ আস্তে আস্তে বন্ধ করে দিলো ঘরের দরজা। বন্ধ করে দিলো রাণা বিক্রমজিতের মুখের উপর।

পেছন থেকে নিঃশব্দে এগিয়ে এলো বনবীর। হাত রাখলো ওর কাঁধে। বললো,—খুব হয়েছে। এবার চলো।

বিক্রমজিত জ্বলে উঠলো,—আমি ভয় পাই নাকি? আমি ভয় পাই? আমি মেবারের মহারাণা, ভগবান একলিঙ্গজীর দেওয়ান, এখানে দাঁড়িয়ে হুকুম দিচ্ছি, কাল সকালে মীরাকে জলে ডুবিয়ে মারা হবে।—আস্তে আস্তে জড়িয়ে এলো তার কথাগুলো। সারা সন্ধ্যা মদ খেয়ে এখন নেশা হয়েছে খুব।

চলো,—বলে বনবীর বিক্রমজিতের কাঁধ ধরে একটু ঠেলে দিলো। বিক্রমজিত টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে পড়ে গেল। তারপর হাত পা ছড়িয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে বললো,—যাবো না, আমি কোথাও যাবো না।

বনবীর হাতে তুড়ি দিলো। দুজন লোক এসে দাঁড়ালো। বনবীরের ইশারায় মহারাণাজীকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে চললো রাণার খাসমহলের দিকে।

বনবীর নিজের ঘরে ফিরে এসে দেখলো একজন অপেক্ষা করছে।

—কি খবর শার্দুল সিংহ?

সে জানালো, কুমার উদয় সিংহকে দুপুরবেলা সরিয়ে দেওয়া হয়েছে চিতোরগড় থেকে।

—কি করে? ফটকে পাহারা ছিলো না?

শার্দুল সিংহ একটু ইতস্তত করছিলো। সে উত্তর দেওয়ার আগেই বনবীর বললো,—যাই হোক, এখন এ নিয়ে হই চই করে লাভ নেই। কোথায় সরিয়ে দেওয়া হয়েছে জানো? জানো না? থাক, আমার কোনো কৈফিয়ত শোনার ধৈর্য নেই।—একটু ভাবলো বনবীর।—আমার মনে হয় ওকে হয়তো এখনকার মতো নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কুম্ভলগড়ে। এখন কুম্ভলগড়ের রাওই মহারানী কারমেতন বাঈয়ের একমাত্র অনুগত সর্দার। ঠিক আছে। উদয়কে ধরে আনার জন্যে তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। কুম্ভলগড়ের চারদিকে লোক বসিয়ে দাও। ওখান থেকে যেন বেরোতে না পারে।

ইতিমধ্যে আরেকজন এলো।

—হ্যাঁ, বলো।

গুজরাট থেকে সুলতান বাহাদুর শাহ ফৌজ নিয়ে রওনা হয়েছেন।

খুব ভালো খবর,—বলে বনবীর একটু হাসলো।

॥ আটাশ ॥

কথাটা চিতোরগড়ে ছড়িয়ে পড়লো। মীরাবাঈকে সুরজকুণ্ডের জলে ডুবিয়ে মারা হবে, মহারাণা বিক্রমজিতের হুকুম।

প্রথমে একটা বিস্ময়ের স্তব্ধতা। তারপর শুরু হোলো শোরগোল। রাজ-কুলবধূর প্রাণদণ্ড, এবং কোনো পরিষ্কার অভিযোগ নেই, মেবারের ইতিহাসে এতো একেবারে অজানা, একেবারে অভাবনীয়।

কেন?—সবাই জিজ্ঞেস করলো সবাইকে, -কি অভিযোগ মীরার বিরুদ্ধে? কেন তাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দিতে চান মহারাণাজী?

বৈষ্ণব পণ্ডিতেরা এর মধ্যে একটা ধর্মের গন্ধ পেলো। তারা বলতে লাগলো মহারাণা শৈব, বৈষ্ণবদের পছন্দ করেন না। মীরা কৃষ্ণভক্ত, সাধুসঙ্গ করেন। মন্দিরে সবার সামনে ভজন গান করেন। সেজন্যেই তাঁকে মেরে ফেলার হুকুম দিয়েছেন মহারাণা। দু-চারজন বৈষ্ণব পণ্ডিত তাড়াতাড়ি কথাটা টুকে রাখলো তাদের পাণ্ডুলিপিতে। মীরাবাঈকে যদি মেরে ফেলা হয়, সমস্ত ব্যাপারের একটা অলৌকিক ব্যাখ্যা দেওয়া যাবে। ভক্তদের বোঝানো হবে, বৈষ্ণব ধর্মে অবিচল নিষ্ঠার জন্যেই প্রাণ দিলো মীরাবাঈ। কী মহান আদর্শ! জীবনে ধর্মই সব, ঈশ্বরই সব, তার জন্যে প্রাণ দেওয়া যায়, অন্য কোনো দিকে মন দেওয়ার দরকার নেই।

এবং আসল ব্যাপারটা কি সে সম্বন্ধে কারো উৎসুক হওয়ারও প্রয়োজন নেই,—বললো বনবীর,—পণ্ডিতদের জানিয়ে দেওয়া হোক রাজসরকার থেকে তাদের বৃত্তি বাড়িয়ে দেওয়া হবে। ওরা যে যার বাড়িতে বসে সাধকসাধিকাদের জীবনচরিত তৈরী করুক। ভক্তদের বোঝানো হোক যে মীরাবাঈকে রক্ষা করছেন গিরধরজী, সে জন্যে রাণা তাঁর কোনো ক্ষতি করতে পারছে না। লোকে ভাববে ভগবান রাণার বিরুদ্ধে লোকের মনে তাহলে রাণার জন্যে আর কোনো সহানুভূতি থাকবে না। সাধারণ মানুষকে শুধু একথাই বোঝানো হোক সমস্ত ব্যাপারটাই অলৌকিক। লৌকিক ব্যাপার প্রজাদের আগ্রহ যতো কম হয় ততোই ভালো।

অনেকে এসে ধরে পড়লো রাজমাতা কারমেত্তন বাঈকে। তিনি যদি মহারাণাকে বলে এ হুকুম রদ করাতে পারেন।

কারমেত্তন বাঈয়ের চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো। তিনি পরিষ্কার দেখতে পারছেন নিয়তির খেলা। বিক্রমজিতকে বেশীদিন রাজত্ব করতে দেবে না বনবীর। তাকে সরিয়ে দেবে গদি থেকে। রাণার হুকুমের দোহাই দিয়ে মীরাকে হত্যা করা এও তার ষড়যন্ত্রের একটা অংশ। তাহলে চিতোরগড়ে কারো কোনো সহানুভূতি থাকবে না বিক্রমজিতের জন্যে। অন্যান্য রাজপুত রাজ্যগুলিও ক্ষেপে যাবে। ওকে গদি থেকে সরালে, এমন কি ওকে মেরে ফেললেও কেউ একটি কথাও বলবে না। সবাই মনে মনে খুশী হবে। সবাই চায় মেবার দুর্বল হয়ে যাক, শেষ হয়ে যাক।

গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ মেবার আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন, এ খবরও ছড়িয়ে পড়েছে চিতোরগড়ে। এমন কেউ নেই যে তাকে রুখতে পারে। বিক্রমজিত কি তাকে রুখতে পারবে?

বনবীর তার বিশ্বস্ত সর্দারদের বললো,—যুদ্ধের জন্যে বেশী তোড়জোড় করার দরকার নেই। সীমান্তের কাছে কয়েকটা যুদ্ধে আমরা হেরে গেলেই ভালো। লোকে বলুক, বিক্রমজিত একটা অপদার্থ, সে রক্ষা করতে পারবে না আমাদের দেশ।

কারমেত্তনবাঈ মহলের মেয়েদের বললো,—বিক্রমজিত আমার কথা শুনবে না, বনবীর তাকে শুনতে দেবে না। বিক্রমজিত বুঝতে পারছে না, কী সর্বনাশ ঘনিয়ে আসছে।

মেয়েরা গিয়ে ধরলো উদাবাঈকে। সে রাণার বোন। বনবীর তাকে খাতির করে। রাণাও তাকে মানে। উদাবাঈ বললো,—মীরাবাঈ আমার পরামর্শ মতো যদি চলে, তাহলে ওর কোনো ক্ষতি হবে না। আমি রাণাজীকে গিয়ে বললে রাণাজী ওকে মাপ করে দেবে।

মীরাবাঈ শুধু হাসলো। বললো,—উদাবাঈ বড্ড ছেলে মানুষ।

মহলে মেয়েদের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে মীরার গান। উদাবাঈয়ের ব্যাপার নিয়ে গান তৈরী হয়ে গেল। সন্ধ্যেবেলা দল বেঁধে যখন বসে, তাদের মুখে শোনা যায় সে সব গান। উদাবাঈ নাকি বলেছে,—

থানে বরজ বরজ মেঁ হারী,
ভাভী, মানো বাত হমারী।

রাণে রোস কিয়ো থাঁ উপর
সাধোঁ মেঁ মত জারী ॥

তোমায় মানা করে করে আমি হার মানলাম। বৌদি, আমার কথা মেনে নাও। রাণাজী তোমার উপর রাগ করেছে। সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে আর মাখামাখি কোরো না।

রতন জড়িত পহিরো আভূষণ
ভোগো ভোগ অপারী।
মীরাজী থে চলো মহল মেঁ
থাঁনে সোগন ম্হারী ॥

জড়োয়া গয়না পরো, সব কিছু ভোগ করো। মীরাজী, আমার দিব্যি, মন্দির ছেড়ে মহলে চলো।

মহলের মেয়েরা গানে গানে শোনাচ্ছে মীরার উত্তর,—

রাণা নে সমঝাও জাও
মঁয় তো বাত ন মানী।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর
সন্তাঁ হাথ বিকানী ॥...

রাণাকে গিয়ে বোঝাও, আমি তো তোমার কথা মানলাম না। গিরধরজী আমার প্রভু, আমি তো সাধুসন্তদের হাতে বিকিয়ে গেছি।

উদাবাঈ মন সমঝ, যাও অপনে ধাম।
রাজপাট ভোগো তম্হীঁ, হমে ন তাঁসু কাম ॥

উদাবাঈ, আমার মনের কথা বুঝে নাও, ফিরে যাও তোমার মহলে। তুমিই ভোগ করো রাজপ্রাসাদের বিলাস বৈভব, এসবে আমার তো কোনো প্রয়োজন নেই।

বিক্রমজিতের কানে গেল এসব গান। ক্ষেপে গিয়ে বললো,—কি হচ্ছে এসব ? বন্ধ করো, মহলে গান গাওয়া বন্ধ করো।

আড়াল থেকে বনবীর হাসিমুখে নির্দেশ দিলো,—না, না, গানটান যেমন চলছে চলুক।

মেয়েরা গান গেয়ে গেয়ে চিতোরগড় পরিক্রমা করে। এই তাদের প্রতিবাদ। মীরাকে মেরে ফেলার হুকুম রদ করতে হবে।

না, না,—বললো রাণা বিক্রমজিত,—মীরাকে মরতে হবে।

বনবীরও সায় দিলো,—রাণাজীর হুকুম, আমাদের কিছু করার নেই।

দরবারের সর্দারদের মধ্যে কয়েকজন গিয়ে ধরে পড়লো রানী ধনবাঈকে।

ধনবাঈও মাথা নাড়লো। সে জানে বিক্রমজিত শুনবে না। আসল সমস্যাটা হোলো তার ছোটোভাই কুমার উদয় সিংহকে নিয়ে। সে কুম্ভলগড়ে পালিয়ে গেছে। মীরা তাকে খুব স্নেহ করে, একথা সবাই জানে। বিক্রমজিতের ধারণা রাজ্যের যে সব সর্দার তাকে গদি থেকে সরিয়ে উদয় সিংহকে রাণা করার চেষ্টা করছে, মীরাবাঈ আছে তাদের পেছনে।

কারমেতনবাঈ বললো,—এ ব্যাপারে আলোচনা করার জন্যে মীরার লোক গেছে বুঁদীতে আর মেড়তায়, এ খবর পেয়ে গেছে বিক্রমজিত আর বনবীর।

ধনবাঈ বললো,—ওদের দলে পেলে আমার বড়োভাই মারওয়াড়ের রাও গাঙ্গাও উদয়সিংহের পেছনে এসে দাঁড়াবে। রতন সিংহ মারা যাওয়ার পর থেকেই রাও গাঙ্গা বিক্রমজিত আর বনবীরের উপর খুব রেগে আছে।

বোধ হয় এজন্যেই কুমার মালদেবের সঙ্গে বনবীরের আবার ভাব হয়েছে, —বললো দরবারের সর্দারেরা,—মালদেবজী এখন জোধপুরে গিয়ে ঘোঁট পাকাচ্ছে। বনবীর তাকে বলেছে মেবারের ক্ষমতা আসা উচিত আমার হাতে, মারওয়াড়ের ক্ষমতা তোমার হাতে। আমি আর তুমি এক হলে সারা রাজপুতানা আমাদের তাঁবেদারি করবে।

কারমেতন বাঈ বিষণ্ণ হয়ে বললো,—মীরার ভাগ্য জড়িয়ে গেছে মেবার মারওয়াড়ের রাজনীতির সঙ্গে। তাকে কি আর বাঁচানো যাবে?

বিক্রমজিতকে বা বনবীরকে বলে কিছু হবে না,—ধনবাঈ উত্তর দিলো,— অন্য রাস্তা ধরতে হবে।

সে তো অনেক খরচার ব্যাপার,—বললো একজন প্রবীণ সর্দার।

তার জন্যে পরোয়া নেই,—উত্তর দিলো ধনবাঈ,—মীরাকে বাঁচাতে হবে যেমন করেই হোক। খরচা যা লাগে আমি দেবো।

আপনি একা দেবেন কেন?—বলে উঠলো কারমেতন বাঈ,—আমিও দেব।

অন্য মেয়েরাও বললো,—আমরাও যে যা পারি দেব। এ শুধু মীরার জীবনরক্ষার প্রশ্ন নয়, এ চিতোরগড়ের রাওলার মেয়েদের ইজ্জতের প্রশ্ন। ওরা এক কুলবধূর প্রাণ নেবে নিজেদের খেয়ালখুশি মতো, আর আমাদের প্রতিবাদ কানে তুলবে না?

কথাটা গেল বিক্রমজিতের বোন উদাবাঈয়ের কানে। সে এসে জানালো বনবীরকে।

বনবীর আস্তে আস্তে মাথা নাড়লো। বললো,—মীরাবাঈকে বাঁচাবার চেষ্টা করছেন? রানী ধনবাঈ? রানী কারমেতন বাঈ? প্রচুর টাকাকড়ি খরচা করবেন? আচ্ছা, আমি দেখছি।

বলভদ্র সিংহকে ডেকে পাঠালো বনবীর। বললো,—শোনো, কিছু টাকা রোজগার করার সুযোগ পাওয়া গেছে।

সে অবাক হয়ে তাকালো।

বনবীর বললো,—দুই মূর্খ রানী অনেক টাকা খরচা করবেন মীরাজীকে বাঁচাবার জন্যে। টাকাটা অন্যের হাতে কেন যাবে? আমরা নিলেই পারি।

বলভদ্র তখন এক গাল হাসলো। বললো,—হুকুম করুন বনবীরজী।

বনবীর বললো, যাদের উপর মীরাবাঈকে জলে ডুবিয়ে মেরে ফেলার ভার দেওয়া হয়েছে ওদের গিয়ে বলো, আমার হুকুম, ওরাই জলে ভাসিয়ে রাখবে মীরাবাঈকে। এমন ভাব করবে যেন খুব চেষ্টা করা হচ্ছে জলে ডুবিয়ে মারবার, কিন্তু কোনো অলৌকিক কারণে সেটা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না। সাধারণ লোকে তাই বুঝবে, তাদের চোখে আরো ছোটো হয়ে যাবে রাণা বিক্রমজিত।

বলভদ্র সিংহ চলে যাচ্ছিলো। বনবীর ডেকে বললো,—আর শোনো, তুমিই যোগাযোগ করবে রানীদের সঙ্গে। বুঝতে দেবে না যে আমিই পাঠিয়েছি তোমাকে। তাহলে সব মতলব ভেস্তে যাবে। খুব দরাদরি করবে, যতো বেশী পারো আদায় করে নেবে তাদের কাছ থেকে। আমাদের এখন অনেক টাকার দরকার।

বলভদ্র সিংহ চলে গেল। বনবীর আরেকজনকে ডেকে খবর নিলো অজিত সিংহ মেড়তা থেকে ফিরেছে কিনা। শুনলো, সে সকালেই ফিরেছে। মীরাবাঈয়ের জ্যাঠামশাই বীরমদেবজীও ছোটো একদল সৈন্য নিয়ে রওনা হয়েছে মেড়তা থেকে। চিতোরগড়ে পৌঁছাবে দু-একদিনের মধ্যেই।

পরদিন সকালে মীরাকে নিয়ে যাওয়া হবে সুরজকুণ্ডের ধারে। সেখানে অথৈ জল।

মহলের মেয়েরা স্থির করেছিলো, কেউ ঘর থেকে বেরোবে না। সেদিন রান্না হবে না কোথাও। একেবারে স্তব্ধ হয়ে থাকবে চিতোরগড়।

কিন্তু ধনবতীবাঈ আর কারমেতনবাঈ হুকুম দিলো,—না, কেউ দোরে খিল দিয়ে ভিতরে বসে থাকবে না। সবাই ভোরে ভোরে উঠে স্নান করে ভজন গাইতে গাইতে গিরধরজীর মন্দিরে যাবে। সেখানে পূজো দিয়ে মিছিল

করে গিয়ে জড়ো হবে সুরজকুণ্ডের ধারে। সর্বক্ষণ চলতে থাকবে মীরাবাঈয়ের ভজন।

সেই ভজন মহারাণার কানে এলো। মহারাণা তখন হাতমুখ ধুয়ে প্রাতরাশ করতে বসেছে।

কি হচ্ছে ? —ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলো রাণা বিক্রমজিত।

মেয়েদের মুখে মুখে তখন মীরার গান শোনা যাচ্ছে মহলের সর্বত্র।

সাঁপ পিটারা রাণা ভেজিয়ো, মীরা হাথ দিয়ো জায়।
ন্হায় ধোয় দেখন লাগী, সালিগরাম গঈ পায়॥

রাণা পাঠিয়েছিলো বিষাক্ত সাপের ঝাঁপি। মীরা স্নান করে দেখতে লাগলো। পেয়ে গেল শালগ্রাম শিলা।

জহর কা পিয়ালা রাণা ভেজিয়ো, অমৃত দীহ্ন বনায়।
ন্হায় ধোয় জব পীবণ লাগী, হো অমর অঁচায়॥

রাণা পাঠালো বিষের পেয়ালা। সেটা হয়ে গেল অমৃত। মীরা স্নান করে খেয়ে নিলো। অমর হয়ে গেল প্রিয়ের অমৃত স্পর্শে।

অনেক দূর থেকে ভেসে এলো রাণা বিক্রমজিতের কানে,—

মীরাকে প্রভু সদাই সহাঈ, রাখে বিঘন ঘটায়।
ভজন ভাব মেঁ মস্ত ডোলতী, গিরধর পৈ বলি জায়॥

মীরার প্রিয়তম সব সময় তার সহায়। সব বিঘ্ন থেকে তিনিই রক্ষা করছেন মীরাকে। মীরা ডুবে আছে প্রিয়তমেরই গানে, মন পড়ে আছে তাঁরই উপর।

শোরগোল ক্রমশ বাড়তে লাগলো। চারদিকে শুধু গান আর গান। আর অনেক লোকের কলকণ্ঠ আওয়াজ।

কি হচ্ছে ?—গর্জে উঠলো মহারাণা বিক্রমজিত,—কি হচ্ছে এসব ?

আস্তে আস্তে সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছে। মীরাকে জলে ডুবিয়ে মারবার সব রকম চেষ্টাই করা হয়েছে। কিন্তু মীরা জলে ডুবছে না কিছুতেই। এক অলৌকিক উপায়ে ভেসে আছে জলের বুকে। সবাই বলছে স্বয়ং গিরধরজী মীরাকে রক্ষা করছেন।

রাণা তাকালো বনবীরের দিকে। সে মুখ টিপে হেসে চুপ করে রইলো।

গম্ভীর হয়ে বসে রইলো বিক্রমজিত। মুখের উপর ফুটে উঠলো ভয়ের ছাপ। অনেকক্ষণ পরে বললো,—ছেড়ে দাও। মীরাবাঈকে এখন ছেড়ে দাও। পরে দেখা যাবে।

বিক্রমজিত সারাদিন আর ঘর থেকে বেরোলো না। সন্ধ্যের দিকে খবর এলো, মীরাবাঈ কাল সকালে চিতোরগড় থেকে চলে যাওয়ার আয়োজন করছে।

সে হয় না,—বলে উঠলো বিক্রমজিত,—ওর যাওয়া বন্ধ করো।

আমার মনে হয়, যেতে দেওয়াই ভালো,—বনবীর উত্তর দিলো।

—তারপর?

—লুকিয়ে পিছু নিতে পারে একদল সশস্ত্র ঘাতক। লোকে জানবে ডাকাতেরা খতম করেছে মীরাবাঈকে।

এবার বিক্রমজিতের মুখে একটু হাসি দেখা গেল। বললো,—হ্যাঁ, এটা ভালো মতলব।

রাত কেটে গেল। সকাল হোলো।

অনেকেই প্রণাম করতে গেছে মীরাবাঈকে। বনবীরও গেছে। বিক্রমজিতের মনটা একবার দুলে উঠলো। তারপর আবার ইস্পাত হয়ে গেল। পাহারাদারকে ডেকে বললো,—আজ আমার ঘরের দরজা বন্ধ থাকবে। কারো সঙ্গে দেখা হবে না। তবে যখন যা খবর আসবে, আমাকে যেন সঙ্গে সঙ্গে জানিয়ে দেওয়া হয়।

খবর এলো এক সময়,—চিতোরগড় ছেড়ে চলে যাচ্ছে মীরাবাঈ। সঙ্গে শুধু চম্পা ও চামেলী, আর কয়েকজন অনুচর।

কিছুক্ষণ পরে আবার খবর এলো,—লুকিয়ে মীরার পিছু নিয়েছে বনবীরের একদল বিশ্বস্ত সৈন্য।

সারাদিন আর কোনো খবর নেই।

শেষ খবর এলো সন্ধ্যেবেলা।—

মীরার জ্যাঠামশাই মেড়তার অধিপতি বীরমদেবজী একদল সৈন্য নিয়ে এসে পড়েছিলেন চিতোরের কাছাকাছি। বনবীরের সৈন্যরা মীরার দলের উপর চড়াও হবার আগেই বীরমদেবের সঙ্গে মীরার দেখা হয়ে গেছে।

বনবীরের সৈন্যরা দূর থেকে দেখে আর এগোয় নি। চিতোরগড়ে ফিরে এসেছে।

আর মীরাবাঈ মেড়তার দিকে রওনা হয়ে গেছে বীরমদেবের সঙ্গে।

॥ উনত্রিশ ॥

সেদিনও যেমন নিজের ঘরে একলাই চুপচাপ বসে ছিলো রাণা বিক্রমজিত, ঠিক তেমনি একলা বসেছিলো পাঁচ বছর পরে একদিন সকালবেলা। আগের দিন মীরাবাঈ ফিরে এসেছে চিতোরগড়ে। এসেছে রাণার বিশেষ আমন্ত্রণে। মীরাকে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছে বিক্রমজিতের ছিলো না। কিন্তু সবাই বলছিলো মীরাবাঈকে ফিরিয়ে আনুন। পাঁচ বছর ধরেই বলছে। ইদানীং বেশী করে বলছিলো। মীরারও আসার ইচ্ছে ছিলো না। কিন্তু মেবারের একজন মন্ত্রী যখন রাজপুরোহিতকে সঙ্গে নিয়ে বৃন্দাবনে এসে মীরার সঙ্গে দেখা করলো, মীরা তাদের কথা ঠেলতে পারলো না।

পনেরো শো ছত্রিশ খ্রীষ্টাব্দ। এই পাঁচ বছরে কতো পরিবর্তন হয়ে গেল—ভাবছিলো রাণা বিক্রমজিত।

মীরা চলে যাওয়ার পরের বছরই মালদেব মারওয়াড়ের রাজা হয়ে বসলো। রাজা হোলো রাও গাঙ্গাকে হত্যা করে। প্রসাদ অলিন্দ থেকে নিজের বাবা রাও গাঙ্গাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিলো মালদেব। তার কিছুকাল পরে সৈন্যসামন্ত নিয়ে দখল করলো মেড়তা রাজ্য।

বিক্রমজিত খুশী হয়েছিলো। মালদেব তার অন্তরঙ্গ। মারওয়াড় বিক্রমজিতের পেছনে থাকলে বিক্রমজিতের সিংহাসন নিরাপদ।

কিন্তু সেরকম হোলো না। গুজরাটের বাহাদুর শাহ মেবার আক্রমণ করলো। মালদেব সাহায্য পাঠাতে গড়িমসি করলো। সে চায় মেবার দুর্বল হয়ে যাক। বনবীরের ক্ষমতা নেই মেবারের সব রাজপুতকে একতাবদ্ধ করে গুজরাটের মোকাবিলা করার। গোলমাল বেধে গেল চিতোরগড়ে। কিন্তু মেবার বেঁচে গেল। সেবার বর্ষা নামলো তাড়াতাড়ি। গোয়া থেকে পর্তুগীজরা এসে হানা দিলো গুজরাটে। বাহাদুর শাহ ফিরে গেল নিজের দেশে।

মেবারের শাসনব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। চারদিকে বনবীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ। অযোগ্যতার অভিযোগ, দুর্নীতির অভিযোগ, কাজে গাফিলতির অভিযোগ। বনবীর ইস্তফা দিয়ে নেপথ্যে সরে গেল। নতুন রাজপ্রতিনিধি হোলো বিক্রমজিতের বিমাতা রানী ধনবাঈ রাঠোর। নতুন উপাধি দেওয়া হোলো তাঁকে,—রানী জওয়রবাঈ।

ক্ষমতা হাতে নিয়েই ধনবাঈ বললো,—মীরাকে ফিরিয়ে আনো। লোক

চলে গেল মেড়তায়। ফিরে এসে জানালো, মীরা মেড়তায় নেই, মীরা চলে গেছে বৃন্দাবন।

ধনবাঈ বললো,—বৃন্দাবনে লোক পাঠাও।

মুখ বেজার করে গুম হয়ে বসে রইলো রাণা বিক্রমজিত।

প্রধান মন্ত্রী একনাথ ভট্ট বললো,—এখন তাঁকে ফিরিয়ে না আনাই ভালো। ক্ষমতা আপনি নিজের হাতে নিয়েছেন বলে আপনার ভাইপো মহারাজ মালদেব আমাদের বিপদে আপদে সাহায্য করার কথা ভাবছেন। মীরাবাঈ ফিরে এলে তিনি হয়তো খুশী হবেন না। তাছাড়া যে সব সর্দার বনবীরের অনুগত, তারা শোরগোল শুরু করবে।

ধনবাঈ বললো,—রাজনীতি অনেক হয়েছে একনাথজী। এখন সামনে যুদ্ধ। বাহাদুর শাহ আবার আসছে। যুদ্ধের সময় চাই একতা। রাজনীতি নয়। মীরাবাঈ ফিরে এলে দেশের সাধারণ লোক আমাদের পেছনে এসে দাঁড়াবে। ওরা মীরাবাঈকেই চায়।

বিক্রমজিত বললো,—এরপর কি আমায় শুনতে হবে মীরাবাঈকেই রাজ প্রতিনিধি করা হোক?

আমার আপত্তি নেই,—বললো ধনবাঈ,—দেশ রক্ষা পেলেই হোলো। হয়তো দরবারের কোনো কোনো সর্দার প্রতিবাদ জানাবে। তাদের আমার দরকার নেই। ওরা চলে যাক দেশ ছেড়ে।

কিন্তু মহারাজ মালদেব যে আমাদের উপর চটে গিয়ে আর সাহায্য পাঠাবেন না,—বললো একনাথ ভট্ট,—তখন কি হবে?

তার ভরসা আমি করি না,—ধনবাঈ উত্তর দিলো,—এতদিন যা দেখে এলাম, আমার মন বদলে গেছে। এ রাজ্য আমার স্বামী মহারাণা সাঙ্গাজীর নিজের হাতে গড়ে তোলা। তাঁর প্রজারাই দেশরক্ষা করবে, রক্ষা করতে না পারে, সবাই যুদ্ধে প্রাণ দেবে। তাতে গৌরব আছে। নিজের মান খুইয়ে পরের সাহায্যে আত্মরক্ষা করায় কোনো গৌরব নেই।

আমি যদ্দিন বেঁচে আছি,—বললো রাণা বিক্রমজিত,—তদ্দিন মীরাবাঈকে চিতোরগড়ে ফিরিয়ে আনা চলবে না।

বাহাদুর শাহ আবার মেবার আক্রমণ করলো। সাহায্য করার জন্যে কেউ এগিয়ে এলো না। মারওয়াড় নয়, অম্বর নয়, বুঁদী নয়, কেউ নয়। বরং বাহাদুর শাহকেই সাহায্য করলো দরবারের কয়েকজন সর্দার। গুজরাট বাহিনী এসে চিতোরগড় ঘিরে ফেললো।

নিরুপায় হয়ে ধনবাঈ বললো,—রাজকোষ খালি করে দাও। যা চায় নিয়ে যাক বাহাদুর শাহ। সব নিয়ে চলে যাক নিজের দেশে।

রাজী হয়ে গেল বাহাদুর শাহ। সেবারও কোনো রকমে বেঁচে গেল চিতোরগড়। কিন্তু বাহাদুর শাহ আবার ফিরে এলো দুবছর পরে। বিক্রমজিত সরে গেল চিতোরগড় থেকে। বাহাদুর শাহ দখল করলো চিতোরগড়। লুটপাট করে চলে যাওয়ার পর বিক্রমজিত ফিরে এলো। তখন রানী ধনবাঈ নেই। সবাই প্রাণ দিয়েছে এই অবরোধের যুদ্ধে।

বনবীর আছে। কিন্তু এখনও নেপথ্যে। প্রধান মন্ত্রী একনাথ ভট্ট তাকে বিশ্বাস করে না। যারা বনবীরের অনুগত তাদের অনেকেই বাহাদুর শাহকে নানারকমভাবে সাহায্য করেছে। কিন্তু তাকে কিছু বলারও উপায় নেই। রাণা বিক্রমজিত তার গায়ে কোনোরকম আঁচ লাগতে দেবে না।

চিতোরগড়ে এখনও বেশ লোকজন, অনেকে নতুন এসেছে, তবু বিক্রমজিতের বড্ড ফাঁকা ফাঁকা লাগে। অনেক চেনামুখ নেই। রানী ধনবাঈ নেই, বিক্রমজিতের মা রানী কারমেতনবাঈ নেই। চিতোরগড়ের অন্দরমহলের সব রঙ চলে গেছে, একেবারে নিষ্প্রাণ, নিস্তব্ধ। সাধারণ লোকেরাও সব কলের পুতুল।

প্রাণ চাই। আবার নতুন করে প্রাণ চাই। সবাই বলছে,—মীরাবাঈ চলে যাওয়ার পর থেকেই চিতোরগড় প্রাণহীন হয়ে গেছে। মীরাবাঈকে ফিরিয়ে আনো।

মহারাণাজী, আপনার যদি হুকুম হয়,—বললো প্রধানমন্ত্রী একনাথ ভট্ট।

এনে কী লাভ,—উদাস গলায় বললো বিক্রমজিত,—আবার সেই ভজন, সেই গিরধরজীর মন্দিরে সাধু সন্ন্যাসী আর সাধারণ লোকের ভিড়।

ওদের আবার নতুন করে চাই চিতোরগড়ের প্রাঙ্গণে,—একনাথ ভট্ট উত্তর দিলো।

বনবীর প্রত্যেকদিন একবার করে আসে রাণার সঙ্গে দেখা করতে। বিক্রমজিত তার অভিমত জানতে চাইলো। বনবীর উৎসাহ দেখিয়েই বললো,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসবে না কেন? নিশ্চয়ই আসবে। মীরাবাঈ সিসোদিয়াদের কুলবধূ। উনি এখন ফিরে না এলে চলবে কি করে? বড়োদের মধ্যে আর তো কেউ বেঁচে নেই। তবে হ্যাঁ, এটা অসম্ভব নয় যে মীরাবাঈ ফিরে এলে পরে ওরা বলতে শুরু করবে এবার ওঁকেই রাজপ্রতিনিধি করো। অবশ্যি তাঁর সেই যোগ্যতা আছে। তবে তুমি আর কদ্দিন থাকবে মেয়েদের আঁচলের

আড়ালে? রানী ধনবাঈকে রাজপ্রতিনিধি করার পর মেবারের কি হাল হোলো তা তো দেখলে।

বিক্রমজিত ভাবলো,—আমি এবার সবাইকে বুঝিয়ে দেব যে, আমিই রাণা। আমার ইচ্ছেই সব। আমার হুকুমই সব।

দরজার বাইরে খোলা তলোয়ার হাতে পাহারা দিচ্ছে দুজন রক্ষী। বিক্রমজিত দরজায় এসে দাঁড়ালো। বাইরে অপেক্ষা করছে একজন। তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো,—মীরাবাঈ কি করছেন?

—পূজো করছেন গিরধরজীর মন্দিরে। ভোগের পরে আপনার সঙ্গে দেখা হবে বলে খবর দিয়েছেন।

—বেশ, গিয়ে বলো, ওঁর যখন সুবিধে এখানে এসে দেখা করবেন আমার সঙ্গে। আমি এখানেই অপেক্ষা করছি।

কিছুক্ষণ পর সে ফিরে এলো।

—রাণাজী, মীরাবাঈ আপনাকে পূজোর প্রসাদ নেওয়ার জন্যে মন্দিরে আসতে অনুরোধ করেছেন।

হঠাৎ ক্ষেপে গেল বিক্রমজিত।—তার মানে আমাকে ওখানে যেতে হবে মীরাবাঈয়ের সঙ্গে দেখা করতে? এত বেয়াদবি? সে হয় না। রাণা কারো কাছে যায় না। সবাই আসে রাণার কাছে। আমার জন্যে পূজোর প্রসাদ নিয়ে এখানেই আসতে বলে দাও। বলো মহারাণার হুকুম।

বিক্রমজিত ঘরের মধ্যে পায়চারি করছিলো। লোকটি ফিরে এসে বললো,—রাণাজী, মীরাবাঈ এখানে আসবেন না। আপনাকেই যেতে বলেছেন।

আসবেন না?—বিক্রমজিতের মুখ লাল হয়ে গেল,—তাহলে ওঁর সঙ্গে আমার আর দেখা হবে না। একথাই ওঁকে জানিয়ে দাও।

রাওলার মেয়েরা যারা এসেছিলো সবাই চলে গেছে। মীরা একলা বসে ছিলো বিগ্রহের সামনে। চামেলী এসে খবর দিলো রাণাজী এখানে আসবেন না। মীরা শুনে একটু হাসলো।

মীরার হাসি ঘরোয়া সহজ, কিন্তু চোখ দুটি বিবাগী বিষণ্ণ। পাঁচ বছর,—সে অনেক বছর, অনেক কাল। অনেক হতাশা অনেক বেদনা অনেক নিষ্করুণ অভিজ্ঞতার উত্তরণ।

চিতোরগড়ে রাণা বিক্রমজিতের উৎপীড়ন থেকে মীরাকে উদ্ধার করে মেড়তায় নিয়ে গিয়েছিলো বীরমদেব। কিন্তু সেখানে গিয়ে বললো,—তুমি রাজকন্যা, এখানে রাজকন্যার মতোই থাকবে। আমি এদেশের রাজা, একথা

মনে রেখো সব সময়। এ তোমার নিজেরই বাড়ি। তোমার সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কোনো কিছুরই অভাব হবে না। শ্যামজীর মন্দির আছে মহলের ভিতর, সেখানে তোমার পূজো পার্বণ উৎসব সব কিছুর ব্যবস্থা থাকবে। তবে একথা ভুলে যেয়ো না, মহলের মন্দির সর্বসাধারণের জন্যে নয়।

বীরমদেবের ছেলে জয়মল মীরাকে খুব ভালোবাসে। সে বললো,—বাঈ ফিরে এসেছে বাপের বাড়িতে, সুতরাং এখন থেকে এ মন্দির সর্বসাধারণের।

যদ্দিন আমি মেড়তার রাজা,—বীরমদেব বললো,—তদ্দিন নয়।

জয়মল মীরাকে বললো,—বাঈ, মহলের বাইরে তোমার জন্যে আলাদা একটি মন্দির তৈরী করিয়ে দিচ্ছি।

আলাদা করে কোনো মন্দির আমার আর দরকার নেই জয়মল,—মীরা উত্তর দিলো,—আমি যেখানে বসে গান গাইবো, সেটাই মন্দির।

মতান্তর শুরু হোলো এমনি করে। মতান্তর থেকে মনান্তর। মীরা বীরমদেবকে বললো,—অন্য সবাইকে বাদ দিয়ে একলা বসে আমার পূজো হয় না, গান হয় না। আমার কাছে যারা আসতে চায় ওরা আসবেই।

বীরমদেব বললো,—না, আসবে না।

জয়মল বললো,—হ্যাঁ, আসবে। নিশ্চয়ই আসবে।

সে বছর ভাইফোঁটার দিন মীরাবাঈ খুব ঘটা করে জয়মলকে ফোঁটা দিলো, নিজের হাতে পরিবেশন করে খাওয়ালো। তারপর বললো,—এই সংসারে তুমিই আমার আপন, তুমিই খুব ভালোবাসো আমায়। আজ তোমার কাছে কি চাইবো বলো।

বলো বাঈ,—জয়মল বললো,—যা চাইবে তাই দেব।

—দেবে তো? তাহলে শুধু একটা কথা দাও আমায়।

—কি কথা?

—তুমি আমায় আটকাবে না। আমি বৃন্দাবন চলে যাচ্ছি। তুমি মন খারাপ করবে না। তুমি যেয়ো না বললে আমি কোথাও যেতে পারবো না। তাই আমি আজ তোমার কাছে এটাই চাইছি যে তুমি আমায় মানা করবে না।

জয়মলের চোখ ভিজে গেল, কিন্তু মুখের হাসি রামধনু হোলো। বললো, —না বাঈ, মানা করবো না। কিন্তু বৃন্দাবনে কোথায় যাবে তুমি? কোথায় থাকবে?

মীরা বললো,—একটা নতুন গান লিখেছি, শুনবে? শোনো—

ম্যয় গিরধরকে ঘর জাউ।

গিরধর ম্হাঁরো সাঁচো প্রীতম, দেখত রূপ লুভাউ।...

জো পহিরাওয়ে সোঈ পহিরুঁ, জো দে সোঈ খাউঁ।

যা পরতে দেবে তাই পরবো, যা খেতে দেবে তাই খাবো।

জহাঁ বৈঠাওয়ে তিতহী বৈঠুঁ......

যেখানে বসতে দেবে, সেখানেই বসে পড়বো—।

সেবছরই মেড়তা ছেড়ে বৃন্দাবনে পাড়ি দিলো মীরাবাঈ।

সেখানে প্রথম প্রথম খুব ভালো লাগলো। কিন্তু তারপর আর নয়। প্রথম দিকে একটা আলোড়ন। জীব গোস্বামীর কাছে বলে পাঠানো মীরার একটি তীক্ষ্ণ মন্তব্য,—আপনি দেখা করবেন না আমার সঙ্গে? আমি স্ত্রীলোক বলে? ব্রজভূমিতে তো একমাত্র পুরুষ বলে জানি পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণকে। অন্য সবাই তো তাঁর লীলাসঙ্গিনী, তাঁর দয়িতা, তাঁর সেবিকা।—কিন্তু সে আলোড়ন ক্রমশ শান্ত হয়ে গেল। ব্রজবাসীরা নিস্পৃহ হয়ে গেল মীরার সম্বন্ধে।

এ কেমন কৃষ্ণভক্তি?—বলাবলি করতে লাগলো অনেকেই,—ঘর ছেড়ে চলে এসেছে। সঙ্গে কোনো পুরুষ মানুষ নেই। বিধবার আচার বিচার মানে না। রাজবাড়ির মেয়ে, কিন্তু সবার সামনে গান গায়।

—সে যা খুশি করুক গে। কিন্তু যে গান গাইছে তার মধ্যে কি কোনো সাত্ত্বিক ভাব আছে? মনে হয় যেন সাধারণ লোকের প্রেম ভালোবাসার গান, গিরিধারী নামে যেন কোনো লোক আছে, তাকে উদ্দেশ করে আর দশজন সাধারণ মেয়ের মতো নিজের মনের কথা বলে যাচ্ছে। কি যেন গাইছিলো সেদিন? হ্যাঁ।

মীরাকে প্রভু গহির গম্ভীরা, সদা রহো জো ধীরা।

আধী রাত প্রভু দরসন দে হ্যায়, প্রেম নদী কে তীরা॥

মীরার প্রভু খুব গভীর, খুব গম্ভীর, সব সময় থাকে ধৈর্য ধরে। প্রভু দেখা দেয় মাঝরাতে, প্রেমের নদীর তীরে।—এখন বলো এসব কি ঈশ্বরপ্রেমের গান? তাহলে মাঝরাতে কেন? প্রেমের নদীর তীরে? কি বোঝাতে চাইছে মীরাবাঈ?

—শুনো না, শুনো না, ওর গান শুনো না।

—কোন এক গোসাঁই নাকি এখনকার কবিদের লেখা কৃষ্ণপ্রেমের গানগুলো সংগ্রহ করে লিখে রাখছে। খোঁজ নাও লোকটি কে। বড়ো গোসাঁইদের গিয়ে বলতে হবে তাকে যেন মানা করে দেওয়া হয় যে, মীরাবাঈয়ের গানগুলো

সে লিখে রাখবে না। সত্যি, প্রত্যেকটা গানে তমোভাব। প্রিয় তোমায় ছাড়া থাকতে পারছি না, প্রিয় আমার ঘরে এসো। প্রিয় তুমি আমায় চাকর রাখো, চাকর হয়ে থাকবো, বাগান করবো, নিত্য উঠে দর্শন পাবো। পপইয়া রে, পিয় কী বাণী ন বোল। ও পাপিয়া, প্রিয়র কথা আর বোলো না। এসব কি ? কোনো আধ্যাত্মিক ভাব আছে এসবের মধ্যে ?

এসব গানের জন্যে কিছু আসে যায় না,—বললো একজন ভারিক্কী দেখতে গোলগাল গোসাঁই,—কে মনে রাখছে এসব গান ? আজ শুনবে, কাল ভুলে যাবে। আজ রিপুর বশবর্তী হয়ে এসব গান পছন্দ করবে, কাল মনে বৈরাগ্য এলে কানে আঙুল দেবে। আসল ব্যাপারটা কি জানো ? মীরাবাঈ সারা হিন্দুস্তানের সমস্ত বৈষ্ণবদের ধর্মগুরু হয়ে বসতে চায়। তাই বড়ো বড়ো কথা বলে। জাত বলে কিছু নেই, বড়োলোক ছোটোলোক বলে কিছু নেই, সম্প্রদায় বলে কিছু নেই। অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে হবে, প্রতিরোধ করতে হবে। ধর্মরাজ্যে সবাই সমান। এদেশে সবাইকে নিয়ে একটি ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। সবাইকে সুখে রাখতে হবে। কতো সব বড়ো বড়ো বাত। আরে বাবা, মুক্তির কথা নেই, কৈবল্যের কথা নেই, তোমায় বৈষ্ণবরা গুরু বলে মানবে কেন ? তোমায় স্বীকৃতি দেবে কেন ? নিজেদের রচনায় তোমার উল্লেখ করবে কেন ?

—শোনো, চারদিকে বলে দাও, মীরাবাঈয়ের ভজন শুনতে কেউ যাবে না, ওর ওখানে লোক হবে না, শাস্ত্র আলোচনা করবার জন্যে কোনো গোসাঁইকে ডেকে পাঠালে যাবে না—।

কথাগুলো মীরার কানেও উঠলো। মীরা চম্পা ও চামেলীকে বললো,—এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। হতে পারে জায়গাটা বৃন্দাবন। কিন্তু যারা এখানে থাকে ওরা মানুষ তো।

চামেলী কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, কিন্তু থেমে গেল। কারণ মীরা তখন একটি গান বাঁধছে।

আলী ম্‌হাঁনে লাগে বৃন্দাবন নীকো।

ও সখি, আমার বৃন্দাবন ভালো লাগে।

ঘর ঘর তুলসী ঠাকুর পূজা, দরসন গোবিন্দ জী কো।
নিরমল নীর বহত জমনা মেঁ, ভোজন দুধ দহী কো।...

প্রত্যেক দিনই মীরা সকাল সন্ধ্যে গান গাইতে বসতো। এখন ওই তার পুজো, তার ধ্যান, তার আরতি। এর ব্যতিক্রম হোতো না কিছুতেই।

· শুধু একদিন গান গায়নি। সেদিন চুপচাপ বসেছিলো সারাদিন।

সেদিন চিতোরগড়ের খবর এসেছিলো। গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ চিতোরগড় ঘিরে বসেছিলো। গড়ের ভিতর ওরা সবাই প্রতিরোধ করছিলো যতদিন পারে। তারপর একদিন আর পারলো না। রসদ ফুরিয়ে এসেছে। এবার না খেয়ে থাকতে হবে। জোধপুর, মেড়তা, বুঁদী থেকে সৈন্য এসেছিলো মেবারকে সাহায্য করতে। এখন দুর্গের ভিতর সবাই আটকে পড়ে আছে। একদিন কেল্লার ফটক খুলে রাজপুতরা বেরিয়ে এলো কেসরিয়া পাগড়ি পরে। সবার আগে রানী ধনবাঈ। হাতে খোলা তলোয়ার। সবাই একসঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়লো গুজরাট বাহিনীর উপর। সবাই এক সঙ্গে প্রাণ দিলো।

দুর্গের ভিতর অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে তাতে ঝাঁপ দিলো রানী কারমেতনবাঈ আর কয়েক হাজার রাজপুতানী।—পনেরো শো পঁয়ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দ।

আজ এতদিন পরে চিতোরগড়ে ফিরে গিরিধরজীর মন্দিরে চোখ বুজে চুপ করে বসেছিলো মীরাবাঈ। চোখ খুলতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে চোখ খুললে এখনও যেন দেখতে পাবে জওহরব্রতের আগুনের শিখায় ওদিকের আকাশটা লাল। ফিরে তাকালে দেখতে পাবে নানা রঙের ঘাগরা ও ওড়নী পরে হাত জোড় করে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ঝাঁকে ঝাঁকে রাজপুতানী। রানী কারমেতনবাঈয়ের মুখ অবিচল স্নিগ্ধ, চোখ দুটি পাথর। হঠাৎ হাওয়ায় যেন ভেসে আসছে রানী ধনবাঈয়ের শেষ আর্তনাদ। কেউ তলোয়ার বসিয়ে দিয়েছে তার বুকে।

পুরোনো দিনের অনেক চেনা মুখের মিছিল চলে গেল মীরার মনের উপর দিয়ে। রাণা সাঙ্গা, কুমার ভোজরাজ, রানী ঝালী, রানী কুঁয়রবাঈ, রানী ধনবাঈ, রানী কারমেতনবাঈ, রাণা রতন সিংহ। মনে হোলো যেন অনেক পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে। তারপর একটি পায়ের শব্দ ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে কাছে এগিয়ে আসছে। সেই পায়ের শব্দ মন্দিরের সামনে এসে থামলো। তারপর আস্তে আস্তে উঠে এসে ভেতরে চলে এলো। মীরার সামনে এসে দাঁড়ালো। চোখ খুললো মীরাবাঈ। সামনে মহারাণা বিক্রমজিত।

—এলে?

—হ্যাঁ, এলাম। শুধু বলতে এলাম, আপনি যে কাল একনাথ ভট্টকে ডাকিয়ে এনে বলবেন আপনি রাজপ্রতিনিধি হয়ে দেশের শাসনভার নিজের হাতে নিতে চান, সেটা আমি বরদাস্ত করবো না।

মীরা শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখলো। তারপর জিজ্ঞেস করলো,—যদি সেটাই আমি চাই তুমি কি করতে পারো?

তলোয়ারের হাত ঠেকালো বিক্রমজিত। তলোয়ার ঝনঝন করে উঠলো।

মীরার মুখে একটা হাসি ফুটে উঠলো। বললো,—রানী ধনবাঈ যখন রাজপুতদের সঙ্গে গুজরাটী সৈন্যদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো, রানী কারমেতনবাঈ যখন জওহরের আগুনে ঝাঁপ দিলো, তখন তোমার ওই তলোয়ার কোথায় ছিলো বিক্রমজিত? তখন কেন চিতোরগড় থেকে অনেক দূরে গিয়ে চুপ করে বসেছিলে?

—আমার সৈন্যরা আমার সঙ্গে বেইমানী করেছিলো। ওরা বুঁদীর লোক। ওদের বিশ্বাস করা আমার ভুল হয়েছে। লোইচার যুদ্ধে ওরা ঠিকমতো যুদ্ধ করেনি। আমরা হেরে গিয়েছিলাম। গুজরাটের সৈন্যদের মধ্যে দিয়ে পথ করে আমি চিতোরগড়ে সময় মতো ফিরতে পারি নি।

—বাহাদুর শা'র অবরোধের মধ্যেও ফাঁক ছিলো বহুদিন। মারওয়াড় থেকে, মেড়তা থেকে এক একদল সৈন্য চিতোরগড়ে আসতে পেরেছে। তুমি আসতে পারোনি কেন?

বিক্রমজিত উত্তর দিলো,—আমি মোগল বাদশাহ হুমায়ুনের কাছে সাহায্য চেয়েছিলাম। হুমায়ুন বেইমানী করলো। হুমায়ুন সাহায্য করলো না।

—হুমায়ুনের দায়টা কি? তাকে তৈরী থাকতে হচ্ছে চুনার দুর্গের শের থাকে ঠেকাবার জন্যে।

—আমি চিতোরগড়ে ফিরে এসে কি করতে পারতাম?

—মরতে পারতে তোমার দুই মায়ের মতন।

—আমি রাণা। আমি ইচ্ছে করলেই মরতে পারি না। আমি মরলে দেশটাকে সামলাতো কে?

মীরা বললো,—যার উপর তার মায়েরা ভরসা করতে পারলো না, তাঁদের অন্তিম মুহূর্তে, তার উপর দেশও ভরসা করতে পারে না বিক্রমজিত। তোমার এই মেবারকে আপাতত কেউ রক্ষা করতে পারবে না, এ আমি দেখতে পাচ্ছি। সুতরাং রাজপ্রতিনিধি হয়ে এ রাজ্যের শাসনভার হাতে নেওয়ার ইচ্ছে আমার নেই। আমার শুধু একটা দুঃখ, সে সময় আমি কেন চিতোরে ছিলাম না। থাকলে ধনবাঈয়ের পাশে আমিও তলোয়ার নিয়ে দাঁড়াতে পারতাম। ধনবাঈয়ের সঙ্গে মরতে পারতাম।

বিক্রমজিতের মুখ রাগে লাল হয়ে গেছে। বললো,—আমি পুরুষ। স্ত্রীলোকের কথায় আমি রাগ করি না, স্ত্রীলোকের সঙ্গে আমি তর্ক করি না।

স্ত্রীলোকের সঙ্গে ?—এবার ধারালো হোলো মীরার কণ্ঠস্বর,—আমি বৃন্দাবনে জীব গোস্বামীকে বলেছিলাম, বৃন্দাবনে একমাত্র পুরুষ হলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, আর সবাই স্ত্রীলোক। আজ তোমার কথারও প্রায় একই রকম উত্তর দিচ্ছি। একমাত্র পুরুষ ছিলেন পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ, অন্যায়ের প্রতীকার করার জন্যে তিনি সুদর্শন চক্র হাতে তুলে নিয়েছিলেন। এ দেশের এখনকার পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মতো পুরুষ মানুষ তো আমি চারদিকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। সবাই ক্লীব, সবাই নপুংসক।

কেঁপে উঠলো বিক্রমজিতের সারা শরীর। কোনো রকমে বললো,—আপনি এক্ষুনি আমার রাজ্য ছেড়ে চলে যান। এক্ষুনি। নইলে আমি ভুলে যাবো যে আপনি আমার বৌদি, আপনি আমার মায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু।

তুমি আমায় ভয় দেখাতে পারবে না বিক্রমজিত,—মীরা গম্ভীর হয়ে বললো।

না, ভয় দেখাচ্ছি না,—বিক্রমজিত বললো,—শুধু হাত জোড় করে বলছি আপনি চলে যান।

মীরা জিজ্ঞেস করলো,—আমায় ডাকিয়ে এনেছিলে কেন ?

—ভুল করেছি। আমি ভেবেছিলাম আপনি কবি, আপনি সাধিকা, আপনি নিজের পূজো ও সাধুসেবা নিয়েই পড়ে থাকবেন, আপনি নিত্য নতুন ভজন গান তৈরী করবেন। আমাদের মন শান্ত হবে। দেশের লোক খুশি হবে। এখন মনে হচ্ছে তাতো নয়, আপনার উদ্দেশ্য রাজনৈতিক। আপনি রানী হতে পারেন নি। তাই আপনি রাজার মতো ক্ষমতা চান।

মীরার মুখের হাসি এবার একটু করুণ দেখালো। উত্তর দিলো,—বিক্রমজিত, তুমি আমার ছেলের মতো। তোমার কাছে আমি মিছে কথা বলতে পারি না। এটা সত্যি, আমি অনেক কিছু চাই, আমার আশা আকাঙ্খা কামনার শেষ নেই। তবে আমার চাওয়ার গণ্ডি অতো ছোটো নয়, শুধু মেবারে আমার মন ভরবে না। আমি সারা দেশ চাই, আজকের জন্যে চাই, আগামী দিনের জন্যেও চাই, চিরকালের জন্যে চাই। আমাকে কিছু দেওয়ার ক্ষমতা তোমার নেই। আমাকে রুখবার ক্ষমতা তোমার আরো কম। যাই হোক, কালই আমি চলে যাচ্ছি।

বিক্রমজিত চলে গেল।

চামেলী জিজ্ঞেস করলো,—বাঈ-সা, আপনি এখানে ফিরে এলেন কেন ?

মীরাবাঈ বললো,—ভেবেছিলাম, বিক্রমজিতের মা কারমেতনবাঈ নেই, রানী ধনবাঈ নেই, দুঃখ পেয়ে বিক্রমজিত হয়তো বদলে গেছে। একটু স্নেহ ভালোবাসা পেলে হয়তো সে এদেশের জন্যে কিছু করতে পারবে। কিন্তু এখন দেখছি আমার বুঝতে ভুল হয়েছে। বিক্রমজিত কোনো দুঃখ পায়নি। ওর দুঃখ পাওয়ারও ক্ষমতা নেই। ও কোনোদিন কারো কাছ থেকে স্নেহ ভালোবাসা পায় নি, কারো স্নেহ ভালোবাসা পাওয়ার ক্ষমতাও ওর নেই।

দু-চারদিন পরে মীরাবাঈ চলে গেল। উপর মহলের ঝরোকা থেকে চুপচাপ দেখলো বিক্রমজিত। খুশি হওয়ার চেষ্টা করলো। কিন্তু খুশি হতে পারলো না। মনে হোলো বুকের মধ্যে একটু যেন মোচড় দিয়ে উঠলো।

মীরাবাঈয়ের জন্যে ?—বিক্রমজিত ভাবলো,—না তো। হতে পারে না। ওঁকে আমি তো শ্রদ্ধা করতাম না একটুও। ভালোবাসতাম না মোটেও। হতে পারে ছেলেবেলায় ওঁর কোলে পিঠে চড়েছি। কিন্তু এমন্ কিছু তো টান ছিলো না তাঁর জন্যে। তাহলে কেন এই বিষাদ ?

না, তাঁর জন্যে নয়। পুরোনো দিনগুলোর জন্যে। যখন মহারাণা সাঙ্গাজী বেঁচে ছিলেন তখন দিনগুলো কী মধুর ছিলো। কোনো ভাবনা নেই, চিন্তা নেই। চিতোরগড়ের আবহাওয়াই অন্যরকম ছিলো। তারপর হঠাৎ যেন সব কিছু বদলে যেতে লাগলো। পুরোনো দিনের কেউই আর রইলো না। রানী ধনবাঈ ছিলো, মা ছিলো। ওরাও চলে গেল। কেউ বুঝলো না, মীরাবাঈও বুঝলো না, আজ আমি কতো একা। আমার কে আছে ? আমি রাণা, কিন্তু আমার আপনজন কে আছে ? ছোটো ভাই উদয়, সেও আমায় ছেড়ে চলে গেছে। আমার কে আছে ?

হ্যাঁ, বনবীর আছে। সেই আমার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র আত্মীয়, একমাত্র আপনজন। বনবীর কোথায় ? কে আছো, বনবীরকে ডাকো।

আসবে না ? কেন ? ব্যস্ত ? কিসে ব্যস্ত ? ওকে গিয়ে বলো রাণাজী ওকে ডাকছেন।

কোথায় বনবীর ? কাল ডেকে পাঠালাম। এলো না। আজ সকাল থেকে দুবার লোক পাঠিয়েছি। এলো না। কি হয়েছে ওর ? কে আছো, বনবীরকে গিয়ে খবর দাও।

বনবীরের কি হোলো ? তিনদিন হয়ে গেল সে আসছে না। তোমরা কারা ? আমার ঘরের সামনে যারা পাহারায় থাকতো, ওরা কোথায় ? ও,

তোমরা নতুন পাহারা? পাহারা বদল হোলো, আমাকে জানানো হয় নি কেন? আমি রাণা, আমাকে জানানো উচিত। যাও, বনবীরকে খবর দাও। আসবে না? কেন আসবে না? আচ্ছা আমি নিজেই যাচ্ছি।

কেন? আমি ঘর থেকে বেরোতে পারবো না কেন? আমি রাণা, আমি আমার ইচ্ছে মতো বেরোতে পারবো না? আমার নিরাপত্তার জন্যে? কেন, আমার ভয় কিসের? আমার নিজের মহলে আমার ভয় কিসের? সত্যি, কী হচ্ছে চিতোরগড়ে? আবহাওয়া এত থমথমে কেন? এদিক ওদিক কাদের পায়ের শব্দ? ওদের দেখতে পাই না কেন? কি সব হচ্ছে আমাকে না জানিয়ে? কে? বনবীর?

আসুন বনবীর সিংহ। আসুন, আসুন। এই কদিন কোথায় ছিলেন আপনি? কতোবার ডেকে পাঠিয়েছি আপনাকে। কেন আসেন নি একবারও? অন্তত একটিবার কেন আসেন নি?

বনবীরজী, আমি বড্ড একা। আমার বড্ড ভয় করেছে। আমার কেউ নেই। আমার মোটে উনিশ বছর বয়েস। কিন্তু আজ আমার কেউ নেই। শুধু আপনি আছেন। আপনি আমায় ছেড়ে যাবেন না।

ওভাবে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন কেন? আমার ভয় করছে বনবীর। এ কি? এরা কারা? এদের আপনি ইশারা করে ডাকলেন কেন? এদের হাতে খোলা তলোয়ার কেন? রাণার সামনে খোলা তলোয়ার হাতে আসতে নেই। ওটা বেয়াদবি। বলে দিন, ওদের বলে দিন। ওরা আমার দিকে ওভাবে এগিয়ে আসছে কেন? বনবীরজী, আপনি চুপ করে আছেন কেন? না, না, ওভাবে হাসবেন না। ওই নিঃশব্দ হাসি আমি চিনি, ও হাসি ভয় পাই। না, না, আমায় মেরে ফেলবেন না। আমার এত অল্প বয়েস। কেন আমায় এভাবে মরতে হবে? না—, না—।

আঃ—। মা—। উঃ—। মীরাবাঈ—। মী—রা—বাঈ—…।

॥ তিরিশ ॥

নয় দশ বছর কেটে গেল। অনেক পরিবর্তন হয়ে গেল উত্তর ভারতে, অনেক রাজনৈতিক ঘটনার ঘাত প্রতিঘাতে মেবারের লোকের মন থেকে বোধ হয় মুছেই গেল মীরার স্মৃতি। কিংবা হয়তো মাঝে মাঝে মনে পড়তো। কিন্তু খবর নেওয়ার ফুরসত কারো নেই। শের শাহ হোলো হিন্দুস্তানের নতুন বাদশাহ, হুমায়ুনকে নেপথ্যে সরে যেতে হোলো। আফগান শক্তির অনুপ্রবেশ

ঘটলো রাজপুতানায়, শের শাহকে রুখতে পারলো না রাজপুতের সামরিক প্রতিভা। তারপর একদিন শের শাহও বিদায় নিলো ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চ থেকে। সেটা পনেরো শো পয়তাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দ। নতুন সম্রাট হোলো শের শা'র ছেলে ইসলাম শাহ।

পনেরো শো ছেচল্লিশ।—

দ্বারকায় রণছোড়জীর মন্দিরে একদিন সন্ধ্যেবেলা আরতির সময় বেশ ভিড়। আরতি করছিলো পূজারী ব্রাহ্মণ। মীরাবাঈ বসে ছিলো একপাশে। আরতির পর ভজন গাইবে। এই ক-বছরে মীরা দ্বারকায় কিংবদন্তী হয়ে উঠেছে। তাকে দেখতে আর তার গান শুনতে অনেক লোক হয় সন্ধ্যেবেলা। অনেক দূরে থেকেও তীর্থযাত্রীরা আসে। তাই ধুলোপায়ে পাঁচজন ভিনদেশী ব্রাহ্মণ তেমন বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করলো না।

আরতি শেষ হোলো। তারপর এক সময় শেষ হোলো মীরার তন্ময় গান। ভিড় আস্তে আস্তে ফিকে হয়ে এলো। মীরাবাঈ ফিরে যাচ্ছিলো। হঠাৎ মনে হোলো পেছন থেকে কে যেন ডাকলো।

মীরা ফিরে তাকালো।

—আমায় মনে আছে মীরাবাঈ?

মীরার মুখে একটা সহজ হাসি ফুটে উঠলো।—অনন্ত মিশ্র, আপনি? ভট্টোজী? হরিরামজী? আপনারা কোত্থেকে? কতোকাল, সত্যি, কতোকাল পরে। আপনারা চিতোরগড় থেকে আসছেন?

না,—উত্তর দিলো অনন্ত মিশ্র,—আমরা আসছি কুম্ভলগড় থেকে। শের শাহ যখন চিতোরগড় দখল করলেন, তখনই আমরা সরে গেছি। তাও তো আজ প্রায় তিন বছর হোলো। এঁদের দুজনকে আপনি চেনেন না। ইনি রাজপুরোহিত আচার্য বল্লভদেব। আর ইনি এঁর ছেলে শঙ্করনাথ।

—আপনারা আজ এখানে থাকবেন তো। আমি বলে পাঠাচ্ছি অতিথিশালায়।

বল্লভদেব বললো,—আমাদের জন্যে ব্যস্ত হবেন না মীরাবাঈ। আমাদের সব ব্যবস্থা আগের থেকেই করা আছে। আমরা আপনার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছি। আমাদের পাঠিয়েছেন মহারাণা উদয় সিংহ।

উদয়?—মীরাবাঈয়ের মুখের হাসি খুব স্নিগ্ধ হোলো,—সেই উদয়। আমার গিরধরজীর সামনে হামাগুড়ি দিতো। এইটুকু বাচ্চা ছিলো যখন ধাত্রী পান্না তাকে বাঁচালো বনবীরের হাত থেকে। সত্যি, তখন কী দিন গেছে!

অনন্ত মিশ্র বললো,—রাণাজী বনবীরকে মেবার তাড়িয়ে দিয়েছে ছয় বছর আগে।

—হ্যাঁ, আমি জানি। বনবীর এখন কোথায়?

—মহারাষ্ট্রে গিয়ে বসবাস করছে নিজের অনুচরদের জন্যে।

ভালোই হয়েছে,—মীরা বললো,—মেবারের জন্যেও, তার নিজের জন্যেও।

ব্রাহ্মণ পাঁচজনের সঙ্গে মীরা গিয়ে বসলো মন্দিরের চাতালের একপাশে। এখনও দু-জন চারজন মন্দিরে আসছে। প্রণাম করে, চরণামৃত নিয়ে শেকল নেড়ে ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। বাইরে সন্ধ্যার অন্ধকার—।

দেশের খবর রাখেন?—হরিরাম জিজ্ঞেস করলো।

—নানা দেশ থেকে তীর্থযাত্রীরা আসে তো। সব খবরই পাই।

—মেড়তা থেকে খোঁজ খবর আসে?

মীরা হাসলো,—জয়মলের চিঠি পাই মাঝে মাঝে। মেড়তায় আর ফিরে যাইনি বলে বীরমদেবজী তো আমার উপর রাগ করে আছেন। অবশ্যি মাঝখানে কয়েকবছর যুদ্ধবিগ্রহে খুব ব্যস্তই ছিলেন। মালদেব তো ওঁকে শান্তিতে থাকতে দেয়নি। সে মেড়তা দখল করার পর বীরমদেবজী আর জয়মলকে তো বাইরে বাইরেই থাকতে হয়েছিলো অনেক দিন।

বল্লভদেব বললে,—শের শা'র সঙ্গে যোগ দিয়ে বীরমদেবজী খুব বুদ্ধিমানের কাজ করেছিলেন। শের শাহ ওঁর পেছনে ছিলো বলে তিনি মালদেবজীর কাছ থেকে মেড়তা ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলেন।

তবে 'সে বছর শের শাহ চিতোরগড় দখল করলো বলে বীরমদেবজী খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন,—ভট্টোজী বললো,—কিন্তু তাঁর পক্ষে শের শাহকে নিরস্ত করার কোনো উপায় ছিলো না।

অনন্ত মিশ্র বললো,—সে যাই হোক, রাণা বিক্রমজিত মারা যাওয়ার পর বীরমদেবজী রাণা উদয় সিংহকে খুব সাহায্য করেছেন নানারকম ভাবে। তাঁর সমর্থন ছিলো বলে সব বাধাবিপত্তি কাটিয়ে তিনি রাণা হতে পেরেছিলেন।

মীরা আস্তে আস্তে বললো,—রাণা হয়ে শুধু কুম্ভলগড়ে বসে থেকে কী লাভ। আমার শুধু একটি প্রশ্ন, উদয় চিতোরগড় নিজের দখলে আনবে কবে?

পাঁচজন ব্রাহ্মণ এ ওর মুখের দিকে তাকালো। তারপর বল্লভদেব বললো,—আমরা এ ব্যাপারেই আপনার কাছে এসেছি।

মীরা বল্লভদেবের দিকে তাকালো, কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করলো না।

বল্লভদেব বলে গেল,—শের শাহ যখন চিতোরগড় আক্রমণ করলো,

মারওয়াড়ের রাজা মালদেব মনে মনে খুব খুশি হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন মেবার দুর্বল হয়ে পড়লে মারওয়াড়ের প্রভাব প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যাবে। কিন্তু এই ক'বছর শের শাহ তাঁকেও শান্তিতে থাকতে দেয় নি। চিতোরগড় জয় করার পর শের শা'র নজর গেল মারওয়াড়ের দিকে। তিনি রাঠোরদের যুদ্ধে হারিয়ে দিলেন। মালদেব তো আগেই পালিয়ে গিয়েছিলো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে। রাঠোরদের এখন আর জোর নেই আগের মতো। শের শাহও বেঁচে নেই। শের শা'র ছেলে ইসলাম শাহ এখন ঘর সামলাতে ব্যস্ত। রাণা উদয় সিংহের ধারণা, এখন চিতোরগড় ওদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার সময় এসেছে।

মীরা কয়েক মুহূর্ত বল্লভদেবের দিকে তাকিয়ে রইলো স্থির দৃষ্টিতে। তারপর জিজ্ঞেস করলো,—আপনারা আমার কাছে কেন এসেছেন?

ওরা চট করে কোনো উত্তর দিলো না। চুপ করে রইলো কয়েক মুহূর্ত।

রাজপুরোহিত আচার্য বল্লভদেবই উত্তর দিলো,—আমরা আপনাকে মেবারে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

আবার কেন?—বললো মীরা।

মীরাবাঈ,—অনন্ত মিশ্র বললো,—রাণা উদয়সিংহ বিক্রমজিত নন, রতন সিংহও নন। তিনি আপনাকে শ্রদ্ধা করেন। তিনি সেদিন বললেন, মীরাবাঈ যদিও আমার বৌদি, তিনি আমার মায়ের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, আমি তাঁর কোলে চড়ে বড়ো হয়েছি, তিনি আমার মায়ের মতো। আজ আমার মা কারমেতনবাঈ বেঁচে নেই, রাওলার কোনো গুরুজনস্থানীয়া বয়োজ্যেষ্ঠা মহিলা বেঁচে নেই। সবাই চিতোরগড় অবরোধের সময় মারা গেছে জওহরের আগুনে। শুধু মীরাবাঈ আছেন। আমি চাই যে, তিনি ফিরে আসুন, আমাদের শ্রদ্ধা সম্মান ভালোবাসা নিয়ে আমাদের সঙ্গে থাকুন, আমাদের সমস্ত কাজে নির্দেশ দিন।

মীরা হাসলো। বললো,—মিশ্রজী, আমি সামনের দিকে এগিয়ে চলেছি, আমার তো পেছন ফেরার উপায় নেই।

শঙ্করনাথ বললো,—মীরাবাঈ, আমাদের সামনের দিনগুলো খুব কঠিন। মেবারের পুরোনো গৌরব আবার ফিরে পেতে হবে। স্বয়ং মহারাণাকেও শাসন করতে পারেন এরকম একজন কেউ তো আমাদের মধ্যে থাকা দরকার। আপনি ছাড়া আর কারো পক্ষে তো তা সম্ভব নয়।

না, শঙ্করনাথ,—উত্তর দিলো মীরাবাঈ,—আমি আর এসবের মধ্যে জড়াতে চাই না।

দেশের সাধারণ লোকও আপনাকে চায়,—বলে উঠলো হরিরাম।

—কেন চায়? গিরধরজীর মন্দিরে ভজন গাইবো, শুধু সেজন্যে?

বল্লভদেব বললো,—মীরাবাঈ, আপনি যেদিন চিতোরগড় ছেড়ে চলে গেলেন বছর পনেরো আগে, সেদিন থেকেই মেবারের দুর্দিন শুরু। আপনি ফিরে আসুন। তাহলে আমাদের সুদিন ফিরে আসবে।

বল্লভদেবজী—বললো মীরাবাঈ,—আপনি কি আমায় একথা বলতে পারেন সুদিন এলে সেটা চিরকাল থাকবে? আপনি চুপ করে আছেন। আমি জানি একথা জোর গলায় বলা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। হয়তো কিছুদিন আবার সুদিন আসবে। যাকে আপনারা সুদিন বলেন সেই সুদিন,—অর্থাৎ মেবারের ক্ষমতা খুব বেড়ে যাবে, প্রতিবেশীরা ভয় পাবে, অন্য কোনো রাজা আক্রমণ করতে সাহস করবে না। মেবারের আয়তন বেড়ে যাবে এদিক ওদিক রাজ্য-বিস্তার করে। তারপর আবার রতন সিংহ বিক্রমজিতের মতো রাণারা আসবে, বনবীরের মতো খলনায়কেরা আসবে। দেশ দুর্বল হয়ে পড়বে, কোনো শত্রু রাজা আবার আক্রমণ করবে। এভাবে চিরকাল চলে আসছে, কিন্তু এভাবে কি চিরকালই চলতে হবে? সাধারণ প্রজাদের এতে কি লাভ? ওরা চায় শান্তিতে চাষবাস করবে, দু-বেলা মোটামুটি ভালো খেয়ে পরে ছেলেদের মানুষ করে মেয়েদের ভালো বিয়ে দিয়ে জীবন কাটিয়ে দেবে। এটা যে ওরা পারবে, নির্ভাবনায় পারবে, এ আশ্বাস কি ওদের কেউ দিতে পারে? চারদিকে রাজায় রাজায় মারামারি যুদ্ধ বিগ্রহ, এতে ওদের কী লাভ? না, বল্লভদেবজী, আবার ওই অচলায়তনে কয়েদী হয়ে থাকবার জন্যে আমায় ডাকবেন না।

অনন্ত মিশ্র বললো,—আমাদের স্বাধীনতার যুদ্ধ শুরু হতে যাচ্ছে মীরাবাঈ। আপনি আমাদের মধ্যে থাকলে রাণাজী এবং আমরা সবাই একটা নতুন প্রেরণা পাবো।

মীরা উত্তর দিলো,—ওসব কথায় আমি আর ভুলতে রাজী নই মিশ্রজী। আমার সামনে এখন অনেক বড়ো প্রশ্ন। যেভাবে এতদিন চলে আসছে এভাবে আর চলতে পারে না। এভাবে চললে মানুষ একদিন শেষ হয়ে যাবে, সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যাবে। মানুষের এখন চাই একটা নতুন ধর্ম, যে ধর্ম মানুষকে বেঁচে থাকতে শেখাবে, সবার সঙ্গে মিলে মিশে বাঁচার মতো বেঁচে থাকতে শেখাবে।

আমি নিজে পারবো না। আমার বয়েস হয়ে আসছে। এ আমার একলার কাজ নয়। আমি লোক খুঁজছি, যারা বুঝবে, যারা পারবে। আমায় আর মেবারে ফিরে যেতে বলবেন না আপনারা। আমি সমুদ্রের সন্ধানে বেরিয়েছি। মজে যাওয়ায় পুকুরের ধারে আমি বসে পড়তে পারি না।

হরিরাম জিজ্ঞেস করলো,—এখানে থেকে আপনি যা পারবেন, মেবারে থেকে তা পারবেন না?

—এখানে আমি কোনো কিছুতে জড়িয়ে নেই। মেবারে গেলে জড়িয়ে পড়বো।

বল্লভদেব চুপচাপ একমনে শুনছিলো মীরার কথাগুলো। এবার সামনে ঝুঁকে বললো,—আপনি ধর্মের কথা বলছিলেন। ধর্মকে এতদিন আমরা যেভাবে জেনেছি, যেভাবে বুঝেছি, সেটা ভুল?

—বল্লভদেবজী, এসব প্রশ্ন নিয়ে বাংলার চৈতন্যদেব ভেবেছেন, কবীর ভেবেছেন, পাঞ্জাবের গুরু নানকও ভেবেছিলেন। আমরা সবাই প্রায় একই সময়ের লোক, একই রকমের সমস্যাগুলো আমাদের প্রত্যেককেই বিচলিত করেছে, যে সব সমস্যা কোনো আধ্যাত্মিক সমস্যা নয়, সাধারণ মানুষের সুস্থ মন নিয়ে বেঁচে থাকার সমস্যা। যে বছর আমার স্বামী কুমার ভোজরাজ যুদ্ধে সাংঘাতিক আহত হয়ে বিছানা নিলেন, সে বছর মারা গেলেন কবীর। আমি চিতোরগড় ছেড়ে মেড়তা চলে গেলাম বীরমদেবজীর সঙ্গে। তার কিছু পরে মারা গেলেন চৈতন্যদেব। আমি বৃন্দাবন থেকে চিতোরগড় হয়ে দ্বারকায় চলে এলাম যে বছর তার বছর দুয়েকের মধ্যেই চলে গেলেন গুরু নানক। রইলাম শুধু আমি।

গুরু নানক, চৈতন্যদেব দুজনে দুটো ধর্মমত প্রবর্তন করলেন। কিন্তু বল্লভদেবজী, আমি কোনো ধর্মমতের কথা ভাবছি না। আমার মনে এখন অন্য একটা প্রশ্ন এসেছে। বৃন্দাবনের গোপীবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের নামগান করে কি আমরা এসব সমস্যা থেকে বেরোনোর কোনো পথ পাবো?

অবশ্যি আমিও তাই করছি। কারণ সেটা আমার আর তাঁর মধ্যে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ব্যাপার। কিন্তু দেশের কথা যখন ভাবি, তখন মনে হয় শুধু ওটুকুতে কিছু কি হবে?

তখন আমার মনে পড়ে বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণকে নয়, মনে পড়ে দ্বারকার শ্রীকৃষ্ণকে, যিনি পার্থসারথি।

একথা আমি ভাবছি, অনেক দিন ধরেই ভাবছি। একদা আমরা অনেকেই

একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম,—রাণা সাঙ্গা, আমার বাবা মেড়তার রতন সিংজী, আমার স্বামী কুমার ভোজরাজ, আমি। এখন কি আর কেউ আছে যে একই স্বপ্ন দেখছে? আমি তার সন্ধান চাই। যদি জানেন তো বলুন। আমি জানি এ স্বপ্ন উদয়সিংহের নয়। তার কাজ শুধু মেবারে। তার ভূমিকা খুব বড়ো, কিন্তু গণ্ডি ছোটো। এজন্যে আমি তাকে আশীর্বাদ করবো, কিন্তু ইতিহাস তাকে বিশেষ মর্যাদা দেবে না।

আমার যা বলার ছিলো আমি বললাম,—মীরার গলা ভারী হয়ে এলো,—যদি বুঝে থাকেন তো ভালো। যদি না বুঝে থাকেন তো আমার কোনো দুঃখ নেই। আমায় মাপ করবেন। কিন্তু আমায় মেবারে ফিরে যেতে বলবেন না।

সবাই চুপ করে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর এক সময় আচার্য বল্লভদেব বললো,—মীরাবাঈ, আপনাকে সঙ্গে না নিয়ে আমাদের ফিরে যাবার উপায় নেই। রাণাজী বলেছেন, মীরাজীকে সঙ্গে করে এসো, তা নইলে এসো না।

মীরার গলা গাছের পাতায় নরম হাওয়ার মতো শোনালো,—তাহলে এখন কি করবেন আপনারা?

আমরা এখানেই পড়ে থাকবো,—আস্তে আস্তে বললো বল্লভদেব,—খাওয়া দাওয়া একেবারে বন্ধ করে। আপনি যেতে রাজী হলে জলগ্রহণ করবো। তা নইলে নয়, এখানেই শেষ।

এ তো বড়ো ভয়ানক কথা,—বললো মীরা,—এ তো জবরদস্তি।

ওরা পাঁচজন কোনো উত্তর দিলো না।

—আমায় এভাবে জোর করে নিয়ে গিয়ে তো আপনাদের কোনো লাভ হবে না।

ওরা চুপ করে রইলো।

মীরা কিছুক্ষণ ভাবলো, তারপর বললো,—শুনুন, আমি গিয়ে পুজোয় বসছি রণছোড়জীর সামনে। দরজা বন্ধ থাকবে।

—আমরা বসে থাকবো দরজার সামনে।

—আমার যা বলার কাল সকালে বলবো।

—আমরা শুধু একটা উত্তরই শুনবো। আপনি যাবেন আমাদের সঙ্গে। তা নইলে মানবো না।

—আমার অন্তর থেকে আমি যে নির্দেশ পাবো, সে অনুযায়ীই চলবো। এর বেশী আমি কিছু বলতে পারছি না।

—আমাদের যা বলার বলেছি।

—আমারও যা বলার বললাম।

দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

সারা রাত ঠায় জেগে বসে রইলো পাঁচজন। চোখে ঘুম নেই, মুখে এক ফোঁটা জল নেওয়া নেই। স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো।

নিশুতি রাত। চারদিক জমাট অন্ধকার। হাওয়া দিচ্ছে থেকে থেকে। আকাশে চাঁদ নেই। শুধু দরজার তলার ফাঁক দিয়ে প্রদীপের আলো।

এক সময় সেই প্রদীপের আলোও নিবে গেল। তেল ফুরিয়ে গেছে।

মেবারের পাঁচটি ব্রাহ্মণের চোখে ঘুম নেই। ঠায় জেগে বসে আছে তখন থেকে।

এক সময় আস্তে আস্তে পুবের আকাশ ফিকে হয়ে এলো। ঠাণ্ডা মনে হোলো ভোরের হাওয়া।

সকাল হোলো। বেলা ক্রমশ একটু বাড়লো। রোদ্দুর এসে পড়লো মন্দিরের চাতালে। তখনও দরজা বন্ধ। পুজোর সময় হয়ে গেল। এসে গেছে পূজারী ব্রাহ্মণ। দরজা বন্ধ।

দরজা খোলো মীরাবাঈ, দরজা খোলো।

দরজায় করাঘাতের পর করাঘাত। কোনো সাড়া নেই ভেতর থেকে।

মেবারের পাঁচ ব্রাহ্মণ তখনও তেমনি ঠায় বসে। চোখে রাত জাগা ক্লান্তি ও কালিমা। ওরা বললো,—আমরা কিছু জানি না।

ডাকাডাকিতে জড়ো হোলো আরো অনেকে। সবাই ভিতরে ঢুকলো দরজা ভেঙে। সবাই থমকে দাঁড়ালো। ঘরে কেউ নেই। ঘর ভরে ধূপের গন্ধ, বাসী ফুলের গন্ধ। শেষবার মন্দিরে ঢোকার সময় পরনে যা কিছু ছিলো সবই ঝুলছে বিগ্রহের হাতে।

মীরা নেই,—খবর রটে গেল লোকের মুখে মুখে। মীরা নেই,—রাজ-পুরোহিত আচার্য বল্লভদেব ফিরে এসে জানালো তরুণ রাণা উদয় সিংহকে।

ঘরের ভিতর কোথাও পাওয়া যায় নি। বাইরে চারদিকে খোঁজাখুঁজি করে কোথাও পাওয়া যায়নি। তাহলে গেল কোথায়? বেরোলো কি করে? বন্ধ দরজার সামনে বসেছিলো বল্লভদেব ও তার সঙ্গীরা।

ঘর থেকে বেরোলেন কি করে?—জিজ্ঞেস করলো রাণা উদয় সিংহ।

গর্ভগৃহের পেছন দিকে বিগ্রহের উঁচু সিংহাসনের আড়ালে একটি ছোটো

দরজা আছে,—নিচু গলায় উত্তর দিলো অনন্ত মিশ্র,—সেটি বাইরে থেকে ভেজানো ছিলো। এর বেশী আমরা আর কিছু জানে না।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলো উদয়সিংহ। তারপর বললো,—এর বেশী আর কিছু জানার দরকার নেই। উনি আপনাদের অলক্ষ্যে বেরিয়ে চলে গেছেন রাতের অন্ধকারে। আর ফিরবেন না। আমাদের কাউকে জানতেও দেবেন না উনি কোথায় আছেন। তাই ভালো। আমাদের আর জানার দরকারও নেই। আমরা এটুকুই জানবো, এটুকুই বুঝবো, যাঁর জন্যে তিনি রাজমহলের বিলাস বৈভব সব কিছু ছেড়েছিলেন, তাঁরই চিরায়ত অনন্ত সত্বার মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের আশা আকাঙ্ক্ষা কামনা, সব কিছু বিলীন করে দিয়েছেন। একথাই নথিবদ্ধ হয়ে থাকুক। একথাই লোকে জানুক—।

পরের বছর উদয় সিংহ চিতোরগড় দখল করলো। বল্লভদেবকে বললো,—মীরাবাঈ কোথায় আছেন জানি না। শুনবেন নিশ্চয়ই। শুনে খুশী হবেন।

কেটে গেল পনেরো শো সাত চল্লিশ। তারপর আরো অনেক বছর—।

॥ একত্রিশ ॥

বছর ষোলো পরে, পনেরো শো তেষট্টির বর্ষাকালে এক অপরাহ্ণে শাহী মহলের বারিশখানায় একলা চুপচাপ বসেছিলো হিন্দুস্তানের বাদশাহ আকবর শাহ। একলা বসেছিলো মখমলে ঢাকা মসনদে ঠেস দিয়ে।

খাদিম এলো একটি সোনার তশতরী হাতে। তার উপর রাখা একটি গোলাপ, আর একটি বেলফুলের মালা। আকবর গোলাপটি তুললো, মাথা নাড়লো। নিজের মনে বললো,—না, আজ গোলাপ নয়। গোলাপ আজ ভালো লাগছে না।—বেলফুলের মালাটি তুলে নিয়ে হাত আঁজলা করে মালাটি ধরে একটু শুঁকলো, তারপর সামনে রেখে দিলো।

খাদিম চলে গেল। আকবর বিষণ্ণ চোখে বাইরে আকাশের দিকে তাকালো। বর্ষাকাল। অল্প অল্প মেঘ করেছে। তারপর দরজার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলো,—কেউ এসেছে?

সংমর্মরের সিঁড়ির ধাপ কয়েকটি পেরিয়ে উঠে এলো একজন। দীর্ঘ ঋজু দেহ, কিন্তু মুখে বয়েসের ছাপ পড়েছে। দরজার কাছে থেমে তসলীম করলো। ঘরের ভিতর ঢুকে আবার তসলীম করলো তারপর বাদশা'র সামনে এসে আবার তসলীম করলো। দরবারে তখনও কুর্নিসের প্রচলন হয়নি।

বসুন জয়মলজী,—আকবর বললো।

জয়মল একটু ইতস্তত করলো। বাদশা'র সামনে বসা দরবারের রীতি নয়। সে এখন আর মেড়তার স্বাধীন রাজা নয়। এখন বাদশাহ আকবরের একজন মনসবদার।

এই ক-বছরের তারও অনেক বিপর্যয় ঘটেছে। পনেরো শো বাহান্নতে বীরমদেবের মৃত্যুর পর সেই হয়েছিলো মেড়তার রাজা। কিন্তু শান্তিতে রাজত্ব করতে পারে নি। বীরমদেবের কাছে যুদ্ধে হেরে গিয়েও মারওয়াড়ের রাজা মালদেব মেড়তা আবার জয় করে নেওয়ার চেষ্টা ছাড়েনি। সে নানারকম ভাবে উত্যক্ত করছিলো জয়মলকে। বছর পাঁচেকের মধ্যেই সে আবার মেড়তা জয় করলো। পরের বছর জয়মল মালদেবের কাছ থেকে মেড়তা আবার ছিনিয়ে নিতে পেরেছিলো। কিন্তু এক বছর পরে মালদেব আবার এসে মেড়তা দখল করলো। এরপর জয়মল অনেক চেষ্টার পরও নিজের রাজত্ব পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত আকবরের শরণাপন্ন হোলো। পনেরো শো বাষট্টিতে আকবর মালদেবের কাছ থেকে মেড়তা ছিনিয়ে নিলো। কিন্তু জয়মল আর স্বাধীন রইলো না। সে আকবরের আনুগত্য স্বীকার করে মনসবদারি গ্রহণ করলো।

জয়মলের সঙ্কোচ দেখে আকবর একটু হাসলো। তারপর বললো—জয়মলজী, দরবারের কেতা কায়দা দরবারে। এখানে বারিশখানায় নয়। যাদের আমি অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে মনে করি তাদের নিয়ে বর্ষার দিনে এখানে বসি, গল্প করি, গান শুনি। আজ আপনাকেও ডাকলাম। বসুন।

জাহাঁপনা'র অসীম মেহেরবানি,—বললো জয়মল। তারপর পা গুটিয়ে বসলো।

আরও দু-চারজন আসছে,—আকবর বললো,—কেউ আপনার অচেনা নয়। তাদের জন্য অপেক্ষা করা যাক।

—যারা শাহানশা'র খাদিম ওরাই তো অপেক্ষা করবে জাহাঁপনাহ্।

—আমার কিছুক্ষণ একলা বসে থাকতে ইচ্ছে করলো, তাই আগে এসে পড়লাম। আজ আমার অনেক কথা মনে পড়ছে।

জয়মল কোনো উত্তর দিলো না, কারণ আকবর কোনো উত্তর প্রত্যাশা করে না, নিজের মনেই কথা বলে যাচ্ছে।

—জয়মল, হয়তো আমি আর দশজন বাদশা'র মতোই হতাম। কিন্তু সেই ছেলেবেলা থেকে আমার কী যে খেয়াল, এদেশের বিভিন্ন ধর্ম, জীবনের পরম সত্য উপলব্ধি করার বিভিন্ন পন্থা সম্বন্ধে কতো রকম কথা বলা হয়েছে, সে

সব জানবার জন্যে আমার খুব আগ্রহ। নানা ধর্মের বিভিন্ন পণ্ডিত আমি দেখেছি, এবাদতখানায় তাদের আলোচনা শুনেছি, তাদের সঙ্গে আলোচনা করেছি, তার পরও হয়তো আমি এসব অবসর সময়ের বিলাস বলেই নিতাম, আর অন্য রাজা বাদশা'র মতো আরো ক্ষমতা আরো ঐশ্বর্য আরো সাম্রাজ্যের স্বপ্ন দেখতাম। ধর্ম, জীবন আর রাজনীতি, সবই এক করে ফেলার কথা ভাবতে পারতাম না। কিন্তু বছর তিন আগে হঠাৎ একা মহান চরিত্রের সংস্পর্শে এলাম অল্প কিছুক্ষণের জন্যে। ব্যস, তারপর থেকেই আমার মন বদলে গেল। দেখলাম, বৈরাম খাঁ থাকলে আমি স্বাধীন ভাবে কিছুই করতে পারবো না। সব ক্ষমতা নিয়ে নিলাম তার হাত থেকে। তাকে মক্কায় পাঠিয়ে দিলাম। যাঁর কথা বলছি তিনি এক আশ্চর্য ব্যক্তিত্ব।—বলতে বলতে একটু উদাস হয়ে গেল আকবর। নিজের মনে বলে গেল,—তিনি আমার সামনে রাখলেন একটি প্রত্যাশা। কিন্তু আমি কি পারবো?

বলতে বলতে থেকে থেমে গেল বাদশাহ আকবর। তাকিয়ে রইলো দূর আকাশের দিকে।

জয়মলও চুপ করে রইলো।

কিছুক্ষণ পরে আকবর ফিরে তাকালো। বললো,—আজ সকালে একটা খবর এসেছে। তারপর থেকে আমার খুব মন খারাপ। এ জীবনে যাঁকে আমি সবার চাইতে বেশী শ্রদ্ধা করতে শিখেছি, তিনি আর নেই, তিনি মারা গেছেন সম্প্রতি। কে জানেন? জগৎ গোসায়িন নামেই আমরা তাঁকে জানতাম। নাম ধরে তাঁর উল্লেখ করতাম না। তিনি সেটা চাইতেন না। তিনি থাকতেন বন্ধোগড়ের রাজা রামচন্দ্র বাঘেলার মহলে। বাগানের ধারে একপাশে ছিলো তাঁর মন্দির আর থাকবার ঘর। অল্প কয়েকজন বিশেষ পরিচিত ছাড়া আর কারো সঙ্গে তিনি কখনও দেখা করতেন না। আপনি তাঁকে জানেন।

হ্যাঁ, জানি,—জয়মলের গলাটা হঠাৎ ধরে এলো,—আমরা ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে বড়ো হয়েছি, একসঙ্গে খেলাধুলো করেছি।

আকবর বলে গেল,—আমার তো দুটি নেশা। বড়ো সাধকের মুখে পরম সত্যের সন্ধান জানবো। বড়ো শিল্পীর কাছে গান শুনবো। তানসেনের সঙ্গে সে সময় আমার নতুন আলাপ। তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম, এমন গান তুমি শিখেছো কোন ওস্তাদের কাছে? তানসেন বললো, ওস্তাদের কাছে গান শেখা যায়, কিন্তু সব সাধনার শেষ কথা যেই সুরের সাধনা, যা দিয়ে অন্তরের

সমস্ত দুঃখ বেদনা আনন্দ ভালোবাসা পৌঁছে দেওয়া যায় জীবনদেবতার চরণে, সেটা তো কেউ শেখাতে পারেনা। আমি শুধু একজনের কাছে শুনেছি তেমন গান, যাঁর গানের কাছে আমার গান কিছুই না।

আমি জিজ্ঞেস করলাম,—কে তিনি? কোথায় থাকেন?

তিনি?—তানসেন একটু হাসলো,—জগৎ গোসায়িনের গান শুনলে ধর্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে হয় না। যা জানার সেই সুরের মধ্যেই তার আভাস পাওয়া যায়।

কে তিনি? কি তাঁর পরিচয়?

ওসব কথা আমায় জিজ্ঞেস করবেন না। এটুকু বলতে পারি উনি থাকেন বন্ধোগড়ে রাজা রামচন্দ্র বাঘেলার আশ্রয়ে। এবং খুব সম্মানের সঙ্গে তাঁকে রাখা হয়েছে। সবাই তাঁর কাছে যেতে পারে না।

তুমি কি করে গেলে?

চিত্রকূটে তীর্থ করতে এসেছিলেন সন্ত তুলসীদাসজী। তাঁর কাছে ইনি চিঠি লিখেছিলেন। আমিও গিয়েছিলাম তুলসীদাসজীর কাছে। সেইখানেই তাঁর খোঁজ পেলাম। তুলসীদাসজীর সঙ্গে পরিচয়ের সূত্র ধরেই আমি হাজির হলাম তাঁর কাছে। রাজা রামচন্দ্র বাঘেলার দরবারে আমি গান গেয়েছি বলেই তাঁর মহলের ভিতর যাওয়া আমার পক্ষে সহজ হোলো।

আমিও যাবো—।

আপনি? জাহাঁপনাহ্, আপনি হিন্দুস্তানের বাদশা, সেই পরিচয়ে তো বাঘেলার রাজপ্রাসাদে ঢুকে মুরলীধরের মন্দিরে যাওয়া সম্ভব হবে না।

মন্দিরে আমি যাবো না। মন্দিরের বাইরে মাটিতে বসে গান শুনলে তো কারো আপত্তি নেই।

কিন্তু জাহাঁপনাহ্, সৈন্যসামন্ত নিয়ে ওখানে গেলে—

সৈন্যসামন্ত নিয়ে কে যাচ্ছে? আমি একলাই যাবো।

একা? জাহাঁপনাহ্, সেটা আপনার পক্ষে নিরাপদ হবে না।

আমি যদি যেতে পারি, তুমি নিয়ে যাবে তো?

আমরা গেলাম। আমি আর অম্বরের মানসিংহ। দুজনেরই ছদ্মবেশ। দুজনেই সাধারণ মানুষ। তানসেন আমাদের সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

তানসেন নিয়ে গেল। তাই উনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে রাজী হলেন। তানসেনকে উনি খুব ভালোবাসতেন। পরিচয় জিজ্ঞেস করলে কোন মিছে কথাটি বলবো সেটি মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলাম। কিন্তু উনি কিছু

জিজ্ঞেস করলেন না। মন্দিরের বাইরে একটি গাছের তলায় বাঁধানো বেদীর উপর উনি বসলেন। আমরা মাটিতে বসলাম ঘাসের উপর।

গান গাইলেন। গান শুনলাম। কি বলবো! বর্ণনা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। একটা অন্য জগতে চলে গেলাম। মনে হোলো ভালোবাসা এক অনন্ত মহাসমুদ্র। সেই পরমপ্রিয় থেকে শুরু করে এ বিশ্বের আপন পর সবাইকে সেখানে ভাসিয়ে দেওয়া যায়। মন এর খোঁজ পেলে আর কোনো সংস্কার থাকে না, কোনো গণ্ডি থাকে না, কোনো পাঁচিল থাকেনা। তখন চারদিকের হিংসা বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব সংঘাত সব কিছু অবান্তর মনে হয়।

গান শেষ হোলো। আমরা উঠবার উপক্রম করছি। উনি বললেন,—বোসো। এখনও আমায় বলো নি, তোমরা কে।

চুপ করে আছি। তানসেন আমার দিকে তাকালো।

তাঁর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম,—আপনি কে?

আমি মীরাবাঈ।

আমি তাকালাম শুদ্ধ বিস্ময়ে। ইনি মীরাবাঈ? যাঁর কথা এত শুনেছি?

আমি বললাম,—আমি আকবর, হিন্দুস্তানের বাদশাহ। এ আমার বন্ধু অম্বরের মানসিংহ।

উনি চোখ বুজে রইলেন কিছুক্ষণ। ষাটের উপর বয়েস। চুল শাদা হয়ে আসছে, কিন্তু বয়েসের ছাপ মুখের উপর পড়েনি। চোখ খুলে আমাদের দিকে তাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন,—তোমার বয়েস কতো?

আমি বললাম,—আঠারো। আমি আপনার ছেলের মতো।

ওঁর চোখ দুটি স্নিগ্ধ হোলো। কি যেন ভাবছিলেন। তারপর বললেন,—তুমিই হিন্দুস্তানের নতুন বাদশাহ? এভাবে এসেছো আমার গান শুনতে? তোমার চোখ দেখে আমার তখনই মনে হয়েছিলো, তুমি অন্য সবার থেকে আলাদা। তোমার মধ্যে একটা শক্তি আছে। কিন্তু তুমি এখনও নিজেকে জানো না। যখন জানবে অনেক কিছু করতে পারবে।

আমি বললাম,—আমি বহুদূর যেতে চাই, অনেক কিছু করতে চাই।

কি করতে চাও?

সারা হিন্দুস্তান আমার অধিকারে আনতে চাই।

কেন? কি করবে এত বড়ো সাম্রাজ্য দিয়ে? ইতিহাসে অনেক সাম্রাজ্য এসেছে, চলে গেছে। তোমার সাম্রাজ্যেই বা কদিন থাকবে?

আমি বললাম,—সাম্রাজ্য আমার নিজের জন্যে চাই না। এটা আমার

দেশ। আমি এ দেশকে ভালোবাসি। অনেক বছর ধরে এদেশের সর্বত্র শুধু যুদ্ধবিগ্রহ চলছে। আমি সাধারণ লোকের জীবনে একটু শান্তি এনে দিতে চাই। কিন্তু পুরো দেশটা আমার না হলে তো সেটা পারবো না।

সারা দেশে শুধু একজন রাজা থাকলেই কি সাধারণ লোকের জীবনে শান্তি আসে?—তিনি বললেন,—যদি আসেও বা, কদ্দিন থাকে সেই শান্তি?

আমি তো এখনও অতো গভীর ভাবে ভাবতে শিখিনি,—আমি বললাম,—আপনি বলুন।

ওঁর চোখের দৃষ্টি তখন আমাদের পেরিয়ে অনেক দূর চলে গেছে। ওঁর শান্ত গম্ভীর গলার আওয়াজ এখনও আমার কানে ভাসছে।

উনি বললেন,—গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এদেশের উপর দিয়ে অনেক ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে, অনেক ভাঙনের মধ্যে দিয়ে গেছে এই দেশ। এখন গড়ার পালা। কিন্তু কিভাবে গড়বে এই সোনার দেশকে? এমন ভাবে গড়তে হবে যাতে সাধারণ মানুষ সুখে থাকে। এদেশে মানুষে মানুষে ভেদ-বিভেদ বড়ো বেশী। সে সব ঘুচিয়ে দিতে হবে। ধর্মের গোঁড়ামি এদেশে পঙ্গু করে দিয়েছে মানুষের মন। সেই গোঁড়ামি ভেঙে দিতে হবে। মানুষ মানুষকে ভালোবাসবে, এটাই হবে একমাত্র ধর্ম।

জানো আকবর, আমরা অনেকে একটা স্বপ্ন দেখেছিলাম। গত কয়েক বছরের মধ্যে অনেকে। কবীর নানক চৈতন্যদেব। সম্প্রতি তুলসীদাসও দেখছেন সেই একই স্বপ্ন। বলছেন রামরাজ্যের কথা, একটি আদর্শ রাজ্য, যেখানে প্রজারা সুখে থাকে। কিন্তু শুধু সামাজিক বিপ্লব দিয়েই তো হয় না। সেই সঙ্গে চাই রাজ্য শাসন করার অধিকার ও দায়িত্ব। রাণা সাঙ্গাজী চেষ্টা করেছিলেন। পারলেন না। উনি সুযোগ পেয়েছিলেন। সে সুযোগ নষ্ট হোলো। এবার সুযোগ পাচ্ছো তুমি। তোমায় পারতে হবে। তোমায় পারতেই হবে।

জয়মল স্তব্ধ হয়ে শুনছিলো আকবরের কথাগুলো।

আকবর বলে গেল,—সেদিন নতুন মানুষ হয়ে ফিরে এলাম। আমি, আমার বন্ধু মানসিংহ। বীরবলও ছিলো বাঘেলা রাজসভায়। জগৎ গোসায়িনকে সেও জানতো। তার সঙ্গেও যোগাযোগ হোলো। জানেন জয়মলজী, এখন আমাদেরও সবার এই একটি স্বপ্ন, একটি আদর্শ। একটা নতুন দেশ গড়ে তুলতে হবে যেখানে প্রজারা সুখে থাকবে, যে দেশে ধর্মের গোঁড়ামি থাকবে না, সবাই হবে সমান সমান। আমি জানি, আমাকে বা মানসিংহকে এখনকার অনেকে

পছন্দ করবে না। আমি জানি ইতিহাস মীরাবাঈকে ভুলে যাবে, শুধু সাধারণ লোকে মনে রাখবে তাঁর গান। আমি জানি এদেশের রক্ষণশীল চিন্তাধারা মীরাবাঈকে খুন করবে মীরাবাঈয়ের জীবনের উপর অলৌকিক কিংবদন্তীর রঙ চড়িয়ে। তবু আমাদের সবাইকে চেষ্টা করে যেতে হবে। আমরা যা চাইছি, তা একদিন না একদিন হবেই এবং হতেই হবে।

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো বাদশাহ আকবর ও জয়মল।

তারপর একসময় আকবর জয়মলের দিকে ফিরলো। খুব নরম গলায় বললো,—আরেকটা কথা আপনাকে বলার ছিলো। সে জন্যে আজ আপনাকে এখানে ডেকে পাঠালাম। এরা সবাই এসে পড়ার আগেই বলতে চাই। যখন চলে আসছি, মীরাবাঈ আমাকে বললেন, আমি জানি মেড়তার দখল ফিরে পাওয়ার জন্যে জয়মল তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। পরে কোনো সময় ওকে একদিন বোলো,—লোকে সংসার ত্যাগ করতে পারে, সব কিছু ছাড়তে পারে, কিন্তু বোন কোনোদিন ভাইকে ভোলে না।

জয়মল আস্তে আস্তে অন্য দিকে মুখ ফেরালো।

এসে পড়েছে মানসিংহ তানসেন আর বীরবল। আকবরকে তসলীম করে সামনে বসে পড়লো এক-একজন করে।

শুনেছেন?—আকবর জিজ্ঞেস করলো।

শুনেছি,—উত্তর দিলো মানসিংহ।

সবার চোখে বিষাদ বেদনা। সবার গলা ভারী।

তানসেন বললো—আজ আমি মীরাবাঈয়ের গান গাইবো।

বারিশখানার বাইরে চারদিকের আকাশে খুব ঘন হয়ে মেঘ করে এসেছে। গান ধরলো তানসেন। মল্লার রাগে মীরারই একটি রচনা।

বাইরে অন্ধকার করে বৃষ্টি নামলো।